ইতিকাহিনী

ইব্রাহীম খাঁ

ইতিকাহিনী

ইবরাহীম খাঁ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ইতিকাহিনী

ইবরাহীম খাঁ

ইফাবা প্রকাশনা : ১৪৮৭
ইফাবা গ্রন্থাগার : ৮৯১.৪৪৩

দ্বিতীয় সংস্করণ :

(ইফাবা প্রথম প্রকাশ)
আশ্বিন ১৩৯৪
সফর ১৪০৮
অক্টোবর ১৯৮৭

প্রকাশক :
অধ্যাপক আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা—১০০০

প্রচ্ছদ :
হাসান সায়ীদ

মুদ্রণ :
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা-১০০০

বাঁধাই :
আবদুস সালাম এণ্ড সন্স
পিয়ারী দাস রোড,
ঢাকা-১

মূল্য : ছত্রিশ টাকা

ETIKAHINI : Annecdotes written in Bengali by Ibrahim Khan and Published by Prof. Abdul Ghafur, Director Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka. October, 1987

Price. Tk. 36·00 US $ 2·00

প্রকাশকের কথা

অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ আমাদের জাতীয় মনীষার ইতিহাসে এক অমর ব্যক্তিত্ব। তাঁর বিভিন্নমুখী প্রতিভার অবদানে আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন সমৃদ্ধ হয়েছে। নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষাবিদ, গণ দাবীর উচ্চকণ্ঠ প্রবক্তা, সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক, সমাজ কল্যাণের অগ্রপথিক ইবরাহীম খাঁ আমাদের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনার ইমারত নির্মাণে দিশারীর ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর বহু সংখ্যক গ্রন্থ আমাদের আত্ম জিজ্ঞাসার পাথেয় স্বরূপ।

অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁর ইতিকাহিনী বিভিন্ন লেখকের লেখা কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাভিত্তিক টুকরো টুকরো কাহিনীর অনুবাদ ও সংকলন বিশেষ। এতে দু'একটি প্রয়োজনীয় কবিতাও সংযোজিত হয়েছে। আমাদের মানস ক্ষেত্রে অতীতের গৌরব ও মহত্বের রূপরেখা অঙ্কনে এ বইয়ে পরিবেশিত কাহিনীগুলো অবদান রাখতে পারে।

বাংলা তরজমার ভূমিকা

আজ থেকে সিকি শতাব্দী আগে Anecdotes লেখা শেষ করি। বাংলা দেশে প্রকাশক না পাওয়ায় লাহোর তক যাই; শেখ মুহম্মদ আশরাফ সাহেব এর প্রকাশ-ভার গ্রহণ করেন। তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

অল্পকাল পরই বইটি মালয়ালম ও ইন্দোনেশীয় ভাষায় অনূদিত হয়। ইন্দোনেশীয় তরজমাটি আল-কিচ্ছা নামে ইন্দোনেশিয়ার ইস্কুলে পাঠ্য হয়। এক্ষনে বইটির উর্দু ও বাংলা তরজমা প্রকাশিত হচ্ছে। লেখক সংঘের দরবারে এর জন্য হাজারো শুকরীয়া।

Anecdotes লেখার আগে মওলানা আহছানউল্লা সাহেবের সহ-যোগে লিখি হীরকহার। এই হীরকহারই বাংলা সাহিত্যে ইছলামী ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল কীর্তি কাহিনীর প্রবেশ পথ খুলে দেয়। Anecdotes পরবর্তীকালে সেই পথকে আরো প্রশস্ত করে দেয়। বইটি বাংলা ভাষায় তরজমা হওয়ায় সেই পথ আরো সুগম হল বলে ভরসা করি।

ইবরাহীম খাঁ
২৫-১১-৬৫

মূল বইয়ের ভূমিকা — কৃতজ্ঞতার ঋণ

যে সব গ্রন্থকার এবং অনুবাদকের লেখা হতে আমি এই গ্রন্থের ঘটনাবলী সঙ্কলন করেছি তাঁদের কাছে আমি অচ্ছেদ্য ঋণে আবদ্ধ। তাঁদের সকলের নিকট থেকে অনুমতি নেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে নাই। এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমি অন্যবিধ বিষয়েও তাঁদের কাছে ঋণী। তাঁদের ব্যবহার করা অনেক শব্দ এমন কি বাক্য ও বাক্যাংশ অজ্ঞাতসারে আমার লেখার ভিতর ঢুকে গেছে; যথা নিয়মে উদ্ধৃতি চিহ্নদ্বারা তা সর্বত্র স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব হয় নাই।

এই গ্রন্থের টাইপ-কপি ও প্রমাণপত্রি প্রস্তুত করার কাজে আমার সহযোগী অধ্যাপক এ, এফ, এম ছঈদ ও হালিমুজ্জামান খাঁ এবং কেরানী নওশের আলী যে শ্রম স্বীকার করেছেন সে জন্য তাঁদের আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

ইবরাহীম খাঁ

অবতরণিকা

যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুসলিম রাজশক্তির উত্থান ও পতন ঘটেছে। মুসলিম-শাসিত সেই সব দেশের ইতিহাস থেকে কতকগুলি বিশিষ্ট ঘটনা এই গ্রন্থে সঙ্কলন করেছি। মনীষী সৈয়দ আমীর আলী বলেন, জগতের দিকে দিকে যে সব জাতি রণবাহিনী পরিচালনা করেছেন তাদের মধ্যে মুসলমানগণ সময়ের সান্নিধ্যে আমাদের নিকটতম। তাঁরা জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে যে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন, তারই ঐতিহ্য ও অনুপ্রেরণা নিয়ে আধুনিক ইউরোপ আজও কাজ করে চলেছে। অথচ তাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব অল্প।

ইতিহাসের ঘটনাকে বাইরের আঙ্গিক ও ভিতরের মর্মার্থের দিক দিয়ে উন্নত করার আগ্রহে মার্জনার প্রয়াস সর্বত্র স্বাভাবিক। এ গ্রন্থে সংগৃহীত কাহিনীগুলিও সে প্রভাব সর্বাংশে এড়িয়ে চলতে পেরেছে এমন নাও হতে পারে; কিন্তু কোন রকম মার্জনা-প্রয়াসই তাঁদের খাঁটি ঐতিহাসিকতাকে যাতে কোন রকমে ক্ষুন্ন না করতে পারে সে দিকে আমরা হামেশা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি।

অতীত এক দুর্জ্ঞেয় মায়াজালে মানুষের মনকে জড়িয়ে রাখতে চায়। শেষ প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে চঞ্চল মন অন্তরীক্ষের ওপার-তক ইতস্তত: ঘুরে বেড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত মীমাংসায় হয়তো বিফল হয়ে ফিরে আসে। তাই ওমর খাইয়াম উপরের পানে চেয়ে মর্মভেদী সুরে ফরিয়াদ করেছেন:

"পৃথ্বী হতে দিলাম পাড়ি
নভ-গ্রহে মনটা লীন,
সপ্ত ঋষি যেথায় বসি
ঘুমিয়ে কাটান রাত্রিদিন
বিদ্যাটা মোর উঠল কেঁপে
কাটল কতই আঁধার ঘোর
মৃত্যুটা। আর ভাগ্য লিখন
এইখানে গোল রইল মোর।

সূচীপত্র

তবু মানুষের আত্মা অতীতের সন্ধান থেকে আজও নিবৃত্ত হয় নাই। তাই জীবনের বহু সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হয়ে বার বার আমরা অতীতের দুয়ারে গিয়ে হাজির হই।

এই তাগিদের অনুপ্রেরণাতেই আমরা ইসলামের অতীত ইতিহাসের কতকগুলি উদ্দীপনাময়ী ঘটনার সঙ্কলনে ব্রতী হয়েছি। যাঁরা জীবনের বিচিত্র অঙ্গনের বহু তপস্যায় সাফল্য অর্জন করেছেন, তাঁদেরই সাধনালব্ধ কতিপয় উজ্জ্বল রত্নে এ সাজি সৌন্দর্য্য-গৌরব-বর্ধনে চেষ্টা করেছে। এর মারফত আমাদের তরুণ পাঠক পাঠিকা এমন বহু সংখ্যক কর্ম, ধর্ম এবং চিন্তানায়কের আত্মা ও আদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করবেন যাদের কীর্তিধ্বজা সেকালে জগতের দিকে দিকে সগৌরবে উড্ডীন ছিল।

বিভিন্ন সমাজের মধ্যে পরস্পর পরিচয়জাত যে শ্রদ্ধার সম্পদ, পরিণামে তাই-ই হয় তাদের মধ্যে প্রীতি-বন্ধনের স্থায়ী সূত্র। আমাদের প্রতিবেশী সমাজের সঙ্গে আমাদের যে সৌহার্দ্যময় সম্বন্ধ বিদ্যমান তার ভিত্তি নিঃসন্দেহে দৃঢ়ভূত হবে যখন সে সমাজের তরুণ তরুণীরা এই গ্রন্থ পাঠে উপলব্ধি করবে যে তাদের প্রতিবেশী সমাজের পূর্বপুরুষেরা মহামানবের কল্যাণ কাণ্ডারীরূপে আদর্শ উদ্দীপ্ত জীবন যাপন করে গেছেন।

আমরা বিশ্বাস করি এ জাতীয় পুস্তকের পাঠ ও প্রচার দ্বারা আরও এক মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। আজ সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গন ভয়াবহ অশান্তিতে ভরে উঠেছে। কোন্ জাতি রক্তের আভিজাত্যে সবচেয়ে বড়, দেহের বর্ণে কে সব চেয়ে সুন্দর, ধর্মের বিচারে কে সবচেয়ে মহৎ এবং সামরিক শক্তির বিচারে কে সবচেয়ে দুর্জয় এই নিয়ে পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে রক্তের গঙ্গা এবং নির্যাতনের অবিরাম ধারা অহরহ বয়ে চলেছে। এই বেদনার্ত পরিস্থিতি থেকে দুনিয়াকে বাঁচানোর কোন পথই বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রনেতারা বের করতে পারেননি। লীগ অব নেশনস্ স্বার্থ-সর্বস্ব নেতাদের অনুদার নীতির ফলে ব্যর্থতার সায়রে ডুবে মরেছে। অনুরূপ নূতন কোন প্রতিষ্ঠান মুক্তির পথ নির্দেশ করতে পারবে এমন কোন ভরসা না পেয়ে মানবতার কল্যাণকামী বন্ধুরা একান্ত ম্রিয়মান হয়ে পড়েছেন এবং নতুন আশার আলোকরশ্মির সন্ধানে দূর দিগন্তপানে অনিমিখ চেয়ে আছেন।

নাট্যকার বার্ণাড শ আশান্বিত চিত্তে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এ অবিশ্বাস ও অশান্তির পঙ্ক থেকে উদ্ধার করতে পারেন এমন একটি মাত্র মানব

নেতার মূর্তি স্মৃতির পটে ভেসে ওঠে, তিনি হচ্ছেন আরবের হযরত মুহম্মদ (স.)। এই উদার পুরুষ তৎকালীন জগতকে অসাম্যের কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন। তাঁর সে আদর্শ বর্তমানের এ অসাম্য-বিদীর্ণ জগতকে আবার মুক্তি দিতে পারে।

বার্ণাড শ-র মত আমরাও আশান্বিত চিত্তে সেই মহামানবের অপূর্ব সাধনা এবং তাঁরই আদর্শ-প্রবুদ্ধ অনুসারীদের কীর্তিকথার কতিপয় ঘটনা এ গ্রন্থে সঙ্কলন করেছি। এর গানগুলি আমার স্নেহাস্পদ কবি মুফাখ্খারুল ইসলামের রচিত।

দিগন্তে ঘনীভূত অন্ধকার; কিন্তু আমরা মানবতার ভবিষ্যতে অবিশ্বাসী নই। কুয়াশার জাল কোন দিনই সূর্যের মুখকে দীর্ঘকাল ঢেকে রাখতে পারে না।

লা তাক্নাতু মির রহমতিল্লাহ্

করটিয়া — ইবরাহীম খাঁ

জুন—১৯৪৪

বিষয়			পৃষ্ঠা

"জানে না তারা কি করছে"

বদরের পরাজয়ের গ্লানি মক্কাবাসীদের কলিজার উপর নিদারুণ জহরের মত প্রলিপ্ত হইয়া রহিল। প্রতিশোধ লইবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা সুযোগ অভাবে তাহাদের হৃদয়ে গুমরিয়া মরিতে লাগিল।

অবশেষে ধূমায়িত বহ্নি সহস্র শিখায় জ্বলিয়া উঠিল। আরবের বাছা বাছা তিন সহস্রাধিক যোদ্ধা হযরত মুহম্মদ (স.) ও তাঁহার মুষ্টিমেয় সহচরগণকে পিষিয়া মারিবার জন্য আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদীনা যাত্রা করিল এবং অবশেষে মদীনার অনতিদূরে ওহোদ পর্বতমালার পাদদেশে ছাউনি ফেলিল।

হযরত মুহম্মদ (স.) সহচরগণের সহিত পরামর্শ করিয়া মদীনার বাহিরে গিয়া শত্রুপক্ষকে বাধা দেওয়াই সমীচীন বোধ করিলেন। তিনি এক সহস্র মুসলিম সৈন্য সমভিব্যহারে অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর আবদুল্লাহ্-বিন-উবাই নামক জনৈক কপট নেতা এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য লইয়া মহানবী (স.)-কে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। উহাদের অনেকে শত্রুসৈন্যে যোগ দিল।

মহানবী (স.) অবশিষ্ট সাতশত সৈন্যসহ ওহোদ পর্বত পশ্চাতে রাখিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। একদল তীরন্দাজ পশ্চাৎ রক্ষার্থে নিয়োজিত হইল।

তুমুল সংগ্রাম শুরু হইল। মুসলিম যোদ্ধাগণ প্রাণপণ করিয়া শত্রুগণের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। অল্পক্ষণ মধ্যেই বিপক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইল এবং আর কিছুকাল পর তাহাদের অবশিষ্ট সৈন্যগণ তিষ্ঠিতে না পারিয়া ময়দান ছাড়িয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ময়দান শূন্য দেখিয়া পশ্চাৎরক্ষী মুসলিম সৈন্যগণ আপন কর্তব্য ভুলিয়া গেল; তাহারা হযরত (স.)-এর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই তাহাদের নির্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিল।

পশ্চাৎরক্ষীদের স্থান ত্যাগ শত্রু সৈন্যদের তীক্ষ্নদৃষ্টি এড়াইল না; তাহারা সুযোগ বুঝিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে মহা পরাক্রমে আক্রমণ করিল।

আবার ভীষণ যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। বহু মুসলমান হতাহত হইল। মহানবী (স.)-এর পিতৃব্য বীরবর হামযা ও তাঁহার চিরসহচর জিয়াদ ও মুসআব নিহত হইলেন। এইবার শত্রু সৈন্যগণ পরম উল্লাসে একযোগে স্বয়ং মহানবী (স.)-কে আক্রমণ করিল। চারিদিক হইতে তাঁহার উপর তীর, তলোয়ার, বর্শা ও পাথরের বৃষ্টি হইতে লাগিল।

তখন হযরত (স.)-এর নিকট কয়েকজন মাত্র সাহাবী (সহচর) ছিলেন। ইঁহারা প্রাণপণ করিয়া মহানবী (স.)-এর দেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বহু শত দুশমনের বিরুদ্ধে এই কয়েকজন মাত্র যোদ্ধা কতক্ষণ অক্ষত দেহে লড়িবেন? অবস্থা সঙ্কটময় হইয়া উঠিল। তখন সহচরগণ হযরত (স.)-কে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার চারি-দিকে বৃত্তাকারে দৃঢ়সংবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং হযরত(স.)-এর প্রতি লক্ষীভূত যাবতীয় আঘাত নিজেদের দেহে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মানবদেহের কেল্লায় মক্কাবাসীদের সমস্ত আঘাত-আক্রমণ প্রতিহত হইতে লাগিল। কিন্তু সে দেহের কেল্লাও টলিয়া উঠিল। আঘাতে আঘাতে সহচরগণ জর্জরিত হইতে লাগিলেন। জর্জরিত হইয়া এক একজন ঢলিয়া পড়েন, অপর জন তাঁহার শূন্যস্থান দখল করেন। এইরূপে তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। তখন আবু দাজানা (রা.) হযরত (স.)-কে আপন বুকের তলে লইয়া উপুড় হইয়া রহিলেন। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হইয়া আবু দাজানা (রা.) ও শহীদের শয্যা গ্রহণ করিলেন। দুশ-মনের নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে হযরত (স.)-এর ললাট ফাটিয়া গেল, সম্মুখের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল, লোহার টুপীর পেরেক মাথার মধ্যে বসিয়া গেল। তিনি একটি গর্তে পড়িয়া গেলেন।

শত্রুগণ মহোল্লাসে প্রচার করিয়া দিল, মুহম্মদ (স.) নিহত হইয়াছে। এই সংবাদে মুসলিম যোদ্ধাগণের মস্তকে বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহাদের কেহ কেহ শত্রুসৈন্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্ম-বিসর্জন করিলেন, কেহ কেহ বা হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া পড়িলেন। ফাতেমা, আয়েশা, খাওলা (রা.) প্রভৃতি মুসলিম মহিলাগণ উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া যুদ্ধের ময়দানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এমন সময় জনৈক সাহাবী হযরত (স.)-কে দেখিতে পাইয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'এই যে রসূলুল্লাহ্।' ইহা শুনিয়া আলী, আবুবকর, উমর (রা.) প্রভৃতি যোদ্ধাগণ হযরত (স.)-এর নিকট ছুটিয়া আসিলেন; শত্রুরা দূরে সরিয়া গেল। আলী (রা.) হযরতের হাত ধরিয়া তাঁহাকে গর্ত হইতে টানিয়া উপরে তুলিলেন। তাল্‌হা (রা.) দাঁতে কামড় দিয়া হযরত (স.)-এর মাথা হইতে লোহার পেরেক খসাইলেন, এই কাজে তাঁহার নিজের চারিটি দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। হযরত (স.)-এর মাথা, মুখ ও ললাট বহিয়া রুধির ধারা বহিতেছিল। তিনি রক্ত মুছিতেছিলেন। ব্যথিত স্বরে বলিতেছিলেন, "হায়! যে জাতি তাদের নবীকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে তাদের কি উপায়ে মুক্তিলাভ ঘটবে?" তিনি আবার দুই হাত উর্ধ্বে

তুলিয়া আবেগময়ী ভাষায় বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো, প্রভো, আমার জাতিকে সুপথে ফিরিয়ে আন, কারণ তারা জানে না তারা কি করছে।"

—হীরকহার

একটি নির্বাচনী বক্তৃতা

খলীফারূপে নির্বাচিত হইবার পরই হযরত আবুবকর (রা.) দাঁড়াইয়া উপস্থিত নির্বাচকমণ্ডলীকে সম্বোধন করতঃ বলিলেন :

"আমি চাই নাই, তবু আপনারা আমাকে এই দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন করলেন। আমার এ পদে আর কাউকে বসালে তাতেই আমি বেশী খুশী হতাম। কিন্তু যখন এ পদে বসিয়েছেন, তখন আমার কয়েকটি কথা রাখতে হবে। কথা কয়টি এই :

আমি সামান্য মানুষ মাত্র—আপনাদেরই দশজনের মত একজন। সুতরাং আমার উপর নজর রাখবেন : যদি দেখেন যে, আমি ন্যায় পথে আছি, তবে আমার হুকুম পালন করবেন। যদি দেখেন যে, আমি ভুল পথে চলেছি তখন আমাকে উপদেশ দিবেন। যদি তথাপি আমি অন্যায় পথে চলি, তবে আমাকে বাধা দিবেন।

আপনারা সকলে জেনে রাখুন, বন্ধুগণ, ধর্ম-কাজই সবচেয়ে ভাল কাজ; পাপ কাজই সবচেয়ে মন্দ কাজ। আমার কাছে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে সবল যে সবচেয়ে দুর্বল, কারণ তার যা পাওনা, তা আমাকে তার কাছে পৌঁছাতে হবে, আর আমার কাছে সবচেয়ে দুর্বল সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি প্রবল, কারণ প্রবলের নিকট হতে তার দেয় আমাকে আদায় করতে হবে।

আমার বক্তব্য বললাম : আপনাদের ও আমাদের প্রতি আল্লাহ্ যেন প্রসন্ন থাকেন।

আচ্ছা এখন বিদায়—আস্‌সালামু আলাইকুম।"

—সমৃদ্ধী

সেবার সুযোগ

গভীর রজনী। চারিদিকে নিবিড় নিস্তব্ধতা বিরাজমান। মরুর হাওয়া রহিয়া রহিয়া ধীরে বহিতেছে, খেজুর পাতায় মৃদু দোলা দিয়া যাইতেছে। আরবের নির্মল নীল আকাশ, আকাশে লক্ষ তারা ঝিকিমিকি জ্বলিতেছে। সেই স্তিমিত আলোর তলে স্নিগ্ধ হাওয়ার ব্যজনে মদীনা নগরী নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছে।

সহসা রাস্তার মোড়ে এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ আবির্ভূত হইল এবং নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মদীনার মহল্লায় মহল্লায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইতে বেড়াইতে অকস্মাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল,—"ওকি? গভীর নিশীথে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ কেন?" পুরুষটি শব্দের সন্ধানে দ্রুত অগ্রসর হইয়া একটি ছিন্ন তাঁবুর সম্মুখে উপস্থিত হইল, দেখিল, তাঁবুর দুয়ারে একটি লোক ভয়বিহ্বল হইয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া আছে। আগন্তুক তাহার পরিচয় ও তাঁবুর ভিতর আর্তনাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে লোকটি বলিল, "আমরা তেহামার মরু ময়দানবাসী বেদুঈন; শুনেছি খলীফা উমর ফারুক (রা.) বড় দয়ার মানুষ, গরীবের মা-বাপ। তাই তাঁর কাছে কিছু সাহায্য চেয়ে নিতে এই দূর পথ ভেঙ্গে আজ সন্ধ্যায় এসে পৌঁছেছি। সহসা স্ত্রীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়েছে, বিদেশ-বিভুঁই স্থান—মদীনার একটা প্রাণীর সঙ্গেও পরিচয় নেই, তার উপর এই গভীর রাত্রি, তাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে আছি।"

আগন্তুক অভয় দিয়া কহিল, "কোনও ভয় নাই, আমি এখনি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।"

আগন্তুক যে পথে আসিয়াছিল, দ্রুত সেই পথেই ফিরিয়া গেল; বেদুঈন তাহার দুয়ারে বসিয়া আশায়-নিরাশায় আগন্তুকের প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গণিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই আগন্তুক এক নারীকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহাদের সঙ্গে প্রসূতির জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব আহার্য সব মৌজুদ। নারী অবিলম্বে তাঁবুর ভিতর গিয়া প্রসূতির পরিচর্যায় নিযুক্ত হইল; "এস দোস্ত, আমরা ততক্ষণে রান্নার কাজটা সেরে নিই" বলিয়া আগন্তুক বেদুঈনকে লইয়া রন্ধনকার্যে ব্যাপৃত হইল।

কিছুক্ষণ পর তাঁবুর ভিতর হইতে নারীটি সহর্ষে বলিয়া উঠিল, "আমিরুল মুমিনীন ! আপনার দোস্তকে সুসংবাদ দিন, তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মেছে।"

শুনিয়া বেদুঈন স্তম্ভিতভাবে খলীফার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহার পর ভয়ে জড়সড় হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। খলীফা অনেক অভয় ও আশ্বাস দেওয়ার পরও তাহার ভয় সম্পূর্ণ কাটিল না। এদিকে নারী প্রসূতির সব কাজ সারিয়া আসিয়া বেদুঈন ও প্রসূতিকে আহার করাইবার বন্দোবস্তে লাগিয়া গেল। বেদুঈন ভয়ে ভয়ে খলীফাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ নারী কে?" খলীফা উত্তর করিলেন, "এ নারী আমার স্ত্রী উম্মেকুলসুম।"

"আপনারাই ধন্য" বলিয়া বেদুঈন এবার ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং খলীফার পায়ের উপর পড়িবার উপক্রম করিল। খলীফা তাহাকে সস্নেহে টানিয়া তুলিয়া বলিলেন "ধন্যবাদ আমাদেরকে নয়, ভাই, ধন্যবাদ দাও সেই আল্লাহ্‌কে যিনি তাঁর এই নগণ্য বান্দাকে তোমাদের খেদমতের সুযোগ দিয়েছেন। আমরা এখন যাই, দোস্ত, কাল মসজিদে আমার সঙ্গে দেখা করো, দেখব তোমাদের সাহায্যের জন্য আর কি করতে পারি।"

—হীরকহার

আকিলের হুশ

হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতের আমল। তাঁহার ভাই আকিল একদিন আসিয়া বলিলেন :

'আমি বড় অভাবে পড়েছি, আমাকে সাহায্য দিন।'

'একটু সবুর, ভাই আমার—মাসহারাটা আসুক।'

'হুকুম পাঠিয়ে আপনার মাসহারাটা আগেই আনিয়ে নিন।'

আলী—তা হয় না। খলীফার মাসহারাও অন্যান্য সকলের মাসহারার সঙ্গেই আসিবে।

আকিল—বায়তুল মাল হইতে কিছু দিয়ে দিন।

আলী—বায়তুল মাল গরীব দুঃখীর জন্য। তোমার-আমার জন্য নয়। একটু অপেক্ষা কর। মাসহারাটা পেয়ে নিই।

আকিল—কিন্তু আমি ত অত দেরী করতে পারি না। এখনই একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

আলী—বেশ, একটা লোক সাথে দিই, সে বাজারে গিয়ে একটা দোকান ঘর দেখিয়ে দিক, তুমি তালা ভেঙ্গে কিছু নিয়ে এস।

আকিল—বটে! তবে আপনি আমাকে চুরি করতে বলেন?

আলী—আর দেশের তহবিল ভেঙ্গে তোমাকে দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে তুমি আমাকে খুব সাধু বানাবার পরামর্শ দিচ্ছ!

আকিল—আমি আজই মুয়াবিয়ার কাছে রওনা হয়ে যাব। তখন খুব ভাল হবে ত?

আলী—তোমার ইচ্ছা যদি হয়—অনায়াসে যেতে পার।

আকিল—বেশ, তবে তাই চললাম।

* * * *

মুয়াবিয়া—আকিল, বেশ, তোমার ভাই তোমাকে কিছু দেয় নাই, আমি দিচ্ছি।

আকিল—দিন, আমার অত্যন্ত প্রয়োজন।

মুয়াবিয়া—কিন্তু একথা মসজিদে ঘোষণা করতে হবে, বুঝলে ত? বলতে হবে, তোমার ভাইটি কেমন, আর আমি কেমন।

আকিল—তা নিশ্চয়ই ঘোষণা করব।

মুয়াবিয়া—খাজাঞ্চী, আকিলকে একলাখ দিরহাম দিয়ে দাও!

* * * *

আকিল—(মসজিদে দাঁড়াইয়া) বন্ধুগণ, একটা সত্য কথা শুনুন। আমি আলীর কাছে অন্যায় আব্দার করেছিলাম, তিনি আমার চেয়ে ধর্মকেই বড় স্থান দিলেন। তারপর আমি মুয়াবিয়ার কাছে সেইরূপ আব্দার করলাম, তিনি ধর্মের চেয়ে আমাকেই বড় স্থান দিলেন!

—সম্মতী

বুদ্ধ-যশোধরা

এবার চলিনু তবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
উচ্ছল জল করে ছলছল
জাগিয়া উঠেছে কল-কোলাহল,
তরণী-পতাকা চল-চঞ্চল
কাঁপিছে অধীর রবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

আমি নিষ্ঠুর কঠিন কঠোর,
নির্মম আমি আজি।
আর নাই দেরী ভৈরব-ভেরী
বাহিরে উঠেছে বাজি।
তুমি ঘুমাইছ নিমীল নয়নে,
কাঁপিয়া উঠিছ বিরহ-স্বপনে,
প্রভাতে জাগিয়া শূন্য নয়নে
কাঁদিয়া চাহিয়া রবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।
অরুণ তোমার তরুণ অধর
তরুণ তোমার আঁখি
অমিয় রচন সোহাগ বচন
অনেক রয়েছে বাকি।

পাখী উড়ে যাবে সাগরের পার,
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার,
মহাকাশ হতে ওই বারে বার
আমায় ডাকিছে সবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর!
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে
কোথায় আমার ঘর!
কিসেরি বা সুখ ক'দিনের প্রাণ?
ওই উঠিয়াছে সংগ্রাম গান,
আমার মরণ রক্তচরণ
নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।

—রবীন্দ্রনাথ

আরো একজন

হিজরতের পথে হযরত (স.) সাথী মাত্র আবুবকর (রা.)। রাত্রি অন্ধকার। পশ্চাতে শত্রুর দল রা রা করিয়া বাহির হইয়াছে। মুহম্মদ (স.)-এর মাথার দাম এক-শ' উট—যে মাথা আনিতে পারিবে সেই এক-শ' উট পুরস্কার পাইবে।

ক্রমে পূব আকাশে ঊষার ধূসর রেখা দেখা দিল। দিনের বেলায় পথ চলা বিপজ্জনক—কারণ পিছনে দুশমন। উভয়ে পথের পাশের একটি গুহায় প্রবেশ করিলেন।

একটু পরেই দূরে শুনা গেল, ঘোড়ার খুরের শব্দ। শব্দ নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। দুশমনেরা আসিতেছে। তাহাদের হাতে মুক্ত তলোয়ার—প্রভাত সূর্যের আলোকে ঝলমল করিতেছে।

আবুবকর (রা.) শিহরিয়া উঠিলেন: ব্যাকুলভাবে বলিলেন, হযরত, ওরা বহু, আমরা মাত্র দুইজন। মহানবী (স.) পরম বিশ্বাসের সঙ্গে বলিলেন, না—না—আবুবকর, আমাদের সাথে আরো একজন আছে:

ইন্নাল্লাহা মাআনা লাতাহ্‌জান,
'ভয় নাই, ভয় নাই,
মোদের সহায় মহান আল্লাহ্
সাথে আছে সব ঠাঁই।'

তাহাই হইল: এ বিপদের মুহূর্তে সেই আরো একজনই অগ্রসর হইলেন।

মহানবী (স.) গুহায় প্রবেশের পর একটি মাকড়সা গুহার দুয়ারে তাহার জাল মেরামত করিতেছিল।

দুশমনেরা গুহার দুয়ারে আসিয়া কহিল, ''চল, ফিরে যাই, ভিতরে কেউ থাকলে কি আর মাকড়সার জাল থাকত?''

—ওয়াকিদী

মাথা নিতে গিয়া সঁপে দেয় নিজ মাথা

মক্কা হইতে মদীনার পথে এক দিন দেখা গেল, একদল দুর্দান্ত অশ্বারোহী —তাহাদের কোমরে খঞ্জর, পিঠে তূন, হাতে বর্শা, চোখে আগুন।

হযরত (স.) হিজরতের পথে। কুরায়েশ সর্দারেরা ঘোষণা করিয়াছে, 'মুহম্মদের মাথা যে কেহ আনিয়া দিতে পারিবে, সে তার পুরস্কার পাইবে একশত শ্রেষ্ঠ উট।'

পুরস্কারের লোভে সত্তর জন দুর্জয় দস্যু তাহাদের নেতা বরীদাকে লইয়া পথে বাহির হইল। বিক্রান্ত তাজীর খুরের আঘাতে ধূলার ঝড় বহিল, আশে-পাশের পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনি জাগিল।

হযরত আবুবকর (রা.)-কে লইয়া মহানবী (স.) যখন মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছিয়াছেন, এমন সময় বরীদা তাহার দলবল সহ সমীপস্থ হইল।

তখন মহানবী (স.) কুরআনের আয়াত আবৃত্তি করিতেছিলেন। তাঁহার চিত্ততল মথিত করিয়া আল্লাহ্‌র মহান বাণী অপূর্ব আবেগে নির্গত হইয়া আকাশ-বাতাসকে পাগল করিয়া তুলিতেছিল। বাতাসের বুক হইতে কাড়িয়া লইয়া নিকটস্থ পাহাড় সে বাণীকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিতে মাতিয়া উঠিয়াছিল।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর দিকে অগ্রসর হইতেই বরীদা এ বাণীর পরশ লাভ করিল। সে কিছুক্ষণ থামিয়া শুনিল—তাহার অন্তর তলে বিপুল আলোড়ন শুরু হইল। তবু সে অগ্রসর হইল—কিন্তু এবার শিথিল পদক্ষেপে। তাহার সঙ্গীদের অবস্থাও অনুরূপ।

মহানবী (স.) স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কে ভাই, মুসাফির দল?'

'আমি বরীদা—আসলাম কওমের সর্দার।'

'আসলাম কওম? ভাল—ভাল—সুখে থাক।'

'তুমি কে?'

'আমি মক্কার একজন সামান্য বাসিন্দা—নাম মুহম্মদ-আবদুল্লাহর পুত্র—আল্লাহ্‌র এক নগণ্য বান্দা—তাঁরই বাণী বহন করে বেড়াই।'

'ও! তাই!!'

'তোমরা কি চাও, ভাই?'

'চাই? না, চাই না—চেয়েছিলাম।'

'কি চেয়েছিলে?'

'আপনার মাথা।'

'আমার মাথা? তা আমার কথা না নিয়ে আমার মাথা নিয়ে এ কাড়াকাড়ি কেন, ভাই?'

মহানবী (স.) আবার স্নেহ-মণ্ডিত স্মিতহাস্যে বরীদার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিলেন। বরীদা সে চাহনীর পরশ সহিতে পারিল না, অভিভূত হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল।

মহানবী (স.) চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। বরীদা যেন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া পাইল। সে উঠিয়া রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সামনে গিয়া বলিল :

'হযরত আপনার মাথা নিতে এসেছিলাম, এবার আপনার কাছে মাথা দিতে রয়ে গেলাম। আপনার নিকট সেই মাথা দেওয়ার অধিকারটুকু চাই।'

—আহসানউল্লাহ

সাগরতরঙ্গে সেনাপতি

তখন উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা রোমক শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। দীর্ঘকাল হইতে অধিবাসিগণ রোমক শাসকগণের অত্যাচার নীরবে সহিয়া আসিতেছিল।

সহসা তাহারা দেখিল, তাহাদেরই পাশে নব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাজ্য—আর তথায় অধিবাসিগণ সর্বপ্রকার অবিচার হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত। তাহারা মুসলিম রাষ্ট্রের নায়ক আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিকট প্রার্থনা জানাইল—"আমাদিগকে এ জুলুম হতে মুক্ত করুন।"

মুয়াবিয়া (রা.) তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন। সৈন্যদল সজ্জিত হইল। সেনাপতি উক্‌বার নেতৃত্বে আরব-বাহিনী যাত্রা করিল।

যথাকালে আরব রোমকে সাক্ষাৎ হইল—রক্তাপ্লুত সাক্ষাৎ; রোমকগণ তিষ্ঠিতে পারিল না; লড়াইর ময়দান ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

কিন্তু মরক্কো তখনও রোমকদের কবলে। এই স্থান হইতে বাহির হইয়া তাহারা মাঝে মাঝে মুসলিম আফ্রিকায় হানা দিতে লাগিল ; অধিবাসীদের রক্তে আবার ঘাট-মাঠ লাল হইয়া উঠিল।

ইহাদের দমনের জন্য ৫৫ হিজরীতে উক্বা পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলেন। রোমকগণ প্রাণপণে বাধা দিতে লাগিল ; কিন্তু উক্বার গতি প্রতিরুদ্ধ হইল না।

নগরের পর নগর উক্বার সম্মুখে তোরণ-দ্বার খুলিয়া দিল। অবশেষে তিনি আটলান্টিকের তীরদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সম্মুখে উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ, দিগন্ত প্রসারিত আটলান্টিক। কিন্তু উক্বার ধাবমান অশ্বের গতিরুদ্ধ হইল না ; কশাঘাতে উত্তেজিত তেজস্বী অশ্ব ফেনায়িত বারিধি বক্ষে লাফাইয়া পড়িল। উক্বা সকৃপাণ দক্ষিণ হস্ত আকাশের দিকে তুলিয়া বলিলেন, "প্রভো, এ দরিয়া যদি বাধা না দিত, তবে তোমার নামের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে আমি আরও দূরে অগ্রসর হইতাম।"

স্তম্ভিত সাগর উচ্ছ্বসিত ফেণার শ্বেত-শতদলের মালা সেনাপতির পায়ে জড়াইয়া দিল, অশ্বের কণ্ঠে পরাইয়া দিল।

—হ্‌ীরকহার

সৈন্যদের প্রতি আবূবকর (রা.)

সিরিয়া অভিযানের জন্য সৈন্যরা প্রস্তুত। ইয়াযীদ বিন আবূ সুফিয়ান সেনাপতি পদে বৃত হইলেন।

সৈন্যরা যাত্রা করার পথে। হযরত আবুবকর (রা.) তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

'তোমাদের কয়েকটি উপদেশ দিচ্ছি, মন দিয়ে পালন করো : কখনো যেন ভুল না হয়।

নারী, শিশু আর বৃদ্ধকে হত্যা করো না।
ফলবান বৃক্ষ ছেদন করো না।

শস্য ক্ষেত বিরান করো না।
খাওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া ভেড়া উটের প্রাণ নাশ করো না।
খেজুর গাছ কেটো না।
গনিমতের মাল আত্মসাৎ করো না।
লড়াইয়ে সাহস হারিও না।
কোন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না।
দুশমনের লাশকে বেইজ্জত করো না।
কোন শিশুকে মায়ের কোল হতে ছিনিয়ে নিয়ো না।
আক্রান্ত না হলে কাউকে আক্রমণ করো না।
কোন অবস্থাতেই কাউকে জোর করে মুসলমান করার চেষ্টা করো না।
খৃস্টান ও ইহুদী সাধু ও পাদ্রীগণকে আক্রমণ করো না।

—সয়ূতী

প্রতিদ্বন্দ্বী আবিষ্কার

খলীফা হওয়ার আগেও হযরত উমর (রা.) গরীব-দুঃখীদের খবর লইবার জন্য ছদ্মবেশে রাত্রির অন্ধকারে মদীনার মহল্লায় টহল দিয়া ফিরিতেন।

তিনি একদা ঘুরিতে ঘুরিতে মদীনার এক প্রান্তে একটি গরীব বুড়ীকে আবিষ্কার করিলেন এবং তাহাকে সাহায্য করিবার ভার মনে মনে গ্রহণ করিলেন।

পরদিন বুড়ীর কাছে যাইয়া শোনেন; কে একজন আগেই যাইয়া বুড়ীর অভাব মিটাইয়াছে। উমর (রা.)-এর কৌতুহল হইল, তাঁহার এ প্রতিদ্বন্দ্বী কে?

তাহার পরের দিন। উমর (রা.) আগেই যাইয়া কাছে লুকাইয়া রহিলেন; তিনি দেখিবেন, কে সেই ব্যক্তি যিনি মানুষের সেবায় উমরকে পরাজিত করে।

একটু পরেই একটি মানুষ আসিল। মানুষটি বুড়ীর কাছে যাইয়া তাহার অভাব মোচন করিল।

উমর (রা.) ভাল করিয়া চাহিয়া দেখেন—ও আল্লাহ্ এ যে আবুবকর (রা.)!

দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সাক্ষাৎ হইল—উভয়ের ঠোঁটে স্নিগ্ধ মধুর হাসি। উমর (রা.) বলিলেন, "আল্লাহ্‌র দরগায় শুক্‌র্ যে স্বয়ং খলীফা ছাড়া আর কারো হাতে পরাজিত হই নাই।"

—আবদুস্ সালেক

হাফিজ ও তৈমুরলঙ্গ

তৈমুরলঙ্গের দুর্বার গতির সম্মুখে নগরের পর নগর বিনা বাধায় প্রবেশ দ্বার খুলিয়া দিল।

তৈমুর শিরাজ নগরে পৌঁছিয়াই তত্রত্য কবি হাফিজকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

হাফিজ আসিয়া হাজির হইলেন। দুইজনে কথাবার্তা শুরু হইল।

তৈমুর—আপনিই কি কবি হাফিজ?

হাফিজ—আমি হাফিজ বটে? তবে কেউ কেউ কবিও বলে থাকে।

তৈমুর—কেউ কেউ কবিও বলে থাকে। তা বেশ। আচ্ছা কবি, একথা কি সত্য যে আপনিই লিখেছেন :

> আগার আঁ তুর্ক্-ই-শিরাজী বদস্ত আরদ দিলে মা-রা
> বখালে হেন্দুয়স্ বখশম সমরকন্দ ও বুখারা-রা—?
> (যদি সে শিরাজ সুন্দরী তুলে নেয় মোর দীন দিলভার
> সমরকন্দ ও বুখারা দেই বদলে তার গালের তিলটার)

হাফিজ—সত্য।

তৈমুর—বুখারা-সমরকন্দ আমার প্রিয়তম নগর—তাদেরই সমৃদ্ধি সাধনের জন্য আমি দুনিয়া তছনছ করে ফিরছি। আর সেই বুখারা সমরকন্দকে আপনি দান করেছেন। আপনার প্রিয়ার কপালের একটি ছোট তিলের জন্য?

হাফিজ—জাহাঁপনা, ঐ রকম অতিদানের জন্যই ত আজ আমার এই দুর্দশা।

তৈমুর—বাহবা! বাহবা! তোফা বলেছেন। খাজাঞ্চী, এই কবিকে দশ হাজার আশরাফী দিয়ে বাড়ী পৌঁছিয়ে দাও।

—পারস্যের ইতিহাস—সাইক্স

বালক বাইয়াজীদ

রাত্রি গভীর হইয়া আসিয়াছে। বালক বাইয়েজীদ নিদ্রিতা মায়ের বিছানার পাশে বসিয়া পাঠ অভ্যাস করিতেছে। সহসা মা মাথা তুলিয়া নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, 'একটু পানি দাও ত বাবা ; বড় তৃষ্ণা পেয়েছে।'

বাইয়াজীদ কলসী হইতে পানি ঢালিতে গিয়া দেখিল কলসী শূন্য, অগত্যা পাশের বাড়ী হইতে পানি আনিবে স্থির করিয়া বালক ঘর হইতে বাহির হইল। কিন্তু তখন সমস্ত মহল্লা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ; এত রাত্রিতে বালক কাহাকে ডাকিয়া জাগাইবে ? বালকের মনে পড়িল মহল্লার অন্য প্রান্তে ঝরনাটির কথা।

বালক বাড়ী ফিরিয়া একটি কলসী হাতে ঝরনার দিকে চলিল এবং কলসী ভরিয়া পানি লইয়া ফিরিল।

কিন্তু তখন জননী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। অমন সময় ডাকিয়া জাগাইলে কষ্ট হইবে ভাবিয়া বালক জননীকে ডাকিল না ; পানি-ভরা গেলাস হাতে করিয়া তাঁহার শিয়রে বসিয়া রহিল।

রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল, কিন্তু মায়ের ঘুম ভাঙিল না।

অবশেষে পূর্ব গগনে উষার রক্তিমরাগ দেখা দিল ; পাখীরা কলকণ্ঠে কুঞ্জ-কানন মুখরিত করিয়া তুলিল। জননী চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, বাইয়াজীদ পানির গেলাস হাতে তাঁহার শিয়রে বসিয়া আছে।

সব কথা মায়ের মনে পড়িল ; তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া পুত্রকে বক্ষে ধারণ করতঃ আবেগভরা কণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন, 'প্রভো, আমার পুত্রের প্রতি আমি যেমন প্রীত হয়েছি, তার প্রতি তুমিও তেমনি প্রীত হও।'

মাতার প্রার্থনা ব্যর্থ হয় নাই। কালে এই বালকই সুলতানুল আউলিয়া (ঋষিকুল-সম্রাট) বাইয়াজীদ বোস্তামী নামে ভুবনবিখ্যাত হন।

—তাজকিরাতুল আউলিয়া

বরফের তাজমহল

দক্ষিণ মেরুর অনন্ত বিস্তৃত বরফের মরুভূমি। সেই মরুর নির্মম বুকে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আটটি মানুষ: তাহাদের মন, মুখ, চোখ গভীর ব্যথার আগুনে দগ্ধ। আজ তেরদিন যাবৎ ইহারা এই বরফের পাথার পাড়ি দিয়া চলিয়াছে। অসম্ভব রকম ঠাণ্ডা বাতাস; বরফের কণায় বাতাস আচ্ছন্ন; সে বাতাস দুরন্তবেগে চলে, মুখে চোখে আঘাত করে, হাড় কাঁপায়। তবু সেই মরণবাতাসের ভিতর দিয়া ইহারা এখানে আসিয়াছে—তাহাদের সাহসী স্বদেশবাসী ক্যাপটেইন স্কটের অন্বেষণে। তাহারা স্কটকে পাইয়াছে: বরফ-ঢাকা একটি ছোট্ট তাঁবুর তলে তিনি শুইয়া আছেন। আট মাস আগে এইখানে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন।

অপলকদৃষ্টিতে ইহারা চাহিয়া আছে ক্যাপটেইনের মৃতদেহের দিকে; ভাবিতেছে: ঠিকই হইয়াছে; মেরুর বুকের গোপন তত্ত্ব আবিষ্কার করাকে যিনি জীবনের মহত্তম ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই মেরুর স্নিগ্ধ কোলে তাঁহার শেষ শয্যা বাছিয়া লওয়ায় ভুল হয় নাই।

ক্যাপটেইনের পাশে তাঁহার দুইটি সাথী। জীবনে ইহারা ক্যাপটেইনের সহযোগিতা করিয়াছে; মৃত্যুতেও ইহারা তাঁহারই পাশে শয়ন করিয়া আছে।

আটজন বন্ধু কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সেই বরফের বুকে তাঁহাদিগকে সমাধিস্থ করিল। বলিল, 'বরফের তাজমহলের বুকে প্রকৃতি এঁদেরে চিরস্মরণীয় করে রাখুক।'

দক্ষিণ মেরুর বুকে তিনি বৃটিশের বিজয়-পতাকা স্থাপন করিবেন, ইহাই ছিল ক্যাপটেইন স্কটের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। তাই সহস্র বিপদকে উপেক্ষা করিয়া তিনি মেরু-অভিযানে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার এই মহান যাত্রাপথে নির্মম আবহাওয়া পদে পদে তাঁহাকে বাধা দিয়াছে। বরফের কল্পনাতীত শীতল পরশে তাঁহার নাকের ডগা পুড়িয়াছে, হাতের আঙ্গুলের আগা খসিয়া পড়িয়াছে, হাড়ের ভিতরের মজ্জা পর্যন্ত জমাট হইয়া আসিয়াছে; অনন্ত বিস্তৃত নির্জন নিষ্ঠুর মরুর ভ্রূকুটিতে তিনি ভয় পান নাই, নিরস্ত হন নাই। সৃষ্টির আদিম প্রভাত হইতে যে পথে কোন দিন কোন মানুষ চলে নাই, তিনি নির্ভীকচিত্তে সেই পথে অটল পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইয়াছেন।

এমনি ভাবে চলিতে চলিতে ১৯১২ সালের ১৮ই জানুয়ারী ক্যাপটেইন স্কট দক্ষিণ মেরুতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ক্যাপটেইন এমাণ্ডসেন নামক একজন নরওয়েজীয় আবিষ্কারক তাঁহার পাঁচ সপ্তাহ আগে ঐ স্থানে পৌঁছিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন; তাঁহার পরিত্যক্ত তাঁবু ও দলীলপত্র এখনও সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে।

তবে মানুষের মধ্যে ক্যাপটেইন স্কটই দক্ষিণ মেরুর কেন্দ্রে প্রথম পদক্ষেপ করিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তর বিষাদে ভরিয়া উঠিল। পরক্ষণেই তিনি ভাবিলেন, যাক তবু তো আসিয়া পৌঁছিলাম—তবু তো এতদিনের স্বপ্ন সফল হইল।

ক্যাপটেইন ফিরিবার পথে যাত্রা করিলেন। আবার সেই দুরন্ত বাতাস, সেই দুরন্ত বরফ, সেই দুরন্ত শীত; আবার নির্মম প্রকৃতির সঙ্গে সেই অবিরাম সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের ভিতর দিয়াই তিনি অগ্রসর হইয়া চলিলেন, তাঁহার অদম্য উৎসাহে তাঁহার সঙ্গিগণের সাহস উজ্জীবিত রহিল। তাঁহাদের মনে হইল—এ দুঃখের দিন বেশী দিন রহিবে না—তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয় স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন; তাঁহাদের অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা দেশবাসীকে শুনাইবেন; গৃহে প্রিয়জনের হাস্যময় অভিনন্দনে সমস্ত পথশ্রম ভুলিয়া যাইবেন।

কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদের এ আশার স্বপন টুটিয়া গেল। তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহাদের খাদ্য ফুরাইয়া আসিয়াছে। সম্মুখে মাত্র চৌদ্দ মাইল দূরে খাদ্য, জ্বালানী কাঠ সবই আছে; কিন্তু আর যে পা চলে না, এই চৌদ্দ মাইলই যে চৌদ্দ হাজার মাইলের মত মনে হইতেছে। স্কটের সাথীরা অসুস্থ হইয়া পড়িল; কেহ কেহ পথেই মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল।

স্কটের সেই ছোট্ট দলে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন এডগার ইভান্স্। বরফের উপর আছাড় খাইয়া ইভান্সের মাথা ফাটিয়া গেল; তিনি মহা যাত্রা করিলেন। ছোট্ট দল সম্মুখে চলিতে লাগিল—অদম্য সাহসে, জ্বলন্ত উৎসাহে, অক্লান্ত পরিশ্রমে। কিন্তু দিন দিন আবহাওয়া নিষ্ঠুর হইতে নিষ্ঠুরতর হইতে লাগিল; বরফের বাতাস ঝড়ে পরিণত হইল; প্রচণ্ড ঝড় ভৈরব-গর্জনে প্রকৃতির বুক মন্থন করিয়া ছুটিতে লাগিল। ক্যাপটেইন স্কটের শরীর বরফে পুড়িয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার শেষ আহ্বান আসিবার আর দেরী নাই। দলে থাকিয়া বাকী ক'জনের খাদ্য আর তিনি কমাইতে চাহিলেন না। তাঁবুর বাহিরে সেই নিষ্ঠুর ঝড়ের মধ্যে যাইতে যাইতে তিনি বলিলেন, 'আমি বাইরে চল্লাম, কখন ফিরব বলতে পারি না।' তিনি আর ফিরিলেন না।

সামনে মাত্র ১১ মাইল পথ; তাহার পরই যথেষ্ট খাদ্য, যথেষ্ট জ্বালানী কাঠ। স্কটের সঙ্গে তখন মাত্র দুইজন সাথী। সাথে খাদ্য রহিয়াছে, তাহাতে আরও দুই দিন চলিতে পারে। কিন্তু পথ চলিবার উপায় কি? বাহিরে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা চলিতেছে—মানুষের সাধ্য নাই যে আর এক পা সে অগ্রসর হয়।

২৪শে মার্চ। স্কট বুঝিলেন—এ পথের আর শেষ নাই, এ যাত্রা হইতে আর প্রত্যাবর্তন নাই, গৃহাঙ্গনের উষ্ণ সুখ-পরশ আর তাঁহার জন্য নয়। তিনি তাঁহার অন্তিম তাঁবুতে বসিয়া তাঁহার জীবনের শেষ রিপোর্ট লিখিলেন—'কোন যুগের কোন মানুষ এমন শীতের মধ্যে এমন জায়গায় কখনও আসিয়াছে বলিয়া আমি জানি না। আমরা বিপন্ন: কিন্তু সে জন্য আমাদের দুঃখ নাই: বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।'

এমনই করিয়া বৃটেনের সাহসী সত্যান্বেষী নাবিক নির্ভীক মনে মৃত্যুবরণ করিলেন।

ঈসা খাঁ ও মানসিংহ

[১]

[সোনারগাঁও—ঈসা খাঁর দরবার—কয়েকজন দরবার রক্ষী।]

১ম নকীব—বাংলার স্বাধীন নবাব, ঈসা খাঁ বাহাদুর—হুঁশিয়ার! পথিকজন—হুঁশিয়ার!

২য় নকীব—(আরো উচ্চৈঃস্বরে) হুঁশিয়ার!

৩য় নকীব—(আরো উচ্চৈঃস্বরে) হুঁশিয়ার!

[ঈসা খাঁ প্রবেশ করিলেন, রক্ষীরা কুর্ণিশ করিল; ঈসা খাঁ বসিলেন, সঙ্গে উজীর—তিনিও বসিলেন।]

ঈসা খাঁ—এ সময়ে গৌড়ের পাঠান সর্দার এখানে আসছেন! মতলবটা কি, উজীর?

উজীর—(দাঁড়াইয়া কুর্ণিশ করিয়া) কিছু বুঝতে পারি নাই। ওরা ওদের মতলবের কথা হুজুরকে ছাড়া কাউকে বলবে না।

ঈসা খাঁ—তবে ওঁকে ডাকুন।

উজীর—(কুর্ণিশ করিয়া) যো হুকুম।—পাহারাওয়ালা!

পাহারাওয়ালা—(ভিতরে ঢুকিয়া কুর্ণিশ করিয়া) হুজুর!

উজীর—গৌড়ের পাঠান সর্দারকে সসম্মানে দরবারে নিয়ে এস!

পাহারাওয়ালা—(কুর্ণিশান্তে) যো হুকুম (কুর্ণিশান্তে নিষ্ক্রমণ)।

ঈসা খাঁ—আবার বুঝি বাংলার বুকে রক্তগঙ্গা বইবে, উজীর।

উজীর—তা হুজুর, মোগলের হাতে তীর, আর পাঠানদের হাতে তলোয়ার—এতে রক্তগঙ্গা না বয়ে দুধের দরিয়া বইবার অবকাশ কোথায়?

ঈসা খাঁ—কিন্তু কেন এমন হয়, উজীর? কি করেছি আমরা মোগলের?

উজীর—পাঠানের এক নম্বর অপরাধ, পাঠানের মাথা বড় উঁচু, পাঠানের ঘাড়ের রগ বড় মোটা, সহজে নীচু হতে চায় না।

ঈসা খাঁ—কিন্তু দিল্লী হতে এত দূরে—ভারতের এই প্রান্তসীমায় মাথা গুঁজে থাকবার একটু স্থান আমরা চাই, এও তারা দিতে নারাজ?

উজীর—সম্পূর্ণ নারাজ।

ঈসা খাঁ—কেন, শুনি?

উজীর—আপনারা যে তাদের রাজ্য ও সিংহাসন দিয়েছেন, হুজুর।

ঈসা খাঁ—সত্য বলেছেন, উজীর, মোগলকে ডেকে এনে পাঠান তার সিংহাসন দিয়েছিল—এ পাঠানের মস্ত অপরাধ বটে!

উজীর—কিন্তু এ যে মোগলের কাছে পাঠানের সত্যই মস্ত অপরাধ, হুজুর!

ঈসা খাঁ মস্ত অপরাধ? তাও মোগলের কাছে?

উজীর—নিশ্চয়।

ঈসা খাঁ—কেন বলুন তো।

উজীর—কারণ অতি সহজ, যারা সিংহাসন দিতে পারে, সিংহাসনটা ফিরে চাইতে তাদের কতক্ষণ?

ঈসা খাঁ—অতএব তাদের নিপাত কর—এই তো?

উজীর—হুজুর, কুটরাজনীতি তাই বলে।

(পাহারাওয়ালার পাঠান সর্দারকে লইয়া প্রবেশ)

পাঠান সর্দার—বন্দেগী, বাংলার স্বাধীন নবাব, বন্দেগী!

ঈসা খাঁ—(দাঁড়াইয়া) আসুন, দোস্ত, তশ্‌রীফ রাখুন। (পাঠান সর্দার বসিলেন) তারপর বলুন, আমি আপনাদের কি খিদমত করতে পারি?

পাঠান সর্দার—বরং গৌড়ের পাঠানেরা হুজুরের কি খিদমত করতে পারে? তারা তাই জানতে এ বান্দাকে হুজুরের দরবারে পাঠিয়েছে।

ঈসা খাঁ—এ তাঁদের নেহায়েত মেহেরবানী।

পাঠান সর্দার—মেহেরবানী নয়, হুজুর, এ তাদের নিতান্ত নিষ্ঠুর প্রয়োজন।

ঈসা খাঁ—প্রয়োজন? বলুন সে কেমন?

পাঠান সর্দার—গৌড়ের পাঠান মোগলের কাছে লড়াইয়ের ময়দানে হেরেছে, মনের ময়দানে হারে নাই। তারা ভিতরে স্বাধীন—বাইরেও স্বাধীন থাকতে চায়।

ঈসা খাঁ—এ তাঁদের মহৎ সিদ্ধান্ত।

পাঠান সর্দার—এ তাদের দুর্জয় সংকল্প—এ তাদের মরণপণ।

উজীর—আপনাদের পরিকল্পনা কি?

পাঠান সর্দার—আমাদের পরিকল্পনা অতি সহজ: আমরা ষোড়শ সহস্র দুর্ধর্ষ পাঠান যোদ্ধা নবাব ঈসা খাঁর পতাকাতলে দাঁড়িয়ে লড়ব—আমাদের দেশের, আমাদের জাতির স্বাধীনতার জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দান করব। যদি জয়ী হই, এ দুনিয়ায় মানুষের মত মাথা উঁচু করে চলব, যদি পরাজিত হই, ঐ লড়াইয়ের ময়দানেই শহীদের শয্যা পেতে ঘুমিয়ে পড়ব; তবু—তবু ঐ মধ্য এশিয়ার মরুচরদের কাছে মাথা নত করে বেঁচে থাকব না।

ঈসা খাঁ—তবে তাই হোক, পাঠান সর্দার। আবার আগুন জ্বলুক—আবার দামামা বেজে উঠুক, আবার দুশমনের কলিজার খুনে আফগান যোদ্ধারা ঈদের মেহেদী পরুক।

পাঠান সর্দার—মহামান্য ঈসা খাঁ, পাঠানের গৌরব-কেতন, আজ হতে আপনার আদেশে আমরা জান্ কুরবান করতে প্রতিজ্ঞা করলাম। ঐ শুনুন আমাদের আসন্ন কুরবানীর গান বালকদের কণ্ঠে কণ্ঠে বেজে উঠছে।

(একদল বালকের প্রবেশান্তে গান)

আজাদীর তরে নেছার করিব এ মোর তুচ্ছ জান।
শেষের শয্যা হোক সে আমার জেহাদের ময়দান ॥
ফুলের বিছানা শাহাদতী ছাপে
পাতা হোক মোর লোহুর গোলাবে,
হয়তো আজাদ হবে মোর জাতি—নয় জান কোরবান ॥

এই মাথা নত হওয়ার আগেই যেন গরদান হতে
ইয্যত নিয়ে পড়ি লুটে সেই রণ-মাঠে ধূলিপথে।
এ মাথা শুধুই খোদার লাগিয়া
ইহারে কখনো নত ক'রে দিয়া
করি না—করি না আমি যেন মোর খোদার অসম্মান ।।

[২]

[সোনারগাঁও—ঈসা খাঁর দরবার]

ঈসা খাঁ—দয়াময় আল্লাহ্, তুমি এদের সব দিয়েছিলে, কিন্তু এরা নিজেদেরকে চিন্‌ল না।

উজীর—কাদের কথা ভাবছেন, হুজুর?

ঈসা খাঁ—ভাবছিলাম এই পাঠান জাতির কথা। কি দুরন্ত যোদ্ধা এরা। গায়ের বল, মনের বল, বুদ্ধির বল, তলোয়ারের বল—সব মিলে এদেরে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা করে তুলেছে। মাত্র পঁচিশ হাজার পাঠান সৈন্য—এরা এক লক্ষ মোগল সৈন্যকে ভেড়ীর পালের মত তাড়িয়ে দিলে! মোগল সেনা-নায়ক শাহ্‌বাজ খাঁ জখম হয়ে পালিয়ে গেলেন!

উজীর—এরা হেলায় ভুবন বিজয় করতে পারত, হুজুর, কেবল একটা দোষে এরা মরেছে।

ঈসা খাঁ—কি সে দোষ, উজীর?

উজীর—সে দোষ এদের আত্মকলহ। ইউছুফজায়ী ওরাকজায়ীকে দেখতে পারে না, ওরাকজায়ী মাহমুদজায়ীকে দেখতে পারে না।

দৌবারিক—(প্রবেশ করিয়া) হুজুর, সেনাপতি ফরীদ খাঁ সালাম জানাচ্ছেন।

ঈসা খাঁ—আসতে বল।

দৌবারিক—যো হুকুম (কুর্ণিশ করিতে করিতে নিষ্ক্রমণ)

ফরীদ—(প্রবেশ করিয়া) বন্দেগী, জাহাঁপনা!

ঈসা খাঁ—কি সংবাদ, ফরীদ খাঁ?

ফরীদ—এই মাত্র দিল্লীর গুপ্তচর এসে পৌঁচেছে।

উজীর—তারপর?

ফরীদ—দিল্লীর দরবার ভয়ানক গরম।

উজীর—অর্থাৎ?

ফরীদ—শাহবাজ খাঁর পরাজয়-সংবাদে আকবর একদম ক্ষেপে উঠেছেন।

ঈসা খাঁ—তা আকবর বাদশাহ্ এমন কিছু অন্যায় করেন নাই, ফরীদ খাঁ।

ফরীদ—তিনি সেনাপতি মানসিংহকে বাংলায় পাঠাচ্ছেন।

ঈসা খাঁ—(উঠিয়া দাঁড়াইয়া) বাঃ—বাঃ—বাঃ! শাবাশ, আকবর বাদশাহ্, শাবাশ! এতদিনে একটা বাহাদুর যোদ্ধাকে আমার বিরুদ্ধে পাঠিয়েছ। এজন্য আমি দূর হতে তোমায় সালাম জানাচ্ছি। (কুর্ণিশের কায়দায় সালাম)। উজীর, নগরময় উৎসবের আয়োজন করুন। আনন্দ-আনন্দ-আনন্দ—কেবল আনন্দ!

উজীর—(কুর্ণিশান্তে) যো হুকুম।

ফরীদ—এ উৎসবের কারণ বুঝতে পারলাম না, হযরত।

ঈসা খাঁ—নিজে যোদ্ধা হয়েও এর কারণ বুঝতে পারলে না, ফরীদ খাঁ? আরে এতদিনে এমন একটি লোক আসছে যার সঙ্গে কিঞ্চিৎ তলোয়ারবাজী চল্‌বে।

ফরীদ—ওঃ, তাই! কিন্তু হযরত, মানসিংহের সঙ্গে যে সৈন্যও আছে।

ঈসা খাঁ—বাঃ! সৈন্য ছাড়া কি সেনাপতি চলে?

ফরীদ—কিন্তু হযরত, সে যে লাখে লাখে সৈন্য!

ঈসা খাঁ—বাংলার পাঠানের বিরুদ্ধে আস্‌ছে মোগল, তা তাদের লাখে লাখে না আস্‌লে চলবে কেন, ফরীদ খাঁ?

ফরীদ—কিন্তু হুজুর, তাতে আমাদের কি লাভ?

ঈসা খাঁ—আমাদের প্রচুর লাভ—এখন যত ইচ্ছা মোগল মারতে পারবে। ওরা সংখ্যায় কম হলে যে শীঘ্রই ফুরিয়ে যেত, সেনাপতি!

উজীর—তারপর তলোয়ারের পিয়াস মেটাতে মোগলের খোঁজে আমাদের যেতে হত সেই দিল্লী-আগরা।

ঈসা খাঁ—হাঁ, সে একটা মেহনত থেকে তোমরা বেঁচে যাচ্ছ।

ফরীদ—কিন্তু শহরের বাজে লোক যে ভয়ে অস্থির—ঐ শুনুন তাদের হল্লা।

[অদূরে হল্লার শব্দ]

ঈসা খাঁ—দৌবারিক!

দৌবারিক—(কুর্ণিশান্তে) জাহাঁপনা!

ঈসা খাঁ—ঐ হল্লাকারীদের বোলাও।

দৌবারিক—যো হুকুম (কুর্নিশান্তে বহির্গমন ও দুইজন লোক লইয়া পুঃ প্রঃ।

ঈসা খাঁ—কি হে, কি হয়েছে ?

১ম হল্লাকারী—হায় হায় হায়রে—হায় হায় হায়।

উজীর—আরে হয়েছে কি ?

২য় হল্লাকারী—সর্বনাশ—সর্বনাশ—সর্বনাশ।

১ম হল্লাকারী—ওরা শীগ্‌গীরই এসে পড়বে—ঐ দুরন্ত মোগলরা !

২য় হল্লাকারী—আর আস্‌ছে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে—লাখে লাখে।

১ম হল্লাকারী—ওরা আমাদের কাঁচা গোশ্‌ত চিবিয়ে খাবে।

২য় হল্লাকারী—আমাদের চর্বি দিয়ে চেরাগ জ্বালাবে।

১ম হল্লাকারী—আর ওরা ... ...

ঈসা খাঁ—(মৃদ পদাপে) চুপ—ভেড়ীর দল—চুপ !

১ম হল্লাকারী—(ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইয়া) তা-তা-তা—হুজুর, তা—যদি ওরা সত্যি এসে পড়ে, তখন আমাদের কি হবে ?

ঈসা খাঁ—আমাদের খুব ভাল হবে। ওদের সঙ্গে থাকবে হাজার হাজার ঘোড়া, লাখে লাখে ভেড়া, বক্‌রী, আর বাক্‌স বাক্‌স টাকা – সবই আমরা পাব।

২য় হল্লাকারী—আমরা গরীবেরাও পাব ?

ঈসা খাঁ—হাঁ, তোমরাও পাবে।

১ম হল্লাকারী—কিন্তু হুজুর, আমরা কি ওদের জামাই যে ওরা ঐ সব আমাদেরে দিয়ে যাবে ?

ঈসা খাঁ—আহা ! ওরা কি ইচ্ছে করে দিবে ?

২য় হল্লাকারী—আমরা লড়াই করে ওদের কতককে মেরে ফেল্‌ব, আর বাকী-গুলোকে তাড়িয়ে দিব; কাজেই ওদের বন্দুক, তলোয়ার, ঘোড়া—বকরী, মাল-মাত্তা সব আমাদের রয়ে যাবে ।

১ম হল্লাকারী—বাঃ রে বাঃ। তবে তো আমার মজা হবে—আমি হাজার টাকা খরচ করে আমার বিবির গয়না গড়ে দিব।

২য় হল্লাকারী—আর আমি দুই হাজার টাকা দিয়ে একটা বাইছের নাও কিন্‌ব।
(গানের সুরে) ... ...

১ম হল্লাকারী—আর আমি এক কিলে তোমার মাথা ভেঙ্গে দিব।
(গানের সুরে) ... ...

২য় হল্লাকারী—কেন রে ব্যাটা ?

১ম হল্লাকারী—আমি নিব মাত্র এক হাজার টাকা, আর তুই নিবি দুই হাজার —তুই কেরে নবাবপুত্তুর?

২য় হল্লাকারী—মুখ সামলে কথা বলিস, ব্যাটা, নইলে এক থাপ্পড়ে চাপার দাঁত খসিয়ে দিব।

১ম হল্লাকারী—তবে রে ব্যাটা, পাজি ... ...।

ঈসা খাঁ—আরে ভয় নাই—ভয় নাই, তোমরা দুইজনেই দুই হাজার করে পাবে —এখন যাও।

হল্লাকারীগণ—সে হুজুরের দয়া। (কুর্ণিশান্তে নিষ্ক্রমণ)

ঈসা খাঁ—এই তো আমাদের দেশের জনসাধারণ, উজীর!

উজীর—অথচ এদের নিয়েই দেশ: এরা বাঁচলে দেশ বাঁচে, এরা মরলে দেশ মরে।

ঈসা খাঁ—কিন্তু সেই এরা যদি এত অজ্ঞতা, এত ভীরুতা, এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোভের পঙ্কে ডুবে থাকে, উজীর, তবে কাদের স্বাধীনতার জন্য এ জীবন মরণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ছি?

ফরীদ খাঁ—সত্যি হুজুর, আমরা যদি জীবনের বিনিময়ে এদের জন্য স্বাধীনতা রেখে যাই, এরা দু'দিনও তা রাখতে পারবে না।

উজীর—তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, হুজুর, মোগলের বিরুদ্ধে আমরা এত শক্তি ক্ষয় করে যে যুদ্ধ করছি, সেই যুদ্ধ যদি জনগণের অজ্ঞতার বিরুদ্ধে করতাম।

ঈসা খাঁ—আমারও সে কথা অনেকবার মনে হয়েছে, উজীর। কিন্তু যখনি মনে পড়ে, আমার চিরপ্রিয় পাঠানের উপর হীন মোগলের গর্বোদ্ধত অত্যাচার, তখন সব ভুলে যাই—তখন আমার অজ্ঞাতসারে হাত হতে তছ্‌বীহ্ খসে পড়ে, কলম কোথায় হারিয়ে যায়, কটির কোষবদ্ধ অসি ঝনাৎ করে বেজে উঠে; চেয়ে দেখি তলোয়ারের বাঁট আমার মুঠায় দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ।

ফরীদ খাঁ—কিন্তু তবু ... ...

ঈসা খাঁ—হাঁ, তবু একটা উপায় করতে হবে। উজীর, আপনারা সেই ভার নিন! ঐ অজ্ঞ জনগণের বুকে নতুন প্রাণের সঞ্চার করুন।

উজীর—বেশ। তবে আজ হতে আমার ব্রত হবে—

আজ হতে মোর এই ব্রত হোক—এই জীবনের সার :
করিব দেশের কুটিরে কুটিরে প্রাণধারা সঞ্চার ॥
জীবন্মৃতের দিবো প্রাণ-বল
শোণিতের ধারা করি' চঞ্চল,
তুফানের মাঝে গরজি উঠিবে সেই প্রাণ-পারাবার ॥
মাঠে মাঠে যারা বীরের বংশ মাটি হলো মাটি চষি,
তাদেরে শিখাবো রণ-হুঙ্কার, হাতে তুলে দিব অসি ॥
ছিঁড়ে ছুটে সব জুলুমের বাঁধ
শিখাবো তাদেরে হইতে আজাদ,
দাঁড়াবে মূর্ত যেন প্রতিবাদ রোধিতে অত্যাচার।

[৩]

[এগারসিন্দুর—পরপারে মহারাজ মানসিংহের শিবির]

মানসিংহ—শোনা যায়, একদা এক অসুররাজ গোষ্পদে ডুবে মরেছিল। একথা বিশ্বাস কর, দুর্জয়সিংহ ?

দুর্জয়সিংহ—এ পুরাণের কাহিনী মাত্র, বিশ্বাস করি না।

মানসিংহ—আমিও আগে বিশ্বাস করতাম না, দুর্জয়সিংহ, কিন্তু এখন বিশ্বাস করি।

দুর্জয়সিংহ—সত্যি বিশ্বাস করেন, মহারাজ ?

মানসিংহ—চোখের সামনে যা ঘটে গেল, দুর্জয়সিংহ, তাতে বিশ্বাস না করি কেমনে, তাই বল। নইলে বাংলার এক অজ্ঞাতনামা ক্ষুদ্র পাঠান সর্দার ঈসা খাঁ, তারই তলোয়ার তলে মারা যায় ক্ষত্র-বীর মানসিংহের আপন জামাতা ?

দুর্জয়সিংহ—আশ্চর্যই বটে।

মানসিংহ—মানুষ হয়ে জন্মেছিল, একদিন সে তো মরতই—নাহয় দু'দিন আগে মরেছে। কিন্তু রাজপুতনার মরুসিংহ মারা গেল বাংলার বক্বীর হাতে—এ দুঃখ রাখবার স্থান কোথায়, দুর্জয়সিংহ ?

দুর্জয়সিংহ—মহারাজ, এ দুঃখ করতে পারেন।

মানসিংহ—জামাতা নিহত হয়েছে, কিন্তু তারো চেয়ে বড় দুঃখ যে, এই কাহিনী শুনে রাজপুতনার নারীরা হাসবে, শত্রুরা উপহাস করে রটনা করবে, আমি নিজে ভয় পেয়ে ঈসা খাঁর সামনে আমার জামাতাকে পাঠিয়েছিলাম। অনেকে ভাববে, আমরা কাপুরুষ।

দুর্জয়সিংহ—এ বিধাতার বিধান, মহারাজ, সয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি?

মানসিংহ—'এ বিধাতার বিধান—সয়ে যাও!' কাপুরুষের দল, আত্মপ্রবঞ্চনার বেশ কথা আবিষ্কার করেছ।

দুর্জয়সিংহ—কিন্তু একি বলছেন, মহারাজ?

মানসিংহ—ঠিকই বলছি। যদি বিধাতা বলে সত্যই কেউ থাকে, তবে তোমার সে বিধাতা নিষ্ঠুর—তোমার সে বিধাতা জালেম: আমি মানি না তার বিধান।

দুর্জয়সিংহ—মানেন না?

মানসিংহ—না। আমি তোমার বিধাতার বিধানের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করব—আমি ঈসা খাঁকে হত্যা করব।

দুর্জয়সিংহ—কিন্তু সে কি করে সম্ভব হবে?

মানসিংহ—ঈসা খাঁ আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিল, পাঠিয়েছিলাম আমার জামাতাকে। আমার জামাতাকে হত্যা করে ভেবেছে, সে বুঝি মানসিংহকেই হত্যা করেছে। আমি তাকে জানিয়েছি, ঈসা খাঁর মুণ্ডপাত করার জন্য মানসিংহ এখনো জীবিত রয়েছেন। এবার দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান গিয়েছে আমার তরফ থেকেই।

দুর্জয়সিংহ—কোন উত্তর পেয়েছেন?

মানসিংহ—না, তবে এক্ষুণি পাব। জানি না; সে কাপুরুষ পুনরায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে রাজী হবে কিনা।

দূত—(প্রবেশান্তে কুর্ণিশ করিয়া) মহারাজের জয় হোক।

মানসিংহ—কি সংবাদ, দূত?

দূত—সংবাদ শুভ। মহারাজকে হত্যা করেছে ভেবে তারা উৎসব করছিল; এমন সময় আপনার আহ্বান নিয়ে আমি হাজির। তবে ঈসা খাঁ এ আহ্বান গ্রহণ করেছেন।

মানসিংহ—গ্রহণ করেছেন? অনেকক্ষণ পরে নিশ্চয়ই?

দূত—না, মহারাজ। তক্ষুণি গ্রহণ করেছেন।

মানসিংহ—তক্ষুণি? আচ্ছা, তা বেশ। কোন জবাব এনেছ?

দূত—এনেছি, মহারাজ, তবে দেখাতে সাহস হয় না।

মানসিংহ—তোমাকে অভয় দিচ্ছি, দূত।

দূত—মহারাজ, ঈসা খাঁ লোকটা, নিতান্ত ....নিতান্ত......এই নিতান্ত .....

মানসিংহ—নিতান্ত কি?

দূত—আজ্ঞে, নিতান্ত গোঁয়ার। কারণ মহারাজের আহ্বান পত্র পেয়েই অমনি তলোয়ার খুল্লেন, তারপর নিজের হাত কেটে তারই রক্তে তলোয়ারের ডগা দিয়ে উত্তর লিখলেন—"বহুত আচ্ছা"।

[৪]

[লড়াইয়ের ময়দান। একদিকে পাঠান শিবির, অন্যদিকে মোগল শিবির। অদূরে এগারসিন্দুর কেল্লা—ময়দানের মাঝখানে ঈসা খাঁ ও মানসিংহ সামনাসামনি দাঁড়িয়ে]

ঈসা খাঁ—নমস্কার, মহারাজ।

মানসিংহ—আদাব, খাঁ সাহেব।

ঈসা খাঁ—এত তকলীফ করে এখানে না এসে মহারাজ যদি আদেশ করতেন, তবে দিল্লীতে গিয়েই মহারাজের সঙ্গে আমি একহাত লড়ে আসতাম।

মানসিংহ—বাংলার ঝোপে-জঙ্গলে আপনারা কেমন আছেন, একটু দেখতে শখ হল, খাঁ সাহেব।

ঈসা খাঁ—রাজপুতনার মরু-পর্বতের কোন অন্ধকার গুহায় মহারাজ কিরূপে থাকেন, তা দেখবার কৌতূহলও তো এ বান্দার হতে পারত।

মানসিংহ—পাঠানেরা দেখছি ইদানিং কথা বলতে শিখেছে।

ঈসা খাঁ—এ আপনাদের মত কথা-সর্বস্বদের সঙ্গে থাকার ফল। আগে পাঠানেরা কথা বলত না; কথা বলত কেবল তাদের তীর আর তলোয়ার।

মানসিংহ—ইদানিং বুঝি তাহলে পাঠানদের তীর-তলোয়ার ভোঁতা হয়ে পড়েছে!

ঈসা খাঁ—শাহী ফৌজের উপর ক্রমাগত ব্যবহারে একটু ভোঁতা হয়েছে বৈকি।

মানসিংহ—তাহলে এখন তলোয়ার ছেড়ে কাবুলী মেওয়ার কারবার শুরু করলে হয় না, খাঁ সাহেব?

ঈসা খাঁ—কিন্তু কাবুলী মেওয়া এখানে খাবে কে? মহারাজের তো বাজরার খিঁচুড়ি, আর ঘাসের রুটি খেয়ে খেয়ে পেট এমনি হয়েছে যে, কাবুলী আঙ্গুরের গন্ধেই বমি আসে।

মানসিংহ—কিন্তু খাঁ সাহেব কি কেবল কথার যুদ্ধের জন্যই তৈয়ার হয়ে এসেছেন, না আরো কোন মতলব আছে ?

ঈসা খাঁ—সে সম্পূর্ণ মহারাজের অভিরুচি। ঈসা খাঁ যে-কোন সময়ে যে-কোন স্থানে যে-কোন অস্ত্রে যে-কোন ব্যক্তির সঙ্গে লড়তে প্রস্তুত।

মানসিংহ—মনে হচ্ছে, শাহবাজ খাঁকে পরাজিত করে ঈসা খাঁর অহঙ্কার বেড়েছে। কিন্তু ঈসা খাঁ কেবল ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নাই।

ঈসা খাঁ—কিন্তু ফাঁদের সঙ্গে যে এ বান্দার কিঞ্চিৎ পরিচয় ঘটেছে—এই মাত্র সেদিন—সে তো মহারাজের অজানা থাকবার কথা নয়।

মানসিংহ—সে কথা জানি, কাপুরুষ। আমার জামাতা—এক অনভিজ্ঞ তরুণ যুবক—বাগে পেয়ে তাকে তুমি হত্যা করেছ।

ঈসা খাঁ—খবরদার, মানসিংহ। ঈসা খাঁকে 'কাপুরুষ' বলে কেউ কোনদিন রেহাই পায় নাই। আর ঈসা খাঁ নিজে পর্দার আড়াল থেকে জামাতাকে কখনো লড়াইয়ে পাঠায় নাই। কিন্তু আজ তোমাকে ক্ষমা করছি—সেই মহান যুবকের নামে, যিনি বীরের মত যুদ্ধ করে সমর শয্যা গ্রহণ করেছেন।

মানসিংহ—ভূতের মুখে রাম নাম। কিন্তু আত্মরক্ষা কর, ঈসা খাঁ।

ঈসা খাঁ—তুমিও আত্মরক্ষা কর, মানসিংহ।

[যুদ্ধ শুরু হইল—লড়িতে লড়িতে ঈসা খাঁর তলোয়ারের আঘাতে মানসিংহের তলোয়ার ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল—নিরস্ত্র মানসিংহ ভীতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

ঈসা খাঁ—এখন মহারাজকে রক্ষা করবে কে ?

মানসিংহ—কেউ না—তুমি আমায় হত্যা কর, ঈসা খাঁ।

ঈসা খাঁ—না, মহারাজ, সে হয় না। নিরস্ত্রের উপর ঈসা খাঁ ওয়ার করে না।

মানসিংহ—তবে আমাকে বন্দী কর, আমি তোমার অনুগ্রহ চাই না।

ঈসা খাঁ—তাও হয় না, মহারাজ। আপনার মত সাহসী যোদ্ধাকে বাগে পেয়ে আমি বন্দী করব না। এই নিন আমার তলোয়ার—যুদ্ধ করুন। (নিজ তলোয়ার মানসিংহের হাতে তুলিয়া দিয়া বাম কটি হইতে অন্য তলোয়ার খুলিয়া দাঁড়াইলেন।)

মানসিংহ—(একটু ভাবিয়া তলোয়ার ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন) আমি লড়ব না।

ঈসা খাঁ—কেন, মহারাজ ?

মানসিংহ—আপনার সঙ্গে আমার যুদ্ধ নাই।

ঈসা খাঁ—বটে!

মানসিংহ—ঈসা খাঁ, চমৎকার! দূর হতে তোমার কত নিন্দাই শুনেছি, ভাই; কাছে এসেও এতদিন তোমাকে চিনতে পারি নাই। আজ তোমার সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় হল, এই-ই আমার পরম লাভ! তোমাকে চিন্‌-বার আগে মরলে মানসিংহের জীবনে একটা মস্ত ফাঁক থেকে যেত।

ঈসা খাঁ—মহারাজ—ভাই—তোমার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে আমিও ধন্য।

মানসিংহ—তবে এস ভাই (আলিঙ্গন), আমাদের এই আলিঙ্গনের ভিতর দিয়ে মোগল-পাঠানে বন্ধুত্ব হোক—ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মিলন হোক—আর কখনো আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির পবিত্র বক্ষ কলঙ্কিত করব না।

—ব্রাডলী বার্ট

অনাড়ম্বর মহিমা

৬৩৮ খৃস্টাব্দ। হযরত উমর (রা.)-এর আমল। রোমক সাম্রাজ্যের এশিয়া খণ্ডের তখন রাজধানী ছিল এন্টিয়ক। মুসলমানেরা এন্টিয়ক দখল করিবার জন্য অভিযান-আয়োজনে ব্যস্ত।

রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস ভাবিলেন, যত অনর্থের মূল এই খলীফা উমর। এই দুঃসাহসী লোকটার জোরেই মুসলমানদের এত লম্ফঝম্প। একে খুন করলেই তো সব আপদ চলে যায়।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া সম্রাট ওয়াছেক নামক একজন আরবীয় যোদ্ধাকে বহু টাকা দিয়া উমর (রা.)-কে হত্যার জন্য নিযুক্ত করিলেন।

ওয়াছেক মুসলমানদের রাজধানী মদীনায় আসিয়া হাজির হইল এবং খলীফাকে হত্যা করার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

একদিন ওয়াছেক দেখিল, খলীফা একা এক গাছতলায় ঘুমাইয়া আছেন, কাছে কোথাও কোন দেহরক্ষী নাই।

ওয়াছেক মনে মনে খুশী হইয়া তলোয়ার হাতে খলীফার কাছে গেল।

কিন্তু খলীফার দিকে চাহিতেই তাঁহার এই অনাড়ম্বর মহিমার মৌন প্রভাব ওয়াছেককে এমন গভীরভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিল যে তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল, তাহার হাত হইতে তলোয়ার খসিয়া পড়িল।

এই শব্দে খলীফার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি চোখ খুলিয়া চাহিলেন। বলিলেন, 'কে?'

ওয়াছেক বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'আমীরুল মুমিনীন, আমি দুশমন, আপনাকে হত্যা করতে এসেছিলাম।'

'বটে! তারপর?'

'আপনাকে দেখে তলোয়ার হাতে রইল না, খসে পড়ল।'

'ভাল! তবে এখন কি করতে চাও?'

'যে ধর্মে মানুষকে এত বড় করে, তারই আশ্রয়ে থাকতে চাই। আমাকে দীক্ষা দিন।'

—আবদুল হাকিম খাঁ

সত্যরক্ষা

বাহরায়েনের শাসনকর্তা নো'মান বিচারাসনে উপবিষ্ট। দুইটি যুবক অপর একটি যুবককে পাকড়াও করিয়া দরবারে হাজির হইয়া বলিল:

"জাহাঁপনা, এই দুর্বৃত্ত আমাদের পিতাকে হত্যা করেছে; আমরা উপযুক্ত বিচারপ্রার্থী।"

নো'মান—উত্তম। একে বন্ধনমুক্ত করে দাও? দিয়েছ? বেশ, হাঁ, যুবক, এ অভিযোগ সত্য?

যুবক—সত্য, জাহাঁপনা, তবে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

নো'মান—বেশ, সংক্ষেপে বলতে পার।

যুবক—জাহাঁপনা, আমরা মরুবাসী আরব। দেশে আকাল, তাই পরিজনসহ জাহাঁপনার রাজ্যে এসেছি। আসার পথে একটা বাগানের ধার দিয়ে চলতে চলতে আমার একটা উট বাগানের গাছের একটা ডাল কামড়ে ধরে; আমি উট ফিরিয়ে আনছি এমন সময় একজন বৃদ্ধ অতি ক্রুদ্ধভাবে একটা বড় পাথর উটটাকে ছুঁড়ে মারে: উটটা তৎক্ষণাৎ ঢলে পড়ে ও মারা যায়। উটটা আমার বড় প্রিয় ছিল; আমি ক্রোধ সম্বরণ করতে না পেরে ঐ পাথরটা ঐ বুড়াকে ছুঁড়ে মারি। বুড়াও মারা যায়। তখন এই যুবক দুইজন আমাকে আক্রমণ করে গেরেফতার করে ও হুজুরের দরবারে নিয়ে আসে।

নো'মান—যুবক, তোমার কথাতেই তোমার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। তোমার এ অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড।

যুবক—জাহাঁপনার হক্ বিচার মাথা পেতে নিচ্ছি। তবে আমার কয়েকটি ছোট ভাই আছে; আমিই তাদের অভিভাবক। পিতা মৃত্যুকালে তাদের জন্য আমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছেন; তা আমি মাটিতে পুঁতে রেখেছি; কিন্তু কোথায় রেখেছি, তা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। আপনি যদি এখনই আমার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেন তবে এই অর্থ তারা পাবে না; আর সেজন্য আমি ও আপনি দুইজনই খোদার কাছে দায়ী হব। তাই প্রার্থনা করি,

জাহাঁপনা, আপনি আমায় আজিকার সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় দিন, যাতে আমি কাউকে ওদের অভিভাবক নিযুক্ত করে আমানত টাকাটা তার হাতে দিয়ে আসতে পারি।

নো'মান—কিন্তু সে অনুমতি দেওয়ার উপায় কোথায় যুবক? এখানে কে তোমার জামিন হবে?

যুবক—(চারিদিকে চাহিয়া কোন পরিচিত লোক না দেখিয়া) মহোদয়গণ, দয়া করে আপনাদের কেউ জামিন হন; আমি কছম করে বলছি, আমি যথাসময়ে ফিরে আসব।

নো'মানের ভাই—জাহাঁপনা! আমি এ যুবকের জামিন হচ্ছি।

নো'মান—(ভাইয়ের প্রতি) অর্বাচীন যুবক, যদি এই অজ্ঞাতনামা বেদুঈন যুবক আর ফিরে না আসে, তবে তোমার কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ?

নো'মানের ভাই—সম্পূর্ণ ভেবে দেখেছি, জাহাঁপনা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ ফিরে আসবে। আর যদি একান্ত না আসে তবে জাহাঁপনার ভাইয়ের পক্ষে একটি অজ্ঞাত অসম্পর্কিত বেদুঈনের জন্য জান দেওয়ায় জাহাঁপনার নিন্দা হবে না।

নো'মান—উত্তম। যুবক, তবে এখন যেতে পার।

যুবক কৃতজ্ঞতার অশ্রু চোখে ভরিয়া অভিবাদন করতঃ দ্রুত চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। নো'মান সভাসদ্‌সহ দরবারে উপবিষ্ট। কিন্তু এযাবৎ বেদুইন যুবকের চিহ্নও দেখা যাইতেছে না। সভাসদ্‌গণ বলিতে লাগিলেন, 'খুনী আসামী, সে কি আর ফেরে?' নো'মানের ভাই বিষণ্ণ হইলেন, নো'মান ততোধিক বিষণ্ণ হইলেন; কিন্তু বিচারের হাত রুদ্ধ হইবার নয়;—জল্লাদ তলোয়ার খুলিয়া প্রস্তুত হইল।

এমন সময় দেখা গেল, দূর হইতে একটি লোক দৌড়িয়া আসিতেছে। পরম উৎকণ্ঠার সঙ্গে সকলে সেদিকে দৃষ্টি যোজনা করিল। মুহূর্তকাল পরেই বেদুঈন যুবক হাঁপাইতে হাঁপাইতে দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

যুবক—মাফ করবেন, জাহাঁপনা, পরিজনবর্গ আমায় আস্‌তে বাধা দিয়েছিল, তাই আমার ঠিক সময়ে হাজির হতে একটু দেরি হয়ে গেল। এখন জাহাঁপনার আদেশ কাজে পরিণত করুন ও আমার জামিনদারকে মুক্তি দিন।

নো'মানের ভাই—এই অপরিচিত তরুণ যুবক নিতান্ত সঙ্গত কারণে সময় চেয়েছিল, কিন্তু কেউ তার জামিন হতে রাজী হয় নাই। তাই আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু মহত্ত্বে সে আমাকেও অতিক্রম করে গেল!

যুবকদ্বয়—জাহাঁপনা, মহত্ত্ব কি কেবল এঁদের দু'জনেরই একচেটিয়া। আমরা কি মহত্ত্বের কোনও শিক্ষা পাই নাই? আমরা আমাদের পিতার খুন মাফ করে দিলাম।

নো'মান—(চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া) তোমরা মহত্ত্বের চরম আদর্শ দেখিয়েছ ; তোমরা ধন্য! শুধু আমাকেই-বা তোমরা বঞ্চিত করবে কেন? যুবক, তুমি মুক্ত, তোমার পরিজনের কাছে ফিরে যাও। আর খাজাঞ্চী, আমার নিজ তহবিল হতে এই যুবকদ্বয়ের পিতার খুনের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দশ হাজার টাকা দাও।

যুবকদ্বয়—মাফ করবেন, জাহাঁপনা ; আমরা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যা করেছি, জাহাঁপনার নিকট হতে তার প্রতিদান গ্রহণ অসম্ভব।

—হীরকহার

নূতন মন্ত্রে

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ ভাগের কথা। ইংরেজ, ফরাসী ও ইটালী প্রভৃতি মিত্রশক্তিদের তরফ হইতে যুদ্ধের প্রথমেই ঘোষণা করা হইয়াছিল: "জগতের মুসলমানদের উদ্বেগের কারণ নাই ; যুদ্ধের ফল যাহাই হউক, তুর্ক সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ন থাকিবে।"

পরে কিন্তু দেখা গেল যে ঐ ঘোষণার আগেই মিত্রশক্তিবর্গ কাগজে-কলমে তুর্ক সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

মহাযুদ্ধের শেষ ভাগে মিত্রশক্তিরা পূর্ব বাটোয়ারা মোতাবিক তুর্ক সাম্রাজ্যে দখল লইতে চলিল। তাহারা ইস্তাম্বুল অবরোধ করিয়া বসিল। তাহাদের প্রচণ্ড চাপ সহিতে না পারিয়া খলীফা তাহাদের অধীনে খেলার পুতুল হইয়া হীন বিলাসময় জীবন যাপন করিতে রাজী হইলেন।

কিন্তু তুর্ক জাতির সকলে এ গোলামির জিঞ্জির পরিতে স্বীকৃত হইল না। ; নব্য তুর্করা চুপি চুপি ইস্তাম্বুল ত্যাগ করিল, চুপি চুপি আঙ্গোরায় একত্র হইল ; তাহার পর মুস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্বে তাহারা ঘোষণা করিল: তুরস্ক শুধু এক পথ চিনে 'হয় স্বাধীন জীবন, নাহয় স্বাধীন মৃত্যু।'

নব্য তুর্কদের ঘোষণায় সমগ্র আঙ্গোরায় দাবানল জ্বলিয়া উঠিল : দলে দলে লোক তলোয়ার হাতে মুস্তফা কামালের পতাকাতলে সমবেত হইতে লাগিল।

কেহ বলিল: ওরা সংখ্যায় অনেক, শক্তিতে প্রচণ্ড, ঐশ্বর্যে অতুলনীয়, অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত, আর আমরা একা, অর্থহীন, অস্ত্রহীন, মুষ্টিমেয়। কামাল পাশা বলিলেন: কিন্তু ওরা পাপাচারী দস্যু, পরের বাড়ী লুণ্ঠন করতে আসছে, আর আমরা আত্মগৃহরক্ষী বীর সন্তান, পবিত্র মাতৃভূমি রক্ষার জন্য তলোয়ার খুলে দাঁড়িয়েছি; আমাদের সামনে ওরা টিকবে কেন?

বাস্তবিক তখন মুস্তফা কামালের প্রধান কর্তব্যই ছিল সবাইকে প্রেরণা জোগান, কাজের বিলি-ব্যবস্থা করা ও অবিশ্বাসীকে বুঝাইয়া নতুন মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া। নিম্ন ঘটনা তাহারই একটি নমুনা। কর্নেল আরিফ সুলতানের সৈন্যের অন্যতম বিখ্যাত সেনাপতি—ইদানীং বিদায়ে আছেন। তাঁহার সঙ্গে কামাল পাশার কথা হইতেছে।

কামাল—হঠাৎ আক্রমণ করে খলীফাকে বন্দী করা—ইংরেজ ফরাসীকে তাড়িয়ে দেওয়া—সে চেষ্টা হবে একদম পাগলামি—আত্মহত্যা। না, সে পথ আমাদের নয়—কখনো নয়।

আরিফ—তবে কোন্ পথ?

কামলা—নতুন পথ—সম্পূর্ন নতুন। পুরাতন আর আমাদেরকে রক্ষা করতে পারিলে না—ওকে ত্যাগ করতে হবে—নির্মমভাবে ত্যাগ করতে হবে।

আরিফ—তারপর?

কামাল—তারপর নতুন পথ খুলে যাবে—নতুন যামানার পথ—নতুন শক্তির পথ—নতুন সমৃদ্ধির পথ—নতুন স্বপ্নের পথ—নতুন কীর্তির পথ! ওহ্! আরিফ, সে যে অভিনব—অভাবনীয়।

আরিফ—(তাঁহার চোখে আগুন জ্বলিয়াছে) তাই? কামাল, তাই হবে?

কামাল—নিশ্চয় হবে, আরিফ। সে রাজ্য যে আমরা নিজ হাতে গড়ব—দেখে-শুনে আমাদের নিজ বুদ্ধি দিয়ে, নিজ আদর্শ মোতাবিক স্বষ্টি করব।

আরিফ—তাই, কামাল, তাই?

কামান—কিন্তু আমাদের সেই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে হলে চাই আমাদের স্বাধীনতা—একদম ষোল আনা আজাদী।

আরিফ—সে ত বটেই।

কামাল—আর সেই আজাদী পেতে আমাদের কি করতে হবে, জান, আরিফ? যুদ্ধ করতে হবে।

আরিফ—(আবার তাঁহার চোখে আগুন জ্বলজ্বল) যুদ্ধ করতে হবে? (হাত অজ্ঞাতে তলোয়ারের বাঁটে)

কামাল—হাঁ, যুদ্ধ করতে হবে। আর সে সহজ যুদ্ধ নয়, আরিফ, এমন যুদ্ধ করতে হবে যা কোন যুগে কোন জাতি কোন দেশে করে নাই। সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে আমাদেরকে একা দাঁড়াতে হবে; কোন অঞ্চল হতে কোন সাহায্য পাব না—সম্পূর্ণ নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আর নিজের পায়ে আমরা দাঁড়াব বলেই জয়লাভ করব।

আরিফ—আমার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ, কামাল, কিন্তু আমি তোমার সব কথা যে ধরতে পাচ্ছি না, ভাই।

কামাল—এই টেবিলের কাছে আসুন: এই দেখুন আমার ভবিষ্যৎ কল্পনা—এই আমার যুদ্ধের প্ল্যান—এই আমার নবীন রাষ্ট্রের প্ল্যান—এই আমার বাস্তব স্বপ্নের প্ল্যান—আর এই ....

আরিফ—(উঠিয়া পায়চারি করিতে করিতে) মুস্তফা কামাল, এ দুনিয়ায় আমার কেউ নাই: আমি নাস্তিক—কোন কিছুতেই আমার বিশ্বাস নাই: আমি জগতের কাউকে ভালবাসি না: কিন্তু যদি তোমার কুকুরের দরকার থাকে, যে কখনো তোমাকে ছাড়া থাকবে না—তবে আমাকে তোমার দলে নিয়ে নেও, আমি তাই হয়ে তোমার পাশে পাশে থাকব।

—কার্কনেস

বীরের সৌজন্য

রাজপুতানার গৌরব মিবার—মিবারের গৌরব তাহার বীর্যবন্ত রাজবংশ—রাজবংশের গৌরব তাহার সুমহান সিংহাসন।

সেই সিংহাসনে আসীন রানা রাজমল্ল। কিন্তু এত ঐশ্বর্য-প্রভুত্বের মধ্যেও রানার চিত্তে শান্তি নাই—তাঁহার পূর্বপুরুষের এই গৌরবময় সিংহাসন—তাঁহার মৃত্যুর পর ইহার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নাই। রাজপুত্রদের একজন আত্মঘাতী যুদ্ধে নিহত, আর দুইজন পরস্পরের ভয়ে নিরুদ্দেশ। জ্ঞাতিভাই সূর্যমল্লকেই অগত্যা ভাবী রানা বলিয়া মনে করা যাইতেছে।

সূর্যমল্ল সহসা সিংহাসনের স্বপ্নে অধীর হইয়া উঠিলেন—রাজমল্লকে সেই কোন্ কবে যমে নিতে আসিবে, ততদিন সূর্যমল্ল অপেক্ষা করিতে রাজী নহেন।

ধর্মরাজ যত ইচ্ছা ঘুমাইয়া নিন, সূর্যমল্ল ইতোমধ্যে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিলেন।

লড়াইয়ের ময়দান। একদিকে স্বয়ং রানা রাজমল্ল আর একদিকে সূর্যমল্ল। তুমুল সংগ্রাম শুরু হইল। সূর্যমল্লের তীব্র আক্রমণে রানার সৈন্যরা ভয়ে দুলিয়া উঠিল—পরাজয় বরণ ছাড়া আর বুঝি তাহাদের গত্যন্তর নাই।

এমন সময় দেখা গেল, দিগন্ত হইতে একটি ধূলির ঝড়, তীরবেগে ময়-দানের দিকে আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে কুমার পৃথ্বীরাজ তাঁহার কোন্ নিরুদ্দেশ স্থান হইতে সহসা এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ আসিয়া হাজির। রানার সৈন্যরা নূতন উদ্যমে হুঙ্কার ছাড়িয়া দাঁড়াইল। কুমার পৃথ্বীরাজ বিপক্ষ সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করিয়া সূর্যমল্লকে আক্রমণ করিলেন। কুমারের তরবারি ও বর্শার আঘাতে সূর্যমল্লের দেহ বহু স্থানে আহত হইল।

কিন্তু সেদিন যুদ্ধ সমাপ্ত হইল না। দিনান্তে সৈন্যরা নিজ নিজ শিবিরে ফিরিয়া গেল।

শিবিরে ফিরিয়া পৃথ্বীরাজ যুদ্ধ সাজ ছাড়িলেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন।

বিশ্রামের পর কুমার একা সূর্যমল্লের শিবিরের দিকে রওনা হইলেন। সূর্য-মল্ল তাঁহার জখমগুলি নিজ নাপিত দিয়া ধোয়াইয়া ও তাহাতে ঔষধ লাগাইয়া কেবল বসিয়াছেন—এমন সময় পৃথ্বীরাজ গিয়া উপস্থিত। "এস, বাবা এস" বলিয়া সূর্যমল্ল সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

পৃথ্বীরাজ—আপনার জখমগুলি কেমন আছে, কাকা?

সূর্যমল্ল—ও যে ভাল হয়ে গেছে। তোমাকে দেখার পর কোন ব্যারাম থাক্‌তে পারে, বাবা?

পৃথ্বীরাজ—ভাল হয়ে গেছে শুনে খুব খুশী হলাম। কিন্তু কাকা, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে যে আমার, বাবার শিবিরে এখনো যাই নাই কিনা—আগেই আপনার এখানে এলাম—তাই কিছু খাই নাই।

সূর্যমল্ল—ওরে, কে আছিস কোথায়, শীগ্‌গির খাবার তৈয়ার কর—আমরা দু'জনে এক সঙ্গে খাব, বুঝলি ত? ঘরে ভাল ভাল যা কিছু আছে, সব এনে সামনে হাজির করবি।

দিনের দুশমন রাতের ছায়ায় একাসনে বসিয়া পরম তৃপ্তির সঙ্গে পানাহার সমাপন করিলেন।

বিদায়কালে পৃথ্বীরাজ সূর্যমল্লকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "কাকা, কাল পূর্বাহ্নে আমি আপনি দু'জনে লড়াই করেই যুদ্ধটা শেষ করে দেই—সৈন্য-গুলোকে আর অকারণে মরতে দেওয়া কেন?"

সূর্যমল্ল বলিলেন, "বেশ, তাই হবে, বাবা। একটু সকাল সকাল ময়দানে এস কিন্তু।"

ভ্রমভঞ্জন

আরব। পূর্ণ সূর্যগ্রহণ। নিবিড় অন্ধকার। বেলা দ্বিপ্রহর—তবু আকাশে তারা দেখা দিয়াছে। মদীনাময় বিপুল কোলাহল; এমন ব্যাপার সমগ্র আর-বের কোথাও কখনও ঘটে নাই; কেহ কখনও দেখে নাই, পিতৃ-পিতামহদের কাছে কখনও শোনে নাই।

মুসলিম-অমুসলিম সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, আজ দুনিয়ায় নিশ্চয় কোনও ভয়াবহ মহাকাণ্ড ঘটিয়াছে অথবা খোদার কোন প্রিয় পাত্রের জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়াছে। নতুবা খোদা এমন অঘটন ঘটাইবেন কেন?

পাশের একদল অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিল, "ওগো, তোমরা এখনও শোন নাই, আজ যে মুহম্মদ (স.)-এর পুত্র ইবরাহীম (রা.)-এর মৃত্যু হয়েছে?"

পূর্বদল সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "বটে! বটে!"

অবশেষে সকলে সিদ্ধান্ত করিল যে ইবরাহীম (রা.)-এর মৃত্যুর জন্য এই অদ্ভুত গ্রহণ ঘটিয়াছে। কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "বাপরে! মুহম্মদ (স.) ত যেমন তেমন পাত্র নন। তিনি খোদার রসূল ও প্রিয় পাত্র না হলে তাঁর একটুখানি শিশুপুত্রের মৃত্যুতে আল্লাহ্ এমন ব্যাপার ঘটাবেন কেন?"

কথা হযরত মুহম্মদ (স.)-এর কানে গেল। তখনও আরবে তাঁহার দুশমনের অন্ত নাই; শত্রুর সহস্র তরবারি তখনও তাঁহার মস্তকের উপর উদ্যত। অথচ আজিকার এ অদ্ভুত ঘটনায় হয়রান হইয়া তাহারাও তাঁহার মাহাত্ম্য চিন্তা করি-তেছে, তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়াছে। অজ্ঞ, সহস্র কুসংস্কারে আচ্ছন্ন আরব—আজ যদি হযরত (স.) কিছু না বলিয়া শুধু চুপ করিয়া থাকিতেন, তবু তাহাদের

নিকট তাঁহার মাহাত্ম্য লক্ষগুণে বাড়িয়া যাইত, হয়ত তাঁহার দুশমন শ্রেণী হইতে দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিত।

কিন্তু সত্যের সাধনাই যাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল, এ প্রলোভনের কল্পনাও তাঁহার চিন্তার ত্রিসীমায় পৌঁছিতে পারিল না। বরং তাঁহার মোহগ্রস্ত দেশ-বাসীর শোচনীয় অজ্ঞতায় তিনি পরম ব্যথিত হইলেন।

তিনি তখনই সকলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; দলে দলে লোক আসিয়া মসজিদে জমা হইল। তিনি সকলকে লইয়া নামায পড়িলেন এবং সর্বশেষে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:

"চন্দ্র সূর্য খোদার নিদর্শন মাত্র; তাঁহারই আদেশে তাহারা আসে যায়, কাহারও জীবন-মরণের জন্য উহাতে গ্রহণ লাগে না। তোমরা এমন ব্যাপার দেখিলে খোদাকে স্মরণ করিও, নামায পড়িও।"

—হীরকহার

দুর্গম পথের যাত্রী

[১ম ভাগ]

বাবর আবাল্য বিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন। অল্পবয়স হইতেই তাঁহাকে তলোয়ার হাতে দেশ-বিদেশে ফিরিতে হইয়াছে। এমনই ভাবে একবার তিনি খোরাসানে গেলেন। কিন্তু সেখানে বেশীদিন টিকিতে পারিলেন না, তাঁহাকে কাবুল যাত্রা করিতে হইল। তখন ভয়ানক শীত পড়িয়াছে—পার্বত্য পথ—কঠিন—বিপজ্জনক। বাবর আত্মজীবনীতে এই দুর্গম পথের অংশবিশেষের নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন:

"আমরা মীর গিয়াসের লঙ্গরখানা ছাড়লাম। মুসাফিরখানা হতে গারিস্তান পর্যন্ত কেবল বরফ আর বরফ—যেন বরফের একটা বিরাট শ্বেতচাদর দিয়ে সব ঢাকা। যতই সামনে যাই, বরফের গভীরতা ততই বাড়ে। দুই মঞ্জিল যাওয়ার পর বরফ ঘোড়ার জিনের রেকাব পর্যন্ত গিয়ে ঠেকল। কোন কোন জায়গায় এমন দেখা গেল যে ঘোড়ার পা আর মাটি ছোঁয় না!

বরফের উপর দিয়ে আমরা সাতদিন পর্যন্ত এগিয়ে চল্লাম—সমস্ত দিনে দুই তিন মাইলের বেশী যাওয়া সম্ভব হত না। বরফ মাড়িয়ে যাদের উপর পথ করার ভার ছিল, তাদের মধ্যে আমি ছিলাম একজন। আমার সঙ্গে কাসেম বেগ, কম্বর আলী আর কয়েকটি চাকর ছিল। এরা বরফ মাড়িয়ে মাড়িয়ে সাত আট গজ এগিয়ে যেত—প্রত্যেক পদক্ষেপে এরা বরফের মধ্যে প্রায় বুক পর্যন্ত ডুবে যেত। কয়েক পদ যাওয়ার পরই সামনের জন হয়রান হয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াত; তখন পেছন হতে আর একজন এগিয়ে যেত। দশ হতে কুড়িজন পর্যন্ত মাড়িয়ে মাড়িয়ে বরফের ভিতর পথ করার পর তবে সেই পথে একটা ঘোড়াকে নিয়ে যাওয়া যেত। ঘোড়া বরফে পাদানি পর্যন্ত গেড়ে যেত; দশ বারো কদমের বেশী অগ্রসর হতে পারত না। তখন সেটাকে পথের এক পাশে রেখে দিয়ে অন্যটির জন্য রাস্তা করা হত। এরপর কয়েকজন সাহসী সাথী ফের মাড়িয়ে মাড়িয়ে রাস্তা তৈরীর কাজে লেগে যেত। কাউকে ধমক দিয়ে কাজ করানোর সময় এ ছিল না। যাদের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও শ্রমশীলতা আছে তারা এসব কাজ আপনা আপনিই করে থাকে। এভাবে বরফের ভিতর দিয়ে পথ কেটে আমরা তিন চার দিনের মধ্যে জিরিন গিরিবর্ত্মের নিম্নস্থ গুহায় এসে পৌছলাম।

সহসা ভীষণ ঝড় শুরু হল। আকাশ ফেটে বরফ পড়তে লাগল। হাওয়া গায়ের হাড় পর্যন্ত কাঁপাতে আরম্ভ করল। আমরা প্রত্যেকেই মনে করলাম—আর রক্ষা নাই, এইবার শেষ। আমরা গুহার মুখের সামনে ঘোড়া হতে নামলাম। গভীর বরফ! একজনের রাস্তা! আবার সেই এত কষ্টে তৈয়ার করা রাস্তাতেও ঘোড়ার পা ঢুকে যেতে পারে! সন্ধ্যার আগেই প্রথম দল গুহার দুয়ারে পৌছল: মাগরিব হতে দুপুর রাত পর্যন্ত একে একে সৈন্যরা আসতেই লাগলো। তারপর যে যেখানে পারল ঘোড়া হতে নেমে পড়ল। প্রভাত পর্যন্ত অনেকে ঘোড়ার উপরই রইল।

"শোনা গেল যে, গুহাটি ছোট। তাই আমি একটি কোদাল হাতে নিয়ে গুহার মুখের কাছেই বরফের মধ্যে একটি গর্ত করে নিলাম; বুক পর্যন্ত কেটেও নীচে মাটি পাওয়া গেল না। সেই নিদারুণ ঠাণ্ডা বাতাসের জুলুম হতে আমি এই গর্তে একটু আশ্রয় পেলাম। সকলে বার বার আমাকে ডাকছিল, 'গুহার ভিতরে আসুন—গুহার ভিতরে আসুন।' কিন্তু আমি গেলাম না। কারণ আমি ভাবলাম, 'আমার কতক লোকলশ্কর বাইরে বরফ ও ঝড়ে কষ্ট পাবে, আর আমি গুহার ভিতরে বসে আরাম করব, এ হয় না। আমি তাদের সুখ-দুঃখের

সাথীই থাকব। দুঃখ-কষ্ট যা আসুক, আমি নির্ভয়ে তার সম্মুখীন হব; শক্ত সাহসী মানুষেরা যা সইতে পারে, আমিও তা সইব।' এশার নামাযের ওয়াক্ত পর্যন্ত আমি বাইরে সেই দুরন্ত বরফ ও ঝড়ের মধ্যেই গর্তে রইলাম। বরফ এত প্রচুর ঝরছিল যে আমার মাথা, পিঠ ও কানের উপর চার ইঞ্চি পুরু হয়ে বরফ পড়ল। একজন সঙ্গী গুহার ভিতর ভাল করে চেয়ে দেখে চীৎকার করে উঠল —'আরে এ যে মস্ত বড় গুহা—সবাইকে ধরবে।' আমি তখন আমার গায়ের বরফ ঝেড়ে আর সবার সঙ্গে গুহার ভিতরে গেলাম।

"পরদিন ঝড় ও বরফ পড়া বন্ধ হল। আমরা ফের যাত্রা করলাম। আবার মাড়িয়ে মাড়িয়ে বরফের ভিতর পথ করে আমরা চল্লাম। আমরা সন্ধ্যার সময় গিরিপথের ওপার পৌঁছলাম।

"উপত্যকার মুখে আমাদের রাত্রি কাটল। পরদিন প্রত্যুষে আমরা পথে বার হলাম। আল্লাহ্‌র দয়ার উপর নির্ভর করে আমরা সোজা নীচের দিকে চল্লাম। পথ উঁচু নীচু, তাতে গর্ত ইত্যাদি কিছুরই অভাব ছিল না। আমরা বুঝতে ছিলাম যে এ ঠিক পথ হতে পারে না। কিন্তু তবু আমাদেরকে সেই পথেই নামতে হল। মাগরিবের নামাযের সময় আমরা উপত্যকার বাইরে এলাম।

"ওখানকার যারা সবচেয়ে বুড়ো মানুষ, তারাও বলতে পারলে না যে কোন কালে কোন মানুষ অমন গভীর বরফের ভিতর দিয়ে ঐ পথ অতিক্রম করেছে। ঐ ভীষণ শীতের সময় যে ঐ পর্বত পার হওয়ার কল্পনা কেউ করতে পারে, এও তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না।"

—বাবরনামা

তাঁহারই পুণ্য মহিমা-গাথায় উছলিয়া উঠে সুর

আকবর বাদশার দরবার-এ-নওরতনের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন—তানসেন—ভারতের অদ্বিতীয় সঙ্গীতবিশারদ—সম্রাটের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

তানসেনের ওস্তাদ হরিদাস—অতুলনীয় সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ, গভীর তত্ত্বদর্শী, সুমহান ভক্ত।

একদা আকবর বলিলেন, "বন্ধু তানসেন, চলুন, আজ গুরুজীর সঙ্গীত শুনে আসি।" 'জাহাঁপনার হুকুম' বলিয়া তানসেন সঙ্গে রওনা হইলেন আশ্রমের দিকে—কারণ হরিদাস বাহিরে কোথাও যাইতেন না।

উভয়ে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের আগমনের কারণ জ্ঞাপন করিলেন। হরিদাস চুপ।

তানসেন গুনগুন সুরে কি আলাপ শুরু করিলেন—তাঁহার গুরুকে গানে নামাইবার ঐ-ই ছিল পথ।

হরিদাসের চিত্তের দরিয়ায় মত্ত তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, তাঁহার কণ্ঠ ফাটিয়া অপূর্ব সুর লহরীতে ভজন গান আশ্রমের আকাশ-বাতাসকে উতলা করিয়া তুলিল, সম্রাট তন্ময় হইয়া শুনিলেন।

আকবর ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু হরিদাসের গানের রেশ তাঁহার কানে লাগিয়াই রহিল।

বাদশাহ্ বলিলেন, "তানসেন, গাও ত ভাই সেই গান—ওস্তাদের সেই মন-মাতানো গান।"

তানসেন সুর ধরিলেন। তাঁহার অপূর্ব কণ্ঠ, অপূর্ব সুরজ্ঞান, অপূর্ব সাধনা—সব মিলে তাঁহার গানকে অপূর্ব করিয়া তুলিল: রাজসভায় ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। শুধু স্বয়ং সম্রাট নির্বাক।

অবশেষে আকবর বলিলেন, "অদ্ভুত সুন্দর গেয়েছ, তানসেন; কিন্তু তবু—তবু কোথায় যেন কি জিনিসের অভাব যার জন্য এত চেষ্টায়ও গুরু হরিদাসের অপূর্ব সঙ্গীতের সমপর্যায়ে উঠতে পারলে না।"

গম্ভীরভাবে তানসেন উত্তর দিলেন, "সত্যই তা অসম্ভব, সম্রাট। গুরুর সঙ্গীত যে উৎসারিত হয়েছিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির স্তবের জন্য আর আমার সঙ্গীত গীত হয়েছে একজন মানুষের তুষ্টির জন্য।"

রিচার্ডের অন্তিম মহত্ত্ব

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে 'সিংহ-হৃদয়' রিচার্ডের নাম অপরিসীম বীরত্ব এবং দুরন্ত সাহসের জন্য অমর হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল প্রথম রিচার্ড, যুদ্ধে বীরত্বের জন্যই তিনি পরে সিংহ-হৃদয় রিচার্ড নামে পরিচিত হন। কিন্তু শুধু সাহস ও বীরত্বই মানুষকে মহৎ করিয়া তোলে না, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তাঁহার সবচেয়ে বড় শত্রুকে ক্ষমা করিয়া রিচার্ড এক মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

লিমোজেসের ভাইকাউন্ট ভিদোমার তাঁহার ভূমিতে লুক্কায়িত ধনসম্পদ পাইয়াছেন। দেশের রাজা রিচার্ড আইন অনুসারে এই সম্পদের অংশের দাবীদার; কিন্তু ভিদোমার কিছুতেই তাহা দিতে রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমার জমিতে আমি অর্থ পেয়েছি, এর সম্পূর্ণ মালিক আমি; এ অর্থে রাজার কোনও অধিকার নাই।"

এদিকে নানারূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া রিচার্ডের রাজকোষে অর্থের বিশেষ অনটন। রিচার্ড অবশেষে সৈন্য-সামন্ত লইয়া ভিদোমারের বাসভবন 'চালুজের প্রাসাদ' অবরোধ করিলেন এবং সেখানে তাঁবু গাড়িয়া বসিয়া প্রাসাদ আক্রমণ করিবার ফন্দি খুঁজিতে লাগিলেন।

একদিন রিচার্ড প্রাসাদের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথাও দেওয়াল ভেদ করা যায় কিনা পরীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়াইয়া বার্ট্রাণ্ড দ্য গুর্দন নামে এক ব্যক্তি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিল। তীর রাজার স্কন্ধে আসিয়া বিদ্ধ হইল। আঘাত যা হইল সে সামান্যই, কিন্তু অযত্নের ফলে ক্রমে ক্রমে তাহা ভীষণ আকার ধারণ করিতে লাগিল।

শেষ পর্যন্ত এই ঘা এমন মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল যে রিচার্ডের জীবন-সংকট উপস্থিত হইল। রিচার্ডের সৈন্যরা অবশেষে ভিদোমারের প্রাসাদ অধিকার করিল। কিন্তু রিচার্ড তখন তাঁহার রোগশয্যায় শায়িত।

এমন সময় একদা তাঁহার অনুচররা বার্ট্র্যাণ্ড দ্য গুর্দুনকে ধরিয়া তাঁহার নিকট লইয়া আসিল। রিচার্ড তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুর্বৃত্ত, আমি তোমার কি অনিষ্ট করেছি যে তুমি আমার জীবননাশে উদ্যত হয়েছিলে?"

সে উত্তর করিল, "তুমি নিজের হাতে আমার পিতা ও দুইজন ভাইকে হত্যা করেছ। সে কথা আমি ভুলি নাই। তোমাকে তারই উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়ার জন্য আমি জীবনপণ করেছি। আমি এখন তোমার হাতে বন্দী। তোমার যে-কোনও প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা, নিতে পার। তুমি পাপিষ্ঠ, তোমার মৃত্যু ঘটানোর জন্য আমি সমস্ত নির্যাতন সহ্য করতে প্রস্তুত আছি।"

যুবকের উক্তি মৃত্যুশয্যায় শায়িত রিচার্ডের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করিল। সত্য সত্যই কি তিনি পাপিষ্ঠ? সত্য সত্যই কি তিনি বহু লোকের দুঃখ-কষ্টের কারণ হইয়াছেন? তিনি ভাবিলেন—সত্যই তিনি সারা জীবন যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া হয়তো এমনি আরও কত লোকের আত্মীয়-পরিজনকে নিহত করিয়াছেন। যুবককে তিনি আর আঘাত করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করতেছি।" ... ...তারপর তাঁহার অনুচরদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এর শৃংখল মুক্ত কর এবং আমার কোষ হতে একে একশত শিলিং-এর মুদ্রা এনে দাও।"

যুবক রাজার এ দাক্ষিণ্য গ্রহণ করিতে রাজী হইল না। ক্রোধের সহিত বলিল, "আমি তোমার দয়া চাই না, আমার তরবারি চাই।"

মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িবার পূর্বে রিচার্ড অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, "তোমাকে হত্যা করতে আমার মন সরছে না। তুমি আমার দান গ্রহণ করে বেঁচে থাকো।"

মুক্তি লাভ করা গুর্দুনের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। রিচার্ডের মৃত্যুর পর তাঁহার অনুচরগণ তাঁহাকে কোনরূপ দয়া প্রদর্শন করিল না। কয়েক দিন পরেই তাহাকে হত্যা করা হইল।

কিন্তু মৃত্যুশয্যায় নিজের আততায়ীকে সম্মুখে পাইয়াও তাহার প্রতি এই ক্ষমা রিচার্ডকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

বুদ্ধ-যশোধরা

[গৌতম-মিলন]

দীর্ঘ সাত বৎসর গৌতম সত্যের অনুসন্ধানে নানা স্থানে নানা ব্যক্তির নিকট গেলেন; অনেক কঠোর তপস্যা করিলেন। অবশেষে একদা রাত্রিতে যখন অশথ বৃক্ষের তলে তিনি ধ্যানস্থ ছিলেন, তখন জগৎ-রহস্য তিনি বুঝিতে পারিলেন, নিখিল জ্ঞান তাঁহার নিকট ধরা দিল। তখন হইতে তাঁহার পুরাতন নাম বিলুপ্ত হইল, তিনি "বুদ্ধ" (অর্থাৎ সম্যক জ্ঞানী) নামেই পরিচিত হইলেন।

বুদ্ধত্ব লাভের মহাক্ষণে তিনি জানিতে পারিলেন যে, তৃষ্ণাই দুঃখের মূল। ভোগ-বাসনার তৃষ্ণাই জীবকে সংসার-চক্রে আবদ্ধ করিয়া রাখে এবং অবশেষে যন্ত্রণা দেয়। তৃষ্ণা ছাড়িলেই মানব মুক্ত হইতে পারে। মুক্তির নাম তিনি দিলেন "নির্বাণ" এবং যে পথে চলিলে মুক্তি লাভ করা যায় তাহার নাম দিলেন "শান্তিমার্গ"।

এখন যে স্থান "বুদ্ধগয়া" নামে পরিচিত, সেখানেই গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এখন সেখানে একটি প্রাচীন মন্দির আছে এবং উহার পাশে আছে বোধিদ্রুম। যে বৃক্ষের তলে গৌতম জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, বর্তমান বোধিদ্রুম তাহার একটি শাখা হইতে জাত। বুদ্ধত্ব লাভের পরেও সিদ্ধার্থ কয়েক দিন পর্যন্ত সেই স্থানেই রহিলেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা মনে মনে স্থির করিয়া লইলেন। বুদ্ধগয়া ছাড়িয়া প্রথমেই তিনি বারাণসীর নিকটে "মৃগদাব" (বর্ত-মান 'সারনাথ') নামক স্থানে গেলেন এবং সেখানে পাঁচশত সন্ন্যাসীর সমক্ষে নিজ মত প্রচার করিলেন। তখন হইতেই তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল এবং তাঁহার বহু শিষ্য জুটিতে লাগিল।

কপিলাবস্তুযাত্রী দুই সওদাগরের নাগাল পাইয়া গৌতম তাঁহার পিতা ও পত্নীকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি অচিরে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। সুদীর্ঘ সাত বৎসর পরে গৌতমের সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধ রাজা এবং যশোধরার আনন্দের সীমা রহিল না। পুত্রকে রাজোচিত সম্মানে অভ্যর্থনা করিবার জন্য

শুদ্ধোধন রাজপুরী সুসজ্জিত করিলেন এবং সৈন্য-সামন্ত প্রস্তুত রাখিলেন। গৌতমের আগমন প্রতীক্ষায় নগরের সমস্ত লোক যখন রাস্তার দুই পাশে নিশান, ফুলের মালা প্রভৃতি লইয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অশ্বারোহী সৈন্যেরা যখন ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছিল, তখন দেখা গেল সর্বাঙ্গ গৈরিক বস্ত্রে আচ্ছাদিত এবং ভিক্ষা পাত্র হাতে করিয়া এক সন্ন্যাসী আসিতে-ছেন। তিনি রাজার সম্মুখ দিয়া গেলেন। ইনিই তো সেই গৌতম যিনি সাত বছর আগে নিশীথে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ "বুদ্ধ" হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বুদ্ধ থামিলেন না। তিনি সরাসরি রাজপ্রাসাদে ঢুকিয়া একেবারে নিজের কামরায় গিয়া স্ত্রী-পুত্রের সম্মুখে হাজির হইলেন। যশোধরাও গৈরিক পরিহিতা। যে প্রভাতে জাগিয়া তিনি জানিলেন গৌতম গৃহত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই রাজপ্রাসাদে থাকিয়াও তিনি সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছিলেন। তিনি শুধু ফলমূল খাইতেন এবং ভূমিশয্যায় শুইতেন। সমস্ত অলঙ্কারপত্র তিনি খুলিয়া রাখিয়াছিলেন।

যশোধরা নতজানু হইয়া বুদ্ধকে প্রণাম করিলেন—তাঁহার বাঁ দিকের বস্ত্রখণ্ড চুম্বন করিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা অল্পই হইল। বুদ্ধ যশোধরাকে আশীর্বাদ করিয়া সেখান হইতে বাহির হইলেন। তখন যেন যশোধরা স্বপ্ন হইতে জাগিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ছেলেকে ডাকিয়া কহিলেন, "যাও বাছা, শিগ্‌গির যাও, তোমার পিতার নিকট থেকে তোমার উত্তরাধিকার চেয়ে নাওগে।"

মুণ্ডিত মস্তক ও গৈরিক পরিহিত অনেক লোক একত্র দেখিয়া বালক থতমত খাইয়াছিল। সভয়ে বলিল, "কোন্ ব্যক্তি আমার পিতা?"

যশোধরা বুদ্ধকে দেখাইয়া দিলেন না, কিংবা তাহার পোশাক ও চেহারা কিছুই বর্ণনা করিলেন না। শুধু কহিলেন, "জনতার মধ্যে যিনি সিংহ-তুল্য, তিনিই তোমার পিতা।"

বালক তখন সোজা বুদ্ধের নিকট গিয়া কহিল, "বাবা, আমার উত্তরাধিকার কি দেবেন দিন।" বালক তিনবার এ কথা বলিবার পর বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিতে পারি কি?" বুদ্ধ বলিলেন, "দাও।" আনন্দ তখন বালককে গৈরিক বসন পরাইয়া দিলেন।

তখন তাঁহারা পিছনে তাকাইয়া দেখিলেন, বালকের মাতাও নীরবে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মুখ ঘোমটায় ঢাকা থাকিলেও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল যে তিনি

স্বামীর অনুগামিনী হইতে চাহেন। কোমল হৃদয় আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, স্ত্রীলোকেরা কি সংঘে প্রবেশ করিতে পারেন না?"

বুদ্ধ উত্তর করিলেন, "এ প্রশ্ন কেন, আনন্দ? স্ত্রীলোকেরাও কি ত্রিবিধ দুঃখ ভোগ করেন না? তাঁরা কেন শান্তিমার্গে চলতে পারবেন না? আমার ধর্ম, আমার সংঘ সকলের জন্য। আনন্দ, তবু এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে ভালই করেছ।"

যশোধরাও সংঘে প্রবেশ করিলেন এবং স্বামীর বাসস্থানের নিকটে থাকিবার অনুমতি পাইলেন। এইরূপে তাঁহার সুদীর্ঘ বিরহের অবসান ঘটিল। তিনিও শান্তিপথের যাত্রী হইলেন।

সত্যের তরে রাজী যারা দিতে বাচ্চারে কুরবান

প্রশস্ত সুন্দর ললাট, এই যৌবনেই তাহাতে চিন্তার রেখা পরিস্ফুট। সুনীল আয়ত নয়ন—মাঝে মাঝে দৃষ্টি যেন ধ্যানের কোন্ অতল তলে হারাইয়া যায়; যখন ফিরিয়া আসে, তখন সে দৃষ্টিতে ঝরে স্নিগ্ধ ঝিলিমিলি, অনন্ত করুণা, অফুরন্ত স্নেহ। আবার কখনও-বা তাহা বিদ্যুতের মত চমক দিয়া উঠে, যাহার দিকে চায় তীক্ষ্ণবাণের মত তাহার রক্ত-মাংস-হাড় ভেদ করিয়া অন্তরে গিয়া প্রবেশ করে, অধরে মৃদু হাসির অম্লান ফুল ফুটিয়াই আছে, মাঝে মাঝে দৃঢ়বদ্ধ অধর-ওষ্ঠে জাগিয়া উঠে অটল সংকল্পের সুস্পষ্ট চিহ্ন, সত্যে অটল নিষ্ঠা, ব্যথাতুরের অশ্রু মুছাইতে দুই বাহু সদা প্রসারিত; মক্কার সকলেই জানিত—এই প্রিয়ভাষী সুদর্শন যুবক আবদুল্লাহ্-তনয় মুহম্মদ (স.)। সকলে মিলিয়া তাঁহাকে উপাধি দিল 'আল-আমীন' —বিশ্বস্ত। সকলে তাঁহাকে স্নেহ করিত, ভালবাসিত, শ্রদ্ধার চোখে দেখিত, মনে মনে ভাবিত—আহা! এমন আর হয় না।

কিন্তু একদিন সহসা গোল বাধিয়া উঠিল। হযরত মুহম্মদ (স.) তাঁহার দেশ-বাসীকে আহ্বান করিলেন, বলিলেন জড় পূজা ছাড়; বিশ্বপ্রভু এক, কেবল তাঁরই নিকট মস্তক নত কর। আমি তাঁরই বাণীর বাহক, পাপপথ, দুর্নীতি, অনাচার, কন্যা হত্যা ত্যাগ কর, বল আমরা সবাই একই আল্লাহ্‌র বান্দা, আমরা সবাই সমান, আমরা সবাই ভাই ভাই।

কেহ কেহ এ বাণী গ্রহণ করিল। কিন্তু সনাতনীরা ক্ষেপিয়া উঠিল— কি! বাপদাদা চৌদ্দপুরুষেরা এতকাল যা করে এসেছে, তার উপর কথা? ঐ ধর্মদ্রোহীর জন্য উপযুক্ত শাস্তির বিধান কর।

তাহাই হইল। নিন্দা, ধমক, অত্যাচার, নির্বাসন, অবশেষে হত্যা-ব্যবস্থা; সনাতনীরা সবই করিল। কিন্তু সত্যের সৈনিক নির্ভীক চিত্তে তাঁহার প্রভুর বাণী বহন করিয়াই চলিলেন। যাহারা তাঁহার প্রচারিত সত্যে আশ্রয় লইল, তাহারা কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল—যে সত্য আমরা পাইয়াছি, তাহা আমরা বহন করিব, রক্ষা করিব জীবনে ও মৃত্যুতে। সনাতনী ও সত্যাশ্রয়ীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের অবধি রহিল না। সনাতনীরা তরবারি হাতে ছুটিল সত্যাশ্রয়ীদিগকে ধ্বংস করিতে, সত্যাশ্রয়ীরা বর্ম হাতে দাঁড়াইল আত্মরক্ষা করিতে, সত্যরক্ষা করিতে।

অনেকদিন পরের কথা। তখন সত্যের জয় হইয়াছে, সমগ্র আরব ইস-লামের শান্তির ছায়াতলে সমবেত হইয়াছে। দশ বৎসর আগে যাহারা গলা কাটাকাটি করিয়াছে, আজ তাহারা গলা জড়াজড়ি করিতেছে। আজ তাহারা তাহাদের সেই দুর্দিনের কীর্তি-কাহিনীর কথা বলে, শোনে, হাসে, অশ্রুপাত করে।

ভরা বৈঠকে এমনি একদিন আলোচনা চলিতেছিল। বৈঠকে সেদিন উপস্থিত ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)—রসুলুল্লাহ্ (স.)-এর বাল্যবন্ধু, দুর্দিনের সহচর, ইসলামের সর্বপ্রথম অনুগামীদের অন্যতম, আর ছিলেন তাঁহার বীর পুত্র আবদুর রহমান (রা.)—পূর্বে ইসলামের পরম শত্রু, এক্ষণে পরম অনুরক্ত ভক্ত। বদরের যুদ্ধে এই আবদুর রহমান (রা.)-কে পিতার বিরুদ্ধে থাকিয়া কি ভীষণ লড়াই না করিতে দেখা গিয়াছে!

কথা প্রসঙ্গে আবদুর রহমান (রা.) বলিয়া উঠিলেন, "বাবা বদরের যুদ্ধে কয়েকবার আপনি আমার মারের মুখে পড়েছিলেন, কিন্তু আমি রাশ টেনে ঘোড়ার বাগ ফিরিয়ে নিয়েছি।"

আবু বকর (রা.) হঠাৎ গম্ভীর হইয়া ওজস্বিতার সঙ্গে বলিলেন, "তুমি যদি আমার মারের মুখে পড়তে, তবে কিন্তু তোমার রক্ষা ছিল না। আমরা ছিলাম সত্যে, আর তোমরা ছিলে অসত্যে; পুত্রস্নেহকে সত্যের মর্যাদার উপরে স্থান দিতে পারতাম না।"

—হযরত আবু বকর স্মরণে — হ্যরইয়াত ইসলাম

একটি মহান মানব

বাগদাদের খলীফা ছাফ্‌ফা: সাহসী, নিষ্ঠুর, দুর্বার—নিজ প্রভুত্ব কায়েম ও উমাইয়াদের প্রভুত্ব উৎখাত করিতে কোন চেষ্টাই বাকী রাখেন নাই।

সেই ছাফ্‌ফা সেদিন, বাগান বাড়ীতে: মেজাজ খোশ, চারিদিকে বন্ধু-বান্ধব; তাহাদের মধ্যে শাহ্‌যাদা ইব্রাহীমও আছেন—খলীফার দুশমনের পুত্র—এক্ষণে তাঁহারই আশ্রিত।

কিছুক্ষণ খোশগল্পের পর খলীফা কহিলেন, "কোন মহৎ মানুষের কেচ্ছা-কাহিনী কেউ জানলে তাই একটু বল না, শুনি।"

শাহ্‌যাদা ইব্রাহীম সালাম করিয়া কহিলেন, "আমি জীবনে দুইজন মহত্তম মানুষ দেখেছি: একজন জাহাঁপনা, কারণ জাহাঁপনা জীবন দান করে থাকেন; আর একজন—আহা! সে অপূর্ব অচিন্তনীয়॥"

সকলে শুনিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। খলীফা বলিলেন, "তাড়াতাড়ি কর, বাবা, আমরা সবাই উদগ্রীব।"

শাহ্‌যাদা শুরু করিলেন: "তখন জাহাঁপনার রোষ উদ্যত বজ্রের মত আমার মাথার উপর গর্জন করছে। আমি সন্ত্রস্ত চিত্তে এক গ্রামে গিয়ে আত্মগোপন করলাম। একদিন শুনি, খলীফার পুলিশ ফৌজ আমার খোঁজে ঝোপ-জঙ্গল, গ্রাম সব তছনছ করে চলছে। আরও শুনলাম তারা প্রায় আমার ঘাড়ের উপর এসেই পড়েছে।

এখন উপায়? আর কোন পথ না পেয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে কুফা শহরে ঢুকে পড়লাম। ভাবলাম, এই লাখ লাখ মানুষের দরিয়ায় কোথায় আমি হারিয়ে যাব, পুলিশের কি সাধ্য আমাকে খুঁজে বের করে?

কিন্তু শহরে উপস্থিত হওয়া মাত্র আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। মনে হল যেন সমস্ত লোক সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাদের দৃষ্টি হানছে। আমি একে ত ভয়ানক হয়রান, তার উপর এই ভয়; জান হাতে নিয়ে দ্রুত চলছি, এমন সময় হোঁচট খেয়ে এক বাড়ীর দরজায় পড়ে গেলাম। তারপর একদম অজ্ঞান।

অনেকক্ষণ পরে আমার হুঁশ হল। তখন চেয়ে দেখি, আমি সেই বাড়ীর দালানের একটি কোঠায় সুন্দর দামী বিছানার উপরে শয়ান। বাড়ীর মালিক বিছানার পাশে আমার মাথার কাছে বসা ছিলেন; আমাকে চোখ খুলতে দেখে আনন্দে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; স্নিগ্ধ কণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছিল, বাছা?

আমি বললাম, আমি ভয়ানক বিপদে আছি। আমার জীবন নিয়ে টানা-টানি; আমায় আশ্রয় দিন—রক্ষা করুন।

গৃহস্বামী আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে গভীর দরদের সঙ্গে বললেন, আগে আল্লাহ্ আছে, পরে আমি আছি, ভয় নাই। যতদিন ইচ্ছা, তুমি এখানে থেকে যাও, কেউ তোমার কথা জানবে না, কেউ তোমার কেশ স্পর্শ করতে পারবে না।

সেখানেই রইলাম। দিনও আরামেই কাটছিল। কিন্তু সেখানেও হঠাৎ একদিন বিনামেঘে বজ্রপাত হল।

কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করছিলাম, আমার আশ্রয়দাতা ভোরে উঠে কিছু খেয়ে নেন, তারপর তাড়াতাড়ি বের হয়ে যান, আর সন্ধ্যায় ফিরেন—তখন তার দেহ ক্লান্তিতে ভরা, মন নৈরাশ্যে তিক্ত। আমার কৌতূহল হল।

একদিন একলা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে আপনি আশ্রয় দিয়েছেন, সে উপকারের শুকরিয়া আদায়ের সাধ্য আমার নাই। কিন্তু আপনি এই যে কি কারণে যেন বিশেষ চিন্তা-ভাবনায় ভুগছেন, আমি তার একটু ভার বহন করতে চাই—এ আমার পবিত্র কর্তব্য। আমায় দয়া করে বলুন। কেন রোজ সকালে বের হয়ে যান, আর বিকালে এত বিরক্ত হয়ে ফিরেন?

আমার আশ্রয়দাতা গম্ভীর হয়ে বললেন, সে এক দুঃখের কাহিনী। শাহ্-যাদা ইব্রাহীম আমার পিতাকে হত্যা করে। আমি এই হত্যার প্রতিশোধের জন্য সুযোগ খুঁজছিলাম। ইব্রাহীমের রক্ত না দেখলে আমি কিছুতেই আমার মনকে শান্ত করতে পারছি না।

ইতোমধ্যে শুনলাম, খলীফা ঘোষণা করেছেন, শাহ্যাদা ইব্রাহীমের কল্লার দাম লাখ টাকা; জীবিত ধরে নিয়ে দিতে পারলে আরও বড় পুরস্কার। আরও জানা গেল, শাহ্যাদা এই শহরেই কোথায় লুকিয়ে আছে। আমি এ কয়দিন ধরে তারই খোজে বেরিয়ে যাচ্ছি। কারণ তাকে পেলে আমার প্রতিশোধ গ্রহণও হয়, বেশ কিছু টাকাও মিলে।

আমি ভাবলাম, হায়রে কপাল! বাঘের হাত হতে বাঁচবার আশায় আমি সিংহের গুহায় এসে ঢুকেছি। কিন্তু না,--আর না; আর এ জীবনের জন্য মায়া করব না। এত মানুষ যখন এই জানটুকুর জন্য এত উদগ্রীব, বেশ তা তারা নিয়ে নিক। এই আশ্রয়দাতার এত নিমক খেয়েছি, এত স্নেহ পেয়েছি, এঁর কাছে আর কিছুই গোপন রাখতে পারব না।

আমি আমার মনকে শক্ত করে ফেল্লাম; আমার সকংল্প স্থির হয়ে গেল। আশ্রয়দাতাকে বললাম, জনাব, আর তকলীফ করবেন না, আমিই সেই শাহ্যাদা ইব্রাহীম--আমিই আপনার পিতাকে হত্যা করেছিলাম।

আমার আশ্রয়দাতা তো হেসেই খুন। আমাকে পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, কি হয়েছে, ভাই? কেন তোমার জীবনের মায়া এ বয়সে এত কমে গেল? বিবির সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ী ছেড়েছ?

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, বিশ্বাস করুন, জনাব, আমি সত্যই শাহযাদা ইব্রাহীম। কুফার শাসনকর্তা থাকাকালে আমিই আপনার পিতাকে ... ...কারণে হত্যা করেছিলাম।

সহসা আমার আশ্রয়দাতার মুখ-চোখ হতে জীবনের আলো নিভে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে অন্দরে চলে গেলেন।

আমি একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, যাক ভালই হল; অন্তত একটা সদাশয় লোকের হাতে জীবনটা যাবে।

একটু পর--আমার আশ্রয়দাতা বের হয়ে এলেন। আমার কাছে চুপি চুপি বললেন, আমার চোখের সামনে তোমাকে থাকতে দিতে আমার ভরসা হয় না। মনের আবেগে হঠাৎ কখন কি করে বসি, কে বলতে পারে! এই পথ খরচ নেও--তারপর সত্বর কোনও নিরাপদ স্থানে চলে যাও।

রুদ্ধকণ্ঠে তাঁর ব্যথিত দরদ গুমরে উঠছিল। তাঁর পায়ে কয়েক ফোঁটা কৃতজ্ঞতার অশ্রু ফেলে আমি আবার এই দরাজ দুনিয়ায় বের হয়ে পড়লাম।

—হীরকহার

ভদ্র বাদশাহ্

সুলতান নাসীরুদ্দীন নিজ হাতে কুরআন শরীফ নকল করিতেন এবং এই নকলের রোজগার হইতে নিজ খাদ্যের সংস্থান করিতেন।

একদা একজন আমীর সুলতানের নকল-করা একখণ্ড কুরআন শরীফ দেখিতে-ছিলেন। তিনি সুলতানকে বলিলেন, "শাহান্‌শাহ, এই শব্দটি ভুল হয়েছে।" সম্রাট চাহিয়া দেখিলেন, একটু হাসিলেন, তাহার পর সেই শব্দটির চারিদিকে একটা ছোট বৃত্ত টানিয়া দিলেন।

আমীর চলিয়া গেলেন। সম্রাট তখনি শব্দঘেরা বৃত্তটি ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিলেন। একজন বৃদ্ধ আমলা কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। সম্রাট উত্তর দিলেন, "আমি জানতাম, শব্দটি আসলে মোটেই ভুল ছিল না, সে কথা বলে একজন ভদ্রলোককে শরম দেওয়ার চেয়ে শব্দটিকে তখনকার মত চিহ্ন দিয়ে রাখাই ভাল মনে করেছিলাম।"

—ফিরিস্তা

ইস্তাম্বুল জয়ের আগে

১৪৫২ খৃস্টাব্দ। সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ ইস্তাম্বুল অবরোধের জন্য বিপুল আয়োজনে ব্যস্ত।

সুলতানের কানে আসিল: প্রধানমন্ত্রী খলীল পাশাকে বাধ্য করবার জন্য সম্রাট কনস্ট্যানটাইন অগাধ ধনরত্নের ব্যবস্থা করিতেছেন। তখন গভীর রাত্রি। সুলতান তখনই উজিরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অমন অসময়ে ডাক। উজির প্রমাদ গণিলেন, কিন্তু হুকুম তামিল করা ছাড়া আর পথ ছিল না। কাজেই বিবির নিকট বিদায় লইয়া মনে মনে তওবা পড়িতে পড়িতে উজির যাইয়া সুলতানের সামনে হাজির হইলেন।

সুলতান: উজির, আমার আকাঙ্ক্ষা, আপনার উপর প্রচুর উপহার—বারি বর্ষণ করি।

উজির: সে জাহাঁপনার অনুগ্রহ।

সুলতান: কিন্তু তার প্রতিদানে আমি একটি জিনিস চাই—কনস্টান্টিনোপল।

উজির: যে আল্লাহ্ জাহাঁপনাকে রোমক সাম্রাজ্যের এতখানি দিয়েছেন, রাজধানীসহ বাকীটুকু তিনিই দিবেন। আমরা আমাদের জান কুরবান করতে সর্বদা প্রস্তুত।

সুলতান: দেখুন, উজির, এই বালিশটির দিকে একবার চেয়ে দেখুন। ইস্তাম্বুল জয়ের তীব্র নেশায় আমার চোখের ঘুম পালিয়েছে। সমস্ত রাত এই বালিশ আমি এপাশ হতে ওপাশে নিয়েছি, ওপাশ হতে এপাশে এনেছি, কতবার বিছানায় গিয়েছি, কতবার ফিরে এসেছি, ঘুমের সাক্ষাৎ একটিবারও পাই নাই! আমার এত আকাঙ্ক্ষা, এত আয়োজন সব বৃথা যাবে?

উজির—না, জাহাঁপনা, না।

সুলতান—উজির, কনস্ট্যানটাইনের অনেক টাকা আছে শুনেছেন? অগাধ ধনরত্ন?

উজির—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তো বান্দার পক্ষে কঠিন, জাহাঁপনা।

সুলতান—কঠিন হয়, ভাল; তবু হুঁশিয়ার, উজির, সহস্রবার হুঁশিয়ার, আমার রাজ্যের কেউ যেন ভুলেও সে ধনের দিকে ফিরে না চায়, মুহম্মদ সবকে ক্ষমা করতে পারে, বিশ্বাসঘাতককে নয়।

উজির—বিশ্বাসঘাতকের পক্ষে কোন দয়া পাওয়ার অধিকার নাই।

সুলতান—মনে রাখবেন, উজির, আমাদের সৈন্যরা অধিকতর অভিজ্ঞ যোদ্ধা, আমাদের অস্ত্র অধিকতর আধুনিক, আল্লাহ্ আমাদের সহায়ক—বিজয় আমাদেরই।

—গিবন

ইস্তাম্বুল জয়ের পরে

তুমুল সংগ্রামের পর কনস্ট্যানটাইনের গৌরব-পতাকা মুহম্মদের অবরোধ বাহিনীর সম্মুখে অবনমিত হইল। সুলতান তখনই সম্রাট কনস্ট্যানটাইনকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে হাজির করিতে হুকুম দিলেন।

বহু অনুসন্ধানের পর অনেকগুলি লাশের নীচ হইতে সম্রাটের মৃত দেহ আবিষ্কৃত হইল। সুলতান যথোচিত সম্মানের সঙ্গে মৃতের সৎকারের ব্যবস্থা করিলেন।

ইহার পর কনস্ট্যানটাইনের প্রধানমন্ত্রী লিউকাস্ নোটারাস্‌কে সুলতানের সম্মুখে আনয়ন করা হইল। লিউকাস্ তাঁহার অগাধ ধনরত্নসহ নিজকে সুলতানের পদতলে সমর্পণ করিলেন।

সুলতান খুশী হইলেন না, ক্রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার দেশ ও সম্রাটের জন্য এসব ধনরত্ন নিয়োগ করেন নাই কেন?"

লিউকাস্ উত্তর করিলেন, "এ সমস্তই জাহাঁপনার—ঈশ্বর এসব জাহাঁপনার জন্যই আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন।"

সুলতান গর্জিয়া উঠিলেন, "হতভাগা, তবে আমার ধন আগেই আমাকে না দিয়ে এত কাল লড়াই কচ্ছিলে কেন?"

লিউকাস্ বিড়বিড় করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন; সুলতান উপেক্ষার দৃষ্টি হানিয়া বলিলেন, "যাও, তোমাকে ক্ষমা করা গেল।"

—গিবন

আমার খুনের বদলে যেন গো আমার ভাইয়েরা বাঁচে

হযরত উসমান (রা.) ইসলামের তৃতীয় খলীফা—শান্ত-শিষ্ট, ধর্মভীরু।

খলীফার শান্তিপ্রিয়তার সুযোগে দুর্দান্ত সমাজদ্রোহিগণ উদ্ধত হইয়া উঠিল। অবশেষে তাহারা স্বয়ং খলীফার বাসগৃহ অবরোধ করিয়া বসিল।

মদীনার অধিবাসীরা খলীফাকে জানাইল, "আমিরুল মুমিনীন, আমরা মহানবীকে সাহায্য করেছি, আপনার জন্যও আমরা প্রাণপণ করতে রাজী—হুকুম করুন, বিদ্রোহীদের দেহ পথের ধূলায় মিশিয়ে দেই।"

খলীফা ত্বরিৎ উত্তর পাঠাইলেন, "না, না, তা হয় না। মুসলমান হয়ে প্রথম মুসলমানের রক্তপাত করবে, আমি সে দলে নই।"

মদীনাবাসীরা মুক্ত অসি কোষবদ্ধ করিয়া গৃহে ফিরিল, কিন্তু পরিণাম ভাল হইল না। রাত্রির অন্ধকারে দেয়াল টপকাইয়া যাইয়া বিদ্রোহীরা কুরআন পাঠরত খলীফাকে আক্রমণ করিল। তিনি সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন।

শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে বিদায়মান খলীফা দুই হাত তুলিয়া প্রার্থনা করিলেন, "দয়াময়, আল্লাহ্, আমার এই খুনের বিনিময়ে আমার জাতির ঐক্যকে দৃঢ় করে দাও।"

—সয়ুতী

পিতা ও পুত্রহন্তা

স্পেন-অধিপতি আমীর আবদুর রহমানের আমলে জনৈক আরব নিজ প্রাক্তিভাবলে দলপতি পদে উন্নীত হন। কর্ডোভা নগরে তাঁহার বিশাল সম্পত্তি, বিপুল প্রভাব।

একদা দলপতি নিজ বাড়ীর সম্মুখস্থ বাগানে পায়চারি করিতেছেন, এমন সময় একটি স্পেন দেশীয় লোক আর্তনাদ করিতে করিতে আসিয়া তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

দলপতি ব্যস্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে লোকটি বলিল, "হুজুর, রাস্তায় একটা লোকের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়। আমি রাগে জ্ঞানশূন্য হয়ে তাহার মাথায় আঘাত করি। লোকটা মারা যায়। তার সঙ্গীরা আমাকে তাড়া করে; আমি ছুটে পালাতে পালাতে দেখি, এই বাগানের দুয়ার খোলা, তাই এখানে প্রবেশ করেছি। ঐ দেখুন, তারা তাড়া করে আসছে—আমায় রক্ষা করুন, হুজুর, আমায় আশ্রয় দিন।" লোকটা আবার দলপতির পা জড়াইয়া ধরিল।

দলপতি তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইতে উঠাইতে বলিলেন, "বেশ, তুমি নিরাপদ।" এই বলিয়া তিনি লোকটিকে নিজ বাড়ীর একটি গোপন কক্ষে স্থান দিয়া উহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

দেখিতে দেখিতে বিক্ষুব্ধ জনতা একটি যুবকের মৃতদেহসহ বাগানের ফটক পার হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

মৃত যুবকের দিকে দৃষ্টি পড়া মাত্র দলপতি হায় হায় করিতে করিতে বসিয়া পড়িলেন—মৃত যুবক তাঁহারই একমাত্র পুত্র।

জনতার মধ্য হইতে একজন বলিল, "হুজুর, একটা দুষ্ট পথিক এই সর্বনাশ করেছে। আমরা তাকে তাড়া করে আসছিলাম, এইখানে এসে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।"

সকলে তন্ন তন্ন করিয়া আসামীর খোঁজ করিল ; কিন্তু কোনও সন্ধান না পাইয়া ক্ষুব্ধমনে ফিরিয়া গেল।

আশ্রিত ব্যক্তিই যে পুত্রহন্তা, সে বিষয়ে দলপতির বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না।

আশ্রিত লোকটি সমস্তই শুনিল, বুঝিল তাহার মৃত্যু অনিবার্য। সে প্রাণ হাতে করিয়া আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মৃতের দাফন-কাফন হইয়া গেল। মর্মান্তিক শোক ও ক্রন্দন-কোলাহলের ভিতর কখন যে সূর্য ডুবিয়া গেল, তাহা কেহ জানিতে পারিল না।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইল ; কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্ন হইয়া অবশেষে সকলে নিদ্রাকোলে ঢলিয়া পড়িল।

তখন দলপতি অতি সঙ্গোপনে উঠিয়া গিয়া রুদ্ধ কক্ষের দুয়ার খুলিলেন এবং কম্পিত-কলেবর পথিককে বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই—তুমি আমার মেহ্‌মান। এই নাও খাবার ও পথ খরচ ; আর এই মুহূর্তেই এই শহর ত্যাগ কর।"

লোকটি কাঁপিতে কাঁপিতে করুণ দৃষ্টি হানিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

—হীরকহার

রণ-পথে আলাউদ্দীন

সম্রাট আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে মাওরাউন্নহরের শাসন-কর্তা কুতলুগ খাঁ দুই লক্ষ মোগল সওয়ার লইয়া ভারতে প্রবেশ করেন এবং ক্রমে দিল্লীর দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হন।

দিল্লীময় আসন্ন বিপদের গাঢ় ছায়া পড়িল। পার্শ্ববর্তী নগর ও গ্রামের সন্ত্রস্ত অধিবাসীরা দলে দলে দিল্লীতে আসিয়া আশ্রয় লইল। রাস্তাঘাট, মন্দির, মসজিদ, ময়দান, মুসাফিরখানা আশ্রিতে ভরিয়া উঠিল।

আলাউদ্দীন সসৈন্য দিল্লী হইতে বাহির হইয়া সিরি নামক স্থানে ছাউনী ফেলিলেন। দিল্লীর শহর কোতোয়াল আলাউল-মুল্‌ক সম্রাটকে বিদায় দিতে সিরি পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। বিদায়ের পূর্বে তিনি পরামর্শ স্বরূপ বলিলেন :

"শাহানশাহ্, অতীতের ইতিহাসে দেখা যায়, সমানে সমানে যেখানে লড়াই এবং লড়াইয়ের ফল যেখানে অনিশ্চিত, বুদ্ধিমান রাজারা সে যুদ্ধ এড়াইয়া চলিয়াছেন এবং কুট রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আমি বলি, শাহানশাহ্ এখানে বসিয়া কুটনীতির চিন্তা করুন, উষ্ট্রবাহিনী অগ্রসর হউক, ফলাফল লক্ষ্য করিতে থাকুন। দূত পাঠাইয়া পাঠাইয়া কয়েকদিন কাটাইয়া দিন; অবশেষে উহারা হয়তো অধৈর্য হইয়া সামান্য লুটপাট করিয়া ফিরিয়া যাইবে—সেই সময় শাহানশাহ্ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কয়েক মঞ্জিল অগ্রসর হইবেন।"

আলাউদ্দীন ধীরভাবে সমস্ত শুনিলেন এবং বড় বড় আমীর রঈসগণকে একত্র ডাকিয়া বলিলেন :

"আপনারা এ রাজ্যের স্তম্ভ; কাজেই আলাউল-মুল্‌কের পরামর্শ সম্পর্কে আমার অভিমত আপনাদের জানা থাকা প্রয়োজন। একটা প্রাচীন কথা আছে যে, হাতী চুরি করিয়া গা-ঢাকা দিয়া পলায়ন করা চলে না। তেমনি, যুদ্ধ এড়াইয়া উটের পেছনে গা-ঢাকা দিয়া দিল্লীর সিংহাসন রক্ষা করা চলে না। এই সময় যুদ্ধ এড়াইয়া চলা আমার মর্যাদার সম্পূর্ণ বিরোধী হইবে—বর্তমান ও ভবিষ্যতের জনগণ আমার দিকে ইঙ্গিত করিয়া হাসিবে। মুরগীর মত কূটনীতি রূপ ডিমের উপর বসিয়া বসিয়া তা দেওয়াই কি আমার উপযুক্ত কার্য হইবে? তাহা হইলে আমি লোকের সম্মুখে বা অন্দর মহলে কেমন করিয়া মুখ দেখাইব? আমার দুর্দান্ত প্রজামণ্ডলী আমার কোন্ সাহসিকতার জন্য আমার বশীভূত থাকিবে? যাহাই ঘটে, ঘটুক; আগামীকল্য আমাকে যুদ্ধে যাইতেই হইবে।"

—বারানী

মারাত্মক সওগাত

একদা হযরত আলী (রা.) দুশমনদের সাথে ভীষণ লড়াইয়ে মত্ত। শত্রুদলে একজন ছিল দৈত্যের মত জোয়ান। সে লড়াই করিতে করিতে আলী (রা.)-এর দিকে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। আলী (রা.)-ও পাল্টা আক্রমণ করিলেন।

ভীষণ লড়াই চলিতে লাগিল। অবশেষে বিপক্ষীয় সৈনিকটির তলোয়ার ভাঙিয়া খানখান হইয়া পড়িয়া গেল। সে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আলী (রা.) কখনও নিরস্ত্রের উপর আঘাত করিতেন না। কাজেই তিনি তাঁহার অস্ত্র সম্বরণ করিয়া লইলেন।

সৈনিকও নড়িল না। সে বলিল, "আলী, আমি ময়দান ছাড়িয়া পালাইব না। আমাকে বরং একটা তলোয়ার দাও, আমি আবার তোমার সঙ্গে লড়াই করিব।"

আলী (রা.)-এর সাথে একখানা মাত্র তলোয়ার ছিল; তিনি তাহাই তাহাকে দিয়া দিলেন।

দুশমনটি তো অবাক! তাহার পর সে বলিল, "আলী, এই ভীষণ সওগাত তুমি কোন্ সাহসে আমায় দিচ্ছ, বল তো? আমি যে এখনই তোমার মাথাটি কাটিয়া ফেলিতে পারি।"

আলী (রা.) বলিলেন, "কিন্তু উপায় কি? আমার কাছে কেহ কিছু চাহিলে যে আমি 'না' বলিতে পারি না।"

দুশমন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল: কি যেন ভাবিয়া লইল। তাহার পর বলিল, "এমন মানুষ যখন মুহম্মদের শিষ্য, তখন আমি তাহাকে পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার না করিবার কে? ভাই আলী, আমি তোমার মহত্ত্বের কাছে মাথা নত করিতেছি, দুশমনের উপর তোমরা জয়ী হও, এই প্রার্থনা করি।"

—সি-টি-দত্ত

কেদার রায় ও মানসিংহ

[ঢাকা—মানসিংহের দরবার]
(কেদার রায়ের প্রবেশ)

কেদার রায়—মহারাজ মানসিংহের জয় হোক।

মানসিংহ—রাজা কেদার রায়ের জয় হোক। আসুন। (আলিঙ্গন)

কেদার রায়—হঠাৎ এ গরীবের তলব কেন, মহারাজ?

মানসিংহ—নিতান্ত প্রয়োজনে। বাংলার সঙ্গে আমাদের একটা মীমাংসা হওয়া দরকার।

কেদার রায়—এ মীমাংসা তো ঈসা খাঁ মসনদে আলীর সঙ্গে আগেই হয়ে গেছে, মহারাজ?

মানসিংহ—সে ঈসা খাঁ তো আর নাই, রায়মশাই।

কেদার রায়—ঈসা খাঁ নাই, ঈসা খাঁর বাংলা আছে—ঈসা খাঁর বার ভুঁঞা আছে।

মানসিংহ—হাঁ বলুন, বলুন—ঈসা খাঁর আরো কি আছে?

কেদার রায়—ঈসা খাঁর সত্যি আরো আছে, মহারাজ।

মানসিংহ—জানতে পারি রায় মশাই, সে 'আরো'-টি কে?

কেদার রায়—সে 'আরো'-টি এই বান্দা কেদার রায়!

মানসিংহ—বেশ মিলেছিল তাহলে—রায় মশাই, পাঠানের পতাকাতলে ক্ষত্রিয়, বেশ! তা এ পাণ্ডব-বর্জিত দেশে সব চলে যায়, কি বলেন, রায় মশাই?

কেদার রায়—কি চলে যায়, মহারাজ?

মানসিংহ—যেমন আপনাদের এই আর্য-অনার্যের মিতালি।

কেদার রায়—আমাদের ওস্তাদ ঈসা খাঁ মসনদে আলী বেঁচে থাকলে এর উপযুক্ত উত্তর অবশ্য তিনি দিতেন।

মানসিংহ—কি উপযুক্ত উত্তর দিতেন, রায় মশাই?

কেদার রায়—যেমন উত্তর তিনি মহারাজকে একদা দ্বন্দ্বযুদ্ধে দিয়েছিলেন।

মানসিংহ—ও!—সে একটা হঠাতের কথা—গোষ্পদেও তো হাতীর পা পিছলে যায়, রায় মশাই।

কেদার রায়—সে তর্ক থাক, মহারাজ, আমি কেবল একটা প্রশ্ন করতে চাই।

মানসিংহ—তা আপনি স্বাধীনভাবে করতে পারেন।

কেদার রায়—মোগলের গোলাম হয়ে তলোয়ার হাতে দেশে দেশে লড়াই করে পরের স্বাধীনতা হরণ, আর পাঠান বীরের সঙ্গে ভাইয়ের মত সহযোগী হয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম—এ দুইয়ের মধ্যে আসলে কোন্‌টি বেশী সম্মানজনক বলতে পারেন, মহারাজ?

মানসিংহ—আপনি আমার অতিথি, রায় মশাই, নইলে—। কিন্তু যাক, আমি একটা স্পষ্ট উত্তর চাই—রায় মশায় কি বিনাযুদ্ধে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করবেন?

কেদার রায়—জীবন থাকতে নয়।

মানসিংহ—তবে এই আপনার চরম উত্তর?

কেদার রায়—এ আমার ব্যক্তিগত উত্তর। চরম উত্তর তৈরী হবে আমাদের বার ভুঁঞাদের বৈঠকে।

মানসিংহ—কার কাছে আমরা সে উত্তরের অনুসন্ধান করব?

কেদার রায়—বার ভুঁঞাদের মহামান্য সর্দার ঈসা খাঁ মসনদে আলীর বর্তমান স্থলাভিষিক্ত, সেই কেদার রায়ের কাছে।

মানসিংহ—বেশ, সে সর্দার কেদার রায়কে বলবেন, তিনি যেন বেশ ভেবে-চিন্তেই এর জবাব দেন।

কেদার রায়—হ্যাঁ, ভেবেচিন্তেই সে জবাব তিনি দিবেন, মহারাজ। বাংলার হিন্দু-মুসলমান বাহুতে বাহু মিলিয়ে এতকাল তাঁদের মাতৃভূমির যে পবিত্র স্বাধীনতা রক্ষা করে এসেছে, আজ একজন ভিনদেশী রাজকর্মচারীর চোখ-রাঙানীতে তারা সে স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে গোলামির জিঞ্জির পরবে কিনা, সে আলোচনা তারা অবশ্যই করবে এবং উপযুক্ত জবাবও দিবে।

[কেদার রায়ের রাজধানী—দরবার]

মন্ত্রী—মহারাজ মানসিংহ নাকি আমাদের উপর ভয়ানক খাপ্পা!

কেদার রায়—খুব স্বাভাবিক। দিল্লীশ্বর আকবর বাদশাহর সেনাপতি—তাঁরই মুখ বরাবর জবাব—বিনাযুদ্ধে সূচাগ্র ভূমি বাঙ্গালী মোগলকে ছেড়ে দিবে না, এতে মেজাজ একটু খারাব হবে না?

মন্ত্রী—মেজাজ একটু খারাব নয়, তিনি ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছেন, বাঙ্গালী জাতকে তিনি পিষে মারবেনই মারবেন।

কেদার রায়—বাঙ্গালী যদি পিঠ পেতে দেয়, তবে ত তারা মারবেই। কিন্তু যদি মাথা খাড়া করে হুঙ্কার ছেড়ে তারা দাঁড়ায়, তবে এ দুনিয়ায় কার সাধ্য তাদেরকে পিষে মারে?

মন্ত্রী—মানসিংহ দূত পাঠিয়েছেন—তার পত্রে নাকি ভীষণ সংবাদ আছে।

কেদার রায়—বেশ, বোলাও তাকে।

[মন্ত্রীর নিষ্ক্রমণ]

(স্বগত:) আবার বুঝি খুনের খেলায় মাততে হবে! কিন্তু উপায় নাই—উপায় নাই। ঐ পশ্চিমা অজমূর্খগুলির দম্ভ আর সহ্য হয় না: দেহের উপরতলা তো অনেকখানি খালি কিনা, তাই শুধু শিম্পাঞ্জির মত সবল বাহুর গরিমাতেই ওরা বিভোল। আচ্ছা এবার বাঙ্গালী এক হাত দেখিয়ে দিবে। বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বাঙ্গালী আজ বদ্ধপরিকর।

[দূতসহ মন্ত্রীর প্রবেশ]

দূত—মহামান্য রাজা কেদার রায়ের জয় হোক।

কেদার রায়—কি সংবাদ, দূত?

দূত—আমার প্রভু মহারাজের পত্র আছে।

কেদার রায়—মন্ত্রি, পত্রখানা পাঠ করুন।

দূত—আরো কিছু আছে, হুজুর, যদি অনুমতি করেন—

কেদার রায়—বেশ, উপস্থিত করুন।

দূত— এই নিন, হুজুর (একখানি পত্র, একখানি তলোয়ার ও একটি সোনার শিকল দান)

মন্ত্রী—(পত্র পাঠ)

ত্রিপুর—মগ—বাঙ্গালী কাককুলা চাকালী
সকল পুরুষ মেতৎ ভাগি যাও পালায়ী
হয়—গজ—নর নৌকা কম্পিতা বঙ্গভুমি:
বিষম—সমর—সিংহো মানসিংহে: প্রযাতি।

কেদার রায়—মানে বলে দাও, মন্ত্রী, দরবারের সবাই শুনুক।

মন্ত্রী—অর্থাৎ ত্রিপুর, মগ, বাঙ্গালী, পাঠান, জাঠ, উড়িষ্যাবাসীরা যাঁর নাম শুনে ভয়ে পালিয়ে যায়, সেই মহারাজ মানসিংহ নিজে হাতী-ঘোড়া, লোক-লস্কর নিয়ে যুদ্ধে আসছেন, বঙ্গভুমি, থরথরি কম্পিত।

কেদার রায়—সে ত হল পত্রের মানে, শিকল তলোয়ারের মানেটা বলে দাও।

মন্ত্রী—অর্থাৎ হয় গোলামির শিকল পরে মোগলের বশ্যতা স্বীকার কর, নইলে তলোয়ার হাতে লড়াইর জন্য তৈয়ার হও।

কেদার রায়—ওহ। তাই ! বেশ, দূত, তোমার সোনার শিকল ফিরিয়ে নাও—ওটি তোমার প্রভুর জন্য দরকার—তাঁর পরে অভ্যাস আছে।

দূত—আর তলোয়ারটি ?

কেদার রায়—তলোয়ারটি আমি গ্রহণ করলাম (তুলে নিলেন)। অতঃপর তোমার প্রভুর সঙ্গে লড়াইর ময়দানে কথা হবে।

দূত—পত্রের জবাব হুজুর ?

কেদার রায়—তাই ত, পত্রের একটা জবাব দিতে হয়, কি বল মন্ত্রী ?

মন্ত্রী—হুজুর ঠিক বলেছেন—

কেদার রায়—আচ্ছা লিখুন—

ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুম্ভং
বিভর্তি বেগং পবনাতিরেকং
করোতি বাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরের নান্যঃ।

মন্ত্রী—লিখেছি, হুজুর।

কেদার রায়—বেশ, দূতের হাতে দাও, আর মানেটা সবাইকে বুঝিয়ে বল।

মন্ত্রী—হস্তী কুম্ভ বিদারণ করলেই বা কি?
বায়ুর চেয়ে বেগশালী হলেই বা কি?
আর হিমালয়শৃঙ্গে বাস করলেই বা কি?
তথাপি সিংহ পশু ছাড়া আর কিছুই তো নয়।

এত অল্প

বাংলার সিংহাসনে বসিবার আগে ফিরোজশাহ বিখ্যাত ছিলেন তাঁহার অসম সাহসের জন্য আর সিংহাসনে বসিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন তাঁহার মুক্ত-হস্তের দানের জন্য।

একদা ফিরোজশাহ আদেশ দিলেন—"আগামী পরশু দিনই এক লক্ষ টাকা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দাও।"

মন্ত্রীরা ফিরোজশার এত দান পছন্দ করিতেন না। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিল—"এই হাব্শী ভাগ্যবলে হঠাৎ পরের অর্জিত অগাধ ধনের অধিকারী হয়েছে; নিজে কোন কষ্ট করে নাই; কাজেই এ ধনের জন্য এর মায়া কম। চল, এমন একটা কিছু করা যাক, যাতে টাকার উপর এঁর মমতা জন্মে।"

তখন তাঁহারা ঘরের মেঝের উপর এক লক্ষ টাকা জমা করিলেন এবং ফিরোজ-শাকে কৌশলে সেই স্তূপ দেখাইলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে এত টাকা একসঙ্গে দেখিয়া টাকার প্রতি তাঁহার একটা আকর্ষণ জন্মিবে।

সুলতান টাকার স্তূপ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে এ টাকা কিসের?"

মন্ত্রীরা জবাব দিলেন, "এই টাকাইত গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে হুজুর হুকুম করেছেন।"

সুলতান উত্তর দিলেন, "বটে। কিন্তু টাকা এত অল্প! এতে কি করে এতগুলি গরীবের চলবে? এর সঙ্গে আরো লাখ টাকা দিন।"

—রিয়াজুস সালাতীন

কবির যাত্রা ভঙ্গ

মাহ্মুদ শাহ ১৩৭৮ খৃস্টাব্দে বাহমনী রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাঁহার রাজধানীকে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং কাব্য-সঙ্গীত অনুশীলনের কেন্দ্র করিয়া তোলেন। তিনি নিজে সুকবি ছিলেন। তাঁর মার্জিত রুচি, কাব্যপ্রীতি এবং বদান্যতায় আকৃষ্ট হইয়া সুদূর আরব ও পারস্য হইতেও বহু কবি দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন।

তাঁহার পক্ষ হইতে তাঁহার প্রধান বিচারপতি ও কবি মীর ফয়জুল্লাহ্ আন্জু শিরাজের মহাকবি হাফিজকে দাওয়াত করিয়া পাঠান। হাফিজ এই দাওয়াত কবুল করিয়া অরমুজ বন্দরে আসিয়া মাহ্মুদ শা'র প্রেরিত জাহাজে আরোহণ করেন।

কিন্তু জাহাজ নোঙ্গর তুলিয়া সমুদ্রে পড়ার কিছুকাল পরেই ভীষণ তুফান শুরু হয়; ভয়ে জাহাজ বন্দরে ফিরিয়া আসে। কবি অমনি জাহাজ হইতে নামিয়া নিম্নোক্ত কবিতা কয়টি লেখেন এবং উহা মাহ্মুদ শাহ্কে পাঠাইয়া সোজা শিরাজে ফিরিয়া আসেন।

॥ ১ ॥

সৌভাগ্যের মুক্ত হস্ত যদিবা আমায়
বিশ্বের সম্পদ রাশি দেয় অকাতরে
পূরণ করিতে কিগো পারে কভু তায়
জনম ভূমির মৃদু মলয় দোলারে?

॥ ২ ॥

বন্ধুরা কহিছে ডাকি—এদেশেই থাকো
একদা বেসেছ ভালো যার পুণ্য গেহ,
তাহারে সহসা হেন ফেলে যেয়ো নাকো—
কেমনে ভুলিবে প্রিয় শিরাজের স্নেহ?

॥ ৩ ॥

শান্তির অমূল্য নিধি হারিয়ে হেলায়
দিতে পারে সুলতানের সোনার পাহাড়
সে শান্তি ফিরিয়ে? তাই বিদায় বেলায়
কহিনু তোমারে, ভেবে দেখ আর বার।

॥ ৪ ॥

শাহী ঐশ্বর্যের লোভে হইনু বধির,
সাগর গর্জন কভু শুনি নাই আগে,
সন্ত্রস্ত এখন আমি উতল অধীর,
কি ভুল হয়েছে তাই আজি মনে জাগে।

॥ ৫ ॥

ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, হে প্রমত্ত মন,
রাজসভা আশা, ফিরে চল নিজালয়,
মনের মঞ্জিলে তব শান্ত প্রস্রবণ,
সেই যে সুখের স্থান, অন্য কোথা নয়।

মাহ্‌মুদ শাহ্‌ বলিলেন, "বেশ, কবি যে ভারতযাত্রা করেছিলেন, তারই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁকে রাজকোষ থেকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা উপহার পাঠাও।"

উপহার লইয়া মুহম্মদ কাসেম মাশ্‌হাদী অগোপে শিরাজ যাত্রা করিলেন।

—ফিরিশ্‌তা

দানে অপরাজেয়

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন: রসূলুল্লাহ্‌ (স.) আমাদেরকে বলেন, "দান কর—যার যা ধন-সম্পত্তি আছে সেই অনুপাতে দান কর।"

আমি ভাবলাম, "আজ আমি দানে পাল্লা দিয়ে আবুবকর (রা)-কে হারিয়ে দিব; আর কোনদিন তাঁর সাথে পেরে উঠি নাই, কিন্তু আজ আমি জিতবই জিতব।"

আমি আমার সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক নিয়ে এলাম। রসূলুল্লাহ্ (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, ''তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে দিলে?'' আমি মনে মনে গর্ব অনুভব করে উত্তর দিলাম, ''মাত্র অর্ধেক সম্পত্তি।''

আবুবকর (রা.) তাঁর যথাসর্বস্ব নিয়ে এলেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, ''হে আবুবকর, আপনার পরিবারের জন্য কি রেখে এলেন?''

আবুবকর (রা.) উত্তর দিলেন, ''তাদের জন্য আল্লাহ্ আর রসূল আছেন।''

আমি ভাবলাম, ''না, আবুবকর (রা.)-কে আমি কোন দিনই হারাতে পারব না।''

—সযুতী

কী করতে পারি আমি?

''ওহ! কী সুন্দর বালক—কী মহৎ তার মন—আর কী দুর্জয় তার সাহস, অথচ কী নিষ্ঠুর মৃত্যু তার সামনে মুখ ব্যাদান করে এগিয়ে আসছে! কিন্তু কী করতে পারি আমি? ইনজেকশন দিব? নতুন ঔষধে—যদি মরে যায়? কুকু-রের কামড়ের বিষে মরবার আগে আমিই ওকে হত্যা করব?''—একটি হাসপাতা-লের বারান্দায় চঞ্চলভাবে পায়চারি করিতে করিতে একজন ডাক্তার আপন মনে ঐ উক্তি করিতেছিলেন। গভীর ব্যথার নিদারুণ চিহ্ন তাঁহার চোখে-মুখে সর্বত্র পরিস্ফুট।

ইহার পনর দিন পর। সেই হাসপাতালের বারান্দায় সেই ডাক্তারটি দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া বলিতেছিলেন, ''ধন্যবাদ, প্রভু, ধন্যবাদ; তোমার সৃষ্ট জীবের সেবা করার এই যে সুযোগ তোমার এ নগণ্য দাসকে দিয়েছ, এ কৃতজ্ঞতা রাখার আমার ঠাঁই কোথায়?''

ফ্রান্স। ১৮৮৫ সালের অক্টোবর মাস। ছয়টি বালক একটা পাহাড়ের পাদদেশে ভেড়া চরাইতেছিল। হঠাৎ একটা পাগলা কুকুর কোথা হইতে দৌড়িয়া আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের মধ্যে পাঁচজন ভয় পাইয়া ছুটিয়া চলিল। ষষ্ঠজন পালাইতে যাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল: পলায়মান পাঁচ-জনকে কুকুরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে। এই বালকের নাম জুপিলী।

পাগলা কুকুর দৌড়িয়া আসিয়া জুপিলীর বাম হাতে দাঁত বসাইয়া দিল। জুপিলীর সঙ্গে কুকুরের ধস্তাধস্তি শুরু হইল। অবশেষে সে তাহার হাত কুকুরের মুখ হইতে ছাড়াইয়া লইল ও কুকুরকে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। জুপিলীর ছোট ভাই পালাইতেছিল। সে খানিক দূর গিয়া ফিরিয়া চাহিল ও ভাইয়ের অবস্থা দেখিয়া দৌড়িয়া আসিল ও একটা দড়ি দিয়া কুকুরের মুখ বাঁধিয়া ফেলিল।

কুকুরের হাত হইতে এমনই ভাবে তখনকার মত রক্ষা পাওয়া গেল; কিন্তু দেখা গেল, জুপিলীর হাতের মাংস উন্মত্ত কুকুরের ক্রুদ্ধ দংশনে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

জুপিলীর মাতাপিতা বুঝিলেন, জুপিলীর রক্ষা নাই; জলাতঙ্ক ব্যাধিতে তাহার মৃত্যু অনিবার্য। চিন্তায় তাহাদের চোখের ঘুম নির্বাসিত হইল, পেটের ক্ষুধা মরিয়া গেল। তাহারা যে শহরে বাস করিত, তাহার মেয়র তাহাদিগকে বলিলেন, 'প্যারিসের ডাক্তার প্যাসটিউর আমার বন্ধু ব্যক্তি। শুনেছি, তিনি শিয়াল কুকুরের কামড়ের চিকিৎসা করেন। তাঁর কাছে জুপিলীকে পাঠিয়ে দেও। দেখ, বিধাতা কি করেন।'

ঘটনার ছয় দিনের দিন জুপিলীকে ডাক্তার প্যাসটিউরের হাসপাতালে নিয়া হাজির করা হইল। রোগী দেখিয়া প্যাসটিউর মহা সমস্যায় পড়িলেন এবং চিন্তাকুল চিত্তে পায়চারি করিতে করিতে স্বগতঃভাবে বলিতে লাগিলেন, 'ওহ্, কী সুন্দর বালক! —কী মহৎ তার মন! .....'

প্যাসটিউর তাঁহার সহযোগীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা ইনজেকশন দিতে পরামর্শ দিলেন। অবশেষে জুপিলীকে ইনজেকশন দেওয়া হইল। প্যাসটিউর উদ্বিগ্নভাবে গভীর অভিনিবেশ সহকারে রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

দশ দিন গেল; পনর দিন গেল; তবু রোগীতে জলাতঙ্কের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। এই পক্ষকাল ডাক্তার প্যাসটিউর কী ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে কাটাইয়াছিলেন, তাহা বিধাতা ছাড়া আর কেহ জানিল না। তিনি অধিকাংশ সময় গবেষণাগারে কাটাইতেন। তিনি নিদ্রার মধ্যেও স্বপনে জলাতঙ্কের ঔষধ খুঁজিতেন, তখনও ভাবিতেন—আহা! তাহার চিকিৎসা যদি ব্যর্থ হয়! — বালকটি যদি সত্যি মরে যায়—সে বেদনার দৃশ্য কেমনে তিনি সইবেন!

অবশেষে জলাতঙ্ক প্রকাশ পাওয়ার সময় যখন চলিয়া গেল, তখন প্যাসটিউর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। আবার হাসপাতালের বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে তিনি বলিলেন, 'ধন্যবাদ, প্রভু, ধন্যবাদ; তোমার সৃষ্ট জীবের সেবা...'

প্যাসটিউরের এই চিকিৎসা—সাফল্যের কথা তিনি সবিস্তার লিখিয়া বিজ্ঞান-পরিষদকে জ্ঞাপন করিলেন। বিজ্ঞান-পরিষদ তাঁহাকে অজস্র ধন্যবাদ জানাইলেন এবং জুপিলীর জন্য একটি মহা সম্মানজনক পদক পুরস্কারের ব্যবস্থা করিলেন।

'কী করতে পারি আমি?'—মানুষের দুঃখ দেখিয়া আকুল চিত্তের এই যে প্রশ্ন—এ মানব-জীবনের মহত্তম প্রশ্নের অন্যতম। এই প্রশ্নের উত্তরের অন্বেষণে শাক্যসিংহ সিংহাসনের মায়া ছাড়িয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন; এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য মহামানব হযরত মুহম্মদ (স.) হীরার গুহায় বৎসরের পর বৎসর গভীর ধ্যানে কাটাইয়াছিলেন। এই প্রশ্নের উত্তরে প্যাসটিউর তাঁহার গবেষণা-গারে বহু বিনিদ্র রজনী ক্ষেপণ করিয়াছিলেন।

মানবপ্রেমিকদের এমন একাগ্র সাধনা ব্যর্থ হয় না; প্যাসটিউরেরও ব্যর্থ হয় নাই। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে গিয়া তিনি অগণ্য বিপন্ন মানবের নব-জীবনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

মন্দ মানুষ কে?

একদা একজন আগন্তুক রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। সংবাদটি লইয়া আসিলেন হযরত আয়েশা (রা.)—রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর বিবি।

রসূলুল্লাহ্ (স.) বলিলেন: আচ্ছা, লোকটিকে ভিতরে এসে বসতে বল। জান আয়েশা, লোকটা তার কওমের সবচেয়ে মন্দলোক বলে কুখ্যাত।

হযরত আয়েশা (রা.) খবর পৌঁছালেন। লোকটি ভিতরে আসিয়া নিতান্ত অবজ্ঞার সঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সম্মুখে উপবেশন করিল, ভদ্রতা বা আদব-কায়দার কোন ধারই ধারিল না।

রসূলুল্লাহ্ (স.) লোকটির সঙ্গে পরম সৌজন্য ও দরদের সঙ্গে কথাবার্তা কহি-লেন। আয়েশা (রা.) আশ্চর্যবোধ করিতেছিলেন।

লোকটি চলিয়া গেলে তিনি মহানবী (স.)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আপনি তো জানতেন যে লোকটা অসৎ, অভদ্র দুই-ই; চোখের সামনে দেখলেনও তার কিছু নমুনা।"

"তা বটে।"

"তবু এ মন্দ লোকটার সঙ্গে এত বিনয়, এত দরদ, এত সৌজন্যের সঙ্গে কথা বলছিলেন!"

"আয়েশা, প্রকৃত মন্দ মানুষ তো সেই যে পরকে মন্দ ভেবে তার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করে।"

—বোখারী

বিচারকের আসনে মাহ্‌মুদ

একদা একজন দরিদ্র গজনীবাসী সুলতান মাহ্‌মুদের দরবারে হাজির হইয়া কাঁদিয়া বলিল, "রক্ষা করুন, জাহাঁপনা, দরিদ্রের ইজ্জত রক্ষা করুন।"

সুলতান মাহ্‌মুদ লোকটিকে আড়ালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

লোকটি বলিল, "জাহাঁপনার ভ্রাতুষ্পুত্র অসঙ্গতভাবে আমার বাড়ীতে যাতায়াত কচ্ছেন।"

মাহ্‌মুদ ক্ষেপিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "একথা আমাকে আরো আগে জানাও নাই কেন?"

লোকটি কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "জাহাঁপনা রাগ করবেন, এই ভয়ে বলি নাই।"

সুলতান বলিলেন, "খবরদার, আর যেন কখনো ভয় না পাও। এর পর তাকে তোমার বাড়ীর দিকে যেতে দেখলেই আমাকে খবর দিবে। কিন্তু হুঁশিয়ার! উপরে আল্লাহ্‌ আর নীচে তুমি ও আমি, এ ছাড়া আর কেউ যেন একথা না জানতে পারে।"

লোকটি পরম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সুলতানকে সালাম করিয়া বিদায় হইল।

কয়েকদিন পর লোকটি আসিয়া ফের তাহার অভিযোগ জানাইল।

সুলতান বলিলেন, "বেশ।"

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে—সুলতান একটি ঢিলা পোশাক লইয়া একাকী লোকটির সঙ্গে চলিলেন। বাড়ী পেঁীছিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ঘরের আলো নিভাইয়া দিলেন: সুন্দর তরুণ যুবক এই ভ্রাতুষ্পুত্রটি, কি জানি যদি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মন গলিয়া যায়?

অল্পক্ষণ মধ্যেই ভ্রাতুষ্পুত্রটি আসিয়া হাজির হইল। সুলতান তাঁহার পোশাকের নীচ হইতে তলোয়ার বাহির করিলেন: তাহার পর একটি আঘাতে যুবকের ছিন্ন মস্তক ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

—ঈশ্বরী প্রসাদ

মেরী ঝাঁসী নেহি দেউঙ্গী

ভারতের প্রথম ব্যাপক স্বাধীনতা সংগ্রাম—'সিপাহী বিদ্রোহ।' পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে, আকাশে, বাতাসে এক নূতন স্পন্দন—এক নব-জীবনের সঙ্গীত, এক নব স্বাধীনতার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা।

ভারতের বুক জুড়িয়া শুরু হইয়াছে এক উগ্র তাণ্ডব,—সিপাইরা ইংরেজকে মারে, ইংরাজেরা সিপাইকে মারে। বিপ্লবের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে।

ক্ষুদ্র মারাঠা রাজ্য ঝাঁসী,—অধিনায়িকা মাত্র তেইশ বৎসর বয়সের তরুণী রাণী লক্ষ্মীবাঈ,—বিধবা স্বধর্মের আচার-অনুষ্ঠানে পরম নিষ্ঠাবতী।

ঝাঁসীও এ বিপ্লবের আবর্তে পড়িয়া দোল খাইতে লাগিল, সকলেরই মনে সংশয়—কি হয়, কি হয় রণে, না জানি কি হয়।

ইংরেজ সৈন্য ঝাঁসী নগরী আক্রমণ করিয়াছে। কামান-গর্জনে নগর প্রাচীর কাঁপিতেছে, ধসিয়া পড়িতেছে। চারিদিকে নরনারীর করুণ হাহাকার—ক্রুদ্ধ তোপের নিষ্ঠুর হুঙ্কারে কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে।

এই সঙ্কটময় পরিবেশের মধ্যে নিশীথে রাণী পরামর্শ সভা ডাকিয়াছেন —উজীর, নাজীর, পাত্র-মিত্র, সর্দার সেনাপতি সকলে উপস্থিত।

উজীর বলিলেন, "মা, একি হয়? ঐ সুশিক্ষিত ইংরেজ ফৌজ, কত মজবুত ওদের কামান বন্দুক, কত প্রচুর ওদের গোলা-বারুদ, রসদ-সম্ভার—ওদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়া কি সঙ্গত হবে?"

লক্ষ্মীবাঈ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু লড়াইতো আমি চাই নাই, উজীর সাহেব, বেঈমান ইংরেজ—ওরা আমাকে লড়াইয়ে নামতে বাধ্য করেছে। সুতরাং যুদ্ধ আমি করবই—ফল যাই হউক।"

একজন সর্দার বলিল, "রাণী সাহেবা, ঝাঁসীর মাত্র এগার হাজার সৈন্য—ওরা কতক্ষণ ইংরেজের তোপের সামনে টিকতে পারবে? তার চেয়ে সন্ধি করে সকলের ধনপ্রাণ বাঁচানই ভাল।"

লক্ষ্মীবাঈয়ের কণ্ঠ রোষে ক্ষোভে কাঁপিয়া উঠিল, কহিলেন, "আপনারা কি চান যে আমি মারাঠাজাতির ইজ্জত বিসর্জন দিয়ে ইংরেজের হাতে আত্ম-সমর্পণ করি? স্বেচ্ছায় বরণ করে নিব এই অপমান?"

সভাস্থল নিস্তব্ধ। রাণী সহসা কোষ হইতে অসি মুক্ত করিলেন: প্রদীপের আলোতে সে শাণিত তরবারি ঝলমল করিয়া উঠিল, বজ্রকণ্ঠে রাণী বলিলেন, "এই কৃপাণ আমাকে রক্ষা করবে শত বিপদের মাঝে। মাথা নত করে অপ-মানের বোঝা বয়ে শান্তি ভিক্ষা করতে আমি যাব না—কক্ষণো না—এ আমার পণ। যদি আপনারা সবাই আমাকে ছেড়ে যান, বিদ্রোহী হন, বিপ্লবের সৃষ্টি করেন; তবু আমি লড়াই করব। শুনুন আপনারা সমবেত উজীর নাজীর, সর্দার সেনাপতিগণ—শুনুন, আমি বলছি।

কি ছিল রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের স্বরে, কি ছিল তাঁর লাবণ্যময়ী সৌন্দর্য-প্রতিমার ভিতর, কি ছিল তাঁর অনুপম তনু-ভঙ্গিমায়, কি ছিল তাঁর তেজ ও বীর্যে—সেই ভারত বীরাঙ্গনার অনবদ্য মূর্তিতে কে জানে? তাহার তেজপূর্ণ বাণীতে সকলের বুকের তলে উগ্র জ্বালার বহ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল, সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "হাঁ—হাঁ—ঠিক হ্যায়—

মেরী ঝাঁসী নেহি দেউঙ্গী।

মা জননী, আমরা প্রাণ থাকতে ঝাঁসীকে ইংরেজের হাতে তুলে দিব না—আমরা মরব—আমরা ঝাঁসীকে বাঁচাব—জয় মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ কি জয়। গাও—গাও সকলে—জয় মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ কি জয়।"

ইহার পর শুরু হইল তুমুল সংগ্রাম। রাণী তলোয়ার হাতে লড়াইয়ের ময়দানে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন: নবীন পুলক-ঝলকে সমরক্ষেত্র উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

ইংরেজের সুসংবদ্ধ বিক্রমের সম্মুখে রাণীর ক্ষুদ্র সৈন্যদল বেশীদিন টিকিল না; কিন্তু রাণীর মস্তক নত হইল না—লড়িতে লড়িতে অবশেষে মৃত্যুবরণ করিলেন।

চিতানলে লক্ষ্মীবাঈর নশ্বরদেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল, কিন্তু তাঁহার অবিনশ্বর গৌরব-স্মৃতি বাঁচিয়া রহিল অগণ্য দেশভক্তের করুণ চিত্তের মণি কোঠায়।

মাতাপুত্র

বিধবার একমাত্র সন্তান—চোখের আলো—বা-ইয়াজীদ। পিতৃহীন শিশুকে মাতা বুকে পিঠে করিয়া লালনপালন করেন; তাঁহার ইহজীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা এই শিশুতে কেন্দ্রীভূত।

ক্রমে শিশুর মুখে ভাষা ফুটিল। মাতা বালককে স্থানীয় বিদ্যালয়ে পাঠালেন।

তীক্ষ্ণধী বালক—অল্পকাল মধ্যেই আরবী বর্ণ-পরিচয় শিক্ষা করিয়া কুরআন পাঠ শুরু করিল।

কুরআন পড়িতে পড়িতে একদিন সে কুরআনের এই বচনটি পড়িল—"আমার প্রতি ও তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"

বালক ওস্তাদের নিকট এই বচনটির তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিল, ওস্তাদ যথাযথ বুঝাইয়া দিলেন।

বা-ইয়াজীদ ভাবিতে লাগিল, বাপ নাই; এক দিকে মা, আরেক দিকে আল্লাহ্—উভয়কে কার্যত: কৃতজ্ঞতা দেখাইতে হইবে। দুই মনিবের খেদমত—বড়ই কঠিন।

বা-ইয়াজীদ ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। বা-ইয়াজীদ তখনই কেতাব বন্ধ করিয়া উঠিল এবং দ্রুত বাড়ীর দিকে চলিল। অসময়ে পুত্রকে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া মাতা শংকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, আজ কি পালিয়ে এসেছিস্, না আমার জন্য কিছু ভাল খাবার নিয়ে এসেছিস?"

বালক উত্তর করিল, "না, মা, এর কোনটিই নয়। আজ কুরআন পড়তে পড়তে এই বচনটি পড়লাম। পড়ে বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছি। আমার ক্ষুদ্র

শক্তি, দুই মনিবের কাজ আমাকে দিয়ে কি করে হয়? আমাকে তোমার কাজে রাখো ; নাহয় আল্লাহ্‌র কাজে ছেড়ে দাও ; আমার পক্ষে দুইই সমান।"

জননী পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং বলিলেন, "বাবা, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র কাজেই সঁপে দিচ্ছি, আমার দাবী আমি পরিত্যাগ করলাম।"

বালকের ঘাড় হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল ; সে মহা আনন্দে বিদ্যালয়ে ফিরিয়া গেল।

ইহার পর তাঁহার কথাবার্তায়, চালচলনে প্রকাশ পাইতে লাগিল যেন সে অনুক্ষণ খোদার কাজে ব্যাপৃত।

ক্রমে বা-ইয়াজীদ সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

একদা বা-ইয়াজীদ জননীর নিকট শেষ বিদায় লইয়া বাগদাদ যাত্রা করিলেন। কয়েক বৎসর বাগ্‌দাদে বিদ্যাভ্যাস করার পর দিব্যজ্ঞান লাভার্থে তিনি সিদ্ধ সাধকদের অন্বেষণে বাহির হইলেন।

বা-ইয়াজীদ কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। পাহাড়ে পর্বতে, প্রান্তরে, কান্তারে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি তিন শত ষাট জন সিদ্ধপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

অবশেষে তাঁহার সাধনায় সিদ্ধি লাভ ঘটিল ; তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন, আত্মশুদ্ধির পর বা-ইয়াজীদ পরশুদ্ধিতে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি বিভিন্ন দেশে গমন করিয়া সকলকে ধর্মের বাণী শুনাইতে লাগিলেন। তাঁহার অগাধ জ্ঞান, অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি, সর্বোপরি তাঁহার সুপবিত্র চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া লক্ষ লক্ষ লোক ধর্মপথে আসিল।

এমনিভাবে ত্রিশ বৎসর কাটিয়া গেল। এমন সময় তাঁহার মূল গুরু ইমাম জাফর সাদিক তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ব্যস, এখন গিয়ে জননীর কিছু কাজ কর।"

ত্রিশ বৎসর পর বা-ইয়াজীদ নিজ বাসভূমি বোস্তাম যাত্রা করিলেন। তখন বা-ইয়াজীদ বোস্তামীর যশের কিরণ দিগ-দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তিনি যেখানে যান, নগর গ্রাম ভাঙিয়া লোক তাঁহার পিছনে ছোটে।

তাঁহার নিজ বাসভূমিতেও এমনি লোক সমাগমের আশঙ্কা করিয়া তিনি গোপনে গভীর নিশীথে মায়ের ঘরের দুয়ারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

উপস্থিত হইয়া তিনি শুনিলেন, ঘরের ভিতরে তাঁহার মা প্রার্থনা করিতেছেন, "প্রভু, আমার বাছাকে তোমারি পথে সঁপে দিয়েছি, তুমি তাকে ভালবেসো, ভাল ভাবে রেখো।"

শুনিয়া বাইয়াজীদ দুয়ারে হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। শব্দ মায়ের কানে গেল। তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "তুই কে-রে? তোর আওয়াজ যে আমার বা-ইয়াজীদের আওয়াজের মত।"

বা-ইয়াজীদ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "দুয়ার খোলো মা, আমি এসেছি।"

দুয়ার খোলা হইল। বা-ইয়াজীদ যাইয়া মায়ের পায়ের তলায় আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

মা বা-ইয়াজীদকে তুলিয়া তাঁহার মাথায় মুখে পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "বড় বিলম্বে এসেছিস, বাছা, বড় সাধ ছিল তোর মুখখানা ফের দেখি, কিন্তু আমার চোখ থাক্‌তে আসিস নাই।"

বা-ইয়াজীদ মায়ের সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। ইহার পর যতদিন মা বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন তিনি আর গৃহত্যাগ করেন নাই।

—তাজকেরাতুল আউলিয়া

মুরদের আগমন

গথ শাসকদের অত্যাচারে জর্জরিত স্পেন দীর্ঘকাল হইতে তাহার মুক্তি-মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু এতদিন তাহার দৃষ্টিপথে ছিল শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। এমন সময় অকস্মাৎ তাহার দূর-দিগন্তে দেখা দিল উষার ধূসরছটা।

তখন কাউন্ট জুলিয়ান গথ সম্রাট রডারিকের প্রতিনিধি হিসাবে কিউটা শাসন করিতেছিলেন। ওদিকে দামেস্কের খলীফা ওলীদের প্রতিনিধি হিসাবে মূসা মিসর দেশে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন।

কথিত আছে, কাউন্ট জুলিয়ানের কন্যা কুমারী ফ্লোরিণ্ডা রডারিক-মহিষীর পার্শ্বচারিণীরূপে তাঁহার সঙ্গে রাজধানীতে ছিল। এক অশুভ মুহূর্তে রডারিক

ফ্লোরিন্ডাকে অপমান করিয়া বসিলেন। কুপিতা কুমারী এ নিদারুণ কাহিনী পিতাকে সবিস্তারে লিখিয়া জানাইলেন।

কাউন্ট জুলিয়ান ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি মূসাকে স্পেন আক্রমণ করতঃ এই পাপাচারী সম্রাটের অত্যাচার হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

কাউন্ট জুলিয়ানের এ আহ্বানে সাড়া দিতে মূসার বিলম্ব হইল না। মরক্কোর অধিবাসী তরুণ তেজস্বী যোদ্ধা তারিক। মূসা তাঁহাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া স্পেন অভিযানে প্রেরণ করিলেন।

এই সময় সম্রাট রডারিক কাউন্ট জুলিয়ানকে কতকগুলি ভাল ভাল বাজপাখী পাঠাইতে লিখিলেন। জুলিয়ান তখন আরব বাহিনীর কথা ভাবিতেছিলেন। তিনি সম্রাটকে উত্তরে লিখিলেন: হাঁ, এবার আমি আপনার জন্য অনেকগুলি নতুন রকমের বাজপাখী আমদানীর চেষ্টায় আছি। যদি আমার সে চেষ্টা সফল হয়, তবে সম্রাট বুঝিবেন যে অমন বাজপাখী সম্রাট জীবনে আর কখনো দেখেন নাই।

নতুন বাজপাখী অবশেষে সত্যই আসিয়া পৌঁছিল। ৭১১ খৃস্টাব্দে তারিক জিব্রালতারে* অবতরণ করিয়া আসিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন; সংবাদ পাইয়া রডারিকও এক বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া আসিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন।

তারিক দেখিলেন, বিদেশ, বিভুঁই স্থান, সম্মুখে অগণ্য শত্রুসৈন্য, তাহাদের তুলনায় তাঁহার নিজ সৈন্যসংখ্যা অতি অল্প; আর এ বিপুল শত্রু-সমাবেশ দেখিয়া তাঁহার সৈন্যদল যেন কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

তারিক কিছুক্ষণ ভাবিলেন। তাহার পর আদেশ দিলেন, "যে সব জাহাজে আমরা সমুদ্র পাড়ি দিয়েছি সে সমস্ত ডুবিয়ে দাও।"

তাঁহার আদেশ পালিত হইল। তখন তিনি সৈন্যদের সম্মুখে আসিয়া তাহাদিগকে সম্বোধন করতঃ বলিলেন—"বন্ধুগণ, আমাদের সম্মুখে দুশমন, পশ্চাতে দরিয়া: সে দরিয়ার বুকে জাহাজ কিশতী কোথাও কিছু নাই, আছে শুধু উত্তাল তরঙ্গের ভৈরব গর্জন। কাজেই দেশে ফিরে যাওয়ার কোন উপায় নাই। যদি আজ তোমরা পশ্চাদাবর্তন কর, তবে তোমাদের জাতি, সমাজ ও দেশের মুখে

---

* তারিক যে পাহাড়ময় মাটিতে অবতরণ করেন, তাহার নাম হয় জিব্রালতার (জবল-আল-তারিক=তারিকের পাহাড়=জিব্রালতার)।

অবলিপ্ত হবে দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা, আর ঘৃণ্য পশুর মত ঐ জলধিতলে হবে তোমাদের অপমৃত্যু। কিন্তু যদি তোমরা তোমাদের দেশ-মাতৃকার বীরপুরুষের মত সম্মুখে অগ্রসর হও, তবে জয়ী হলে জগতে থেকে যাবে অক্ষয় কীর্তি, সমর-শয্যাগ্রহণ করলেও তোমাদের সামনে খুলে যাবে চিরবাঞ্ছিত বেহেশতের দুয়ার। এই আমি তলোয়ার কোষমুক্ত করে চল্লাম; এখন তোমরা কে কে আমার সঙ্গে যাবে, বল।"

আল্লাহু আকবর বলিয়া সকলে সমস্বরে উত্তর দিল, "আমরা সবাই আপনার সাথে যাব, সিপাহ্‌সালার থাকতে আমরা আজরাঈলের সঙ্গে লড়তেও রাজী।"

তারিকের সৈন্যদল হুঙ্কার ছাড়িয়া অগ্রসর হইল। উভয়পক্ষের যোদ্ধাদের আস্ফালনে ময়দান কাঁপিয়া উঠিল। ঝড়ে ঝরা খোরমার মত নিহতদের বিচ্ছিন্ন শির ইতস্তত ছুটিয়া পড়িতে লাগিল।

তারিকের বীর বাহিনীর আক্রমণের সম্মুখে রডারিকের সৈন্যদল টিকিল না; বহু সহস্র মৃতদেহ ময়দানে ফেলিয়া, তাহারা প্রস্থান করিল। স্পেনের ইতিহাসে শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল।

—লেইনপুল

ধ্বংসের বীজ

জালুলার বিস্তৃত ময়দান সৈন্যের কোলাহল মুখরিত, যোদ্ধার হুঙ্কারে কম্পিত, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায় ঝঙ্কৃত।

একদিকে পরাক্রান্ত পারস্য সম্রাট ইয়াজ্‌দ্‌ জার্দের বিপুল সৈন্যবাহিনী, অগণিত, সুসজ্জিত, গর্বোদ্ধত; অন্যদিকে ইরাকের সুবাদার সা'দের আরব বাহিনী—সংখ্যায় স্বল্প, পোশাকে চাকচিক্যহীন, কিন্তু নবধর্মবলদৃপ্ত, অত্যাচারী সম্রাটের শাসনশৃঙ্খল ছিন্ন করিতে দৃঢ়সংকল্প।

ময়দানে ধূলির মেঘ জমিল, তলোয়ারে বিদ্যুৎ খেলিল, তীরের বর্ষণ আরম্ভ হইল, রক্তের ফোয়ারা ছুটিল।

কিন্তু পারস্য সৈন্যবাহিনী টিকিল না; কয়েক সহস্র লাশ ময়দানে রাখিয়া পলায়ন করিল; তাহাদের বিপুল রসদ-স্তূপ পড়িয়া রহিল, তাহাদের পরিত্যক্ত ধন-সম্ভারে আরব বাহিনীর ছাউনী ভরিয়া উঠিল।

লুণ্ঠিত ধন-সম্ভার মদীনার খলীফা উমর (রা.)-এর নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

জালুলার বিজয় সংবাদে মদীনায় আনন্দের তুফান বহিয়া গেল, সকলে আনন্দ জ্ঞাপন করিবার জন্য খলীফা উমর (রা.)-এর নিকট চলিল।

তাহারা যাইয়া দেখিল, জালুলার লুণ্ঠিত ধন-সম্ভার সম্মুখে রাখিয়া উমর (রা.) নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন।

বিজয়ের দিনে অশ্রু বিসর্জন! সকলে বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। হযরত উমর (রা.) অশ্রুসজল চক্ষু তুলিয়া বলিলেন, "এই লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভিতর আমি মুসলিম সমাজের ধ্বংসের বীজ দেখতে পাচ্ছি।"

—হীরকহার

ইকরামা ও খুজায়মা

ইউফ্রেতীস ও তাইগ্রীস নদীর মাঝখানে জজীরা প্রদেশ। দামেস্কের খলীফা সোলায়মান বিন আবদুল মালিকের আমলে এই জজীরার খুজায়মা নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার বিপুল বিত্ত, অসীম প্রতিপত্তি এবং উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক রুচি ছিল। বিদ্বান ও বিপন্নের তিনি পরম বন্ধু ছিলেন। কবি, পণ্ডিত, ফকীর, দরবেশ, দোস্ত ও ভক্তে তাঁহার মজলিস গুলজার থাকিত।

তারপর অকস্মাৎ খুজায়মার ভাগ্যের দরিয়ায় ভাটা শুরু হইল। তাঁহার টাকাকড়ি নিঃশেষ হইয়া গেল, প্রভাব প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হইল, ভক্ত বন্ধুরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। বহুদিন পর্যন্ত যাহারা তাঁহার অন্নে লালিত পালিত আজ তাহারাও তাঁহাকে দেখিলে অন্য পথ ধরে।

ভাগ্য অন্বেষণে যে জজীরার বাইরে যাইবেন খুজায়মার এখন সে সঙ্গতিও নাই। বিশেষতঃ বন্ধুদের নির্দয় ব্যবহারে তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। তাই তিনি সংকল্প করিলেন যে বাকী জীবন তিনি নিজ গৃহে নির্জনে কাটাইয়া দিবেন।

দিন আসে দিন যায়। কিন্তু খুজায়মার দিন আর যায় না; অভাবের জ্বালায় তাঁহার জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিল, ক্রমাগত অনশনে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল।

এই সময় ইকরামা নামক এক মহৎ ব্যক্তি জজীরার সুবাদার ছিলেন। একদিন তাঁহার দরবারে আলাপ প্রসঙ্গে খুজায়মার কথা উঠিল। একজন সভাসদ খুজায়মার বর্তমান দুর্দশার কথা বর্ণনা করিলেন। না দেখিলেও খুজায়মার প্রতি ইকরামার একটা গভীর শ্রদ্ধা ছিল। কাজেই, খুজায়মার দুরবস্থার সংবাদে ইকরামা নিতান্ত ব্যথিত হইলেন; কিন্তু তিনি সে কথা প্রকাশ না করিয়া অন্য বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন।

গভীর রজনী। সমস্ত নগরী জনহীন, নিস্তব্ধ, সুপ্ত। এমন সময় ইকরামা ঘোড়ায় চড়িয়া নীরবে তাঁহার প্রাসাদ হইতে নির্গত হইলেন—তাঁহার সঙ্গে একমাত্র বিশ্বাসী গোলাম,—গোলামের হাতে একটি ভারি টাকার তোড়া।

ক্রমে ইকরামা খুজায়মার বাড়ীর কাছে আসিলেন। তখন তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া গোলামের হাতে ঘোড়া রক্ষার ভার দিয়া তোড়া হাতে একা একা চলিলেন।

খুজায়মার বাড়ীর দুয়ারে যাইয়া ইকরামা কড়া নাড়িতে আরম্ভ করিলেন। খুজায়মার ঘুম ভাঙ্গিল; তিনি ভাবিলেন, "এই গভীর রাত, আর এই হত-ভাগ্যের ভাঙ্গা কুটির—কে এমন সময়ে এখানে আসিতে পারে।"

খুজায়মা আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিলেন। ইকরামা "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলিয়া তাঁহার হাতে তোড়াটি তুলিয়া দিলেন এবং ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, "দোস্ত, এই ক্ষুদ্র সওগাত আপনার অভাব দূর করার জন্য।"

এই বলিয়া ইকরামা ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন কিন্তু খুজায়মা তাঁহার জামার আস্তিন টানিয়া ধরিয়া বলিলেন, "আপনার পায় আমার জান কুরবান হোক, কিন্তু মেহেরবানী করে বলুন, আপনি কে।" ইকরামা বলিলেন, "দোস্ত, জানাবার অভিপ্রায় থাকলে আর এ অসময়ে আসব কেন?"

খুজায়মা কহিলেন, "আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, উপকারীর নাম জানতে না পারলে আমি কিছুতেই তাঁর সওগাত গ্রহণ করব না।"

ইকরামা বলিলেন, "তাহলে আমাকে 'বিপন্নের সেবক' এই নামে ডাকতে পারেন।" এই বলিয়া তিনি হঠাৎ আস্তিন ছাড়াইয়া লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন।

এদিকে ইকরামার স্ত্রী ঘুম হইতে জাগিয়া দেখেন, স্বামী ঘরে নাই। তিনি উদ্বিগ্ন ভাবে সারা প্রাসাদময় খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

এমন সময় ইকরামা ফিরিলেন। স্ত্রী ধরিয়া বসিলেন, এত রাত্রে হঠাৎ এমন ভাবে গায়েব হওয়ার কারণ কি?

ইকরামা বলিতে রাজী নহেন। কিন্তু বিবিও নাছোড়বান্দা। অগত্যা ইকরামাকে সব কথা বলিতে হইল। তবে তিনি সর্বশেষে স্ত্রীকে অনুরোধ করিলেন "খবরদার, আল্লাহ্, তুমি, আমি—এই তিনজন ছাড়া এ দুনিয়ার আর কেউ যেন এ কথা না জানতে পারে।"

খুজায়মা তোড়া লইয়া তাড়াতাড়ি বিবির কাছে যাইয়া বলিলেন, "বিবি শীঘ্র আলো জ্বাল, এই দেখ এক অজানা বন্ধু কি দিয়ে গেলেন।" কিন্তু সে রাত্রিতে ঘরে আলো জ্বালিবার মত কিছুই ছিল না; সুতরাং সকাল পর্যন্ত তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইল। প্রভাতের প্রথম আলোতে তাঁহারা তোড়া খুলিয়া দেখেন—ওঃ আল্লাহ্! এ যে চার হাজার মোহর!

খুজায়মা প্রথমে তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিলেন। তাহার পর এক প্রস্থ ভাল পোশাক কিনিয়া দামেস্ক রওয়ানা হইলেন। খলীফা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করি-লেন, এবং এতদিন কেন রাজধানীতে আসেন নাই জানিতে চাহিলেন।

খুজায়মা তাঁহার সমস্ত দুর্দশার কথা খলীফাকে জানাইলেন এবং তাঁহার অচিন বন্ধুর উপকারের কথাও বর্ণনা করিলেন।

খলীফা তো শুনিয়া অবাক—"এমন নিঃস্বার্থ উপকারীও এ জামানায় আছে! হে অজানিত দাতা, তোমায় ধন্যবাদ। শোন, খুজায়মা, যদি কখনো তোমার এই 'বিপন্নের সেবক'-এর পরিচয় পাও, তবে নিশ্চয় তাঁকে আমার দরবারে নিয়ে আসবে—আমি তাঁকে সালাম করব।"

রাজধানীতে খলীফার খাস মেহ্মান হিসাবে খুজায়মা অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইতোমধ্যে ইকরামার বিরুদ্ধে খলীফার কাছে একটি গুরুতর অভিযোগ উপ-স্থিত হওয়ায় খলীফা খুজায়মাকে জজীরার সুবাদার নিযুক্ত করিতে প্রস্তাব করিলেন। খুজায়মা রাজী হইলেন।

যথাসময়ে খুজায়মা দলবলসহ রওনা হইলেন। জজীরার রাজধানীর নিকটস্থ হইলে ইকরামা বহু আমীর, রইছ ও সিপাহী সহ আসিয়া খুজায়মাকে মহাসম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।

কিন্তু তহবিল বুঝাইয়া দেওয়ার সময় গোল বাধিল। খুজায়মা দেখিলেন আর সব ঠিক আছে, কেবল তহবিলে চার হাজার আশরফীর অভাব। ইকরামা স্বীকার করিলেন, তিনি ঐ অর্থ সরকারী তহবিল হইতে বাহির করিয়া লইয়াছেন আর ফেরত দেন নাই। কি কাজে খরচ করিয়াছেন, তাহা তিনি বলিতে নারাজ।

খুজায়মা বলিলেন, "বেশ, তবে টাকাটা দিয়ে দিন, গোল মিটে যাক।"

ইকরামা বলিলেন' "আমি অপারগ।"

খুজায়মা খলীফাকে সব জানাইলেন। খলীফা আদেশ দিলেন, "ইকরামাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠাও।" তাহাই করা হইল ; স্ত্রী ও বাঁদী এই দুইজনসহ ইকরামা জেলে গেলেন।

খুজায়মা সুখে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

এদিকে' ইকরামার কারা-জীবন শুরু হইল। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিল। অবশেষে তাঁহার স্ত্রীর ধৈর্যের বাঁধ টুটিয়া গেল। তিনি স্বামীকে কিছু না জানাইয়া বাঁদীকে ডাকিয়া বলিলেন, "সুবাদার খুজায়মার কাছে যাও—গিয়ে বল তাঁকে, তাঁর 'বিপন্নের সেবক'-এর আজ কি চরম দুর্দশা।"

সাহস ও বুদ্ধিতে বাঁদীর জুড়ি ছিল না। সে প্রাসাদে যাইয়া অতি কৌশলে সুবাদার খুজায়মার সঙ্গে দেখা করিল এবং চুপি চুপি তাঁহাকে বলিল, "হুজুর, আপনি বিলাস-ঐশ্বর্যের মধ্যে আনন্দ উল্লাসে দিন কাটাবেন, আর আপনার দুদিনের বন্ধু 'বিপন্নের সেবক' বিপাকে পড়ে জেল ভোগ করতে থাকবেন, এই কি বিচার ?"

শুনিবামাত্র সুবাদার তাঁহার আসন হইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি বলছ, বালিকা ? আমার দুদিনের বন্ধু কেন জেলে যাবেন ? কে তিনি ? কোথায় তিনি ? শীঘ্র বল।"

বাঁদী ইকরামার অবস্থা খুলিয়া বলিল। তখন খুজায়মার মনে হইল, তাইত —আমি পাইলাম চার হাজার আশরফী—আর ইকরামার তহবিলেও ঘাটতি পড়িল ঠিক চার হাজার আশরফী। একথা তো আগে মনে হয় নাই!

দরবারের কয়েকজন আমীরসহ খুজায়মা তৎক্ষণাৎ জেলে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ইকরামার সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিলেন, "মাফ করুন, দোস্ত, মাফ করুন। আমিই আপনাকে এই বিপদের মধ্যে টেনে এনেছি। তবে আমি কিছুই জানতাম না।"

ইকরামা বিব্রত হইয়া বলিলেন, "এ সব আলাপের মানে কি ? কে আপ-নার 'বিপন্নের সেবক'?"

তখন বাঁদী আসিয়া বলিল, "হুজুর, আম্মার আদেশে আমি এর কাছে সমুদয় বিবৃত করেছি।"

ইকরামা তখন খুজায়মাকে সস্নেহে টানিয়া তুলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন, "ভাই, আপনার কোন দোষ নাই—এ সবই অদৃষ্টের পরিহাস।"

তখনই ইকরামার জন্য মূল্যবান পোশাক খরিদ করিয়া আনা হইল। তৎপর সকলে ইকরামাকে তাঁহার স্ত্রী ও বাঁদীসহ মহা ধুমধামে সুবাদারের রংমহলে লইয়া গেল।

পরম আনন্দে দুই বন্ধুর দিন কাটিতে লাগিল। শীঘ্রই ইকরামা স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন।

তখন দুই বন্ধু মিলিয়া দামেস্কে চলিলেন। রাজধানীতে পৌঁছিয়া খুজায়মা খলীফাকে খবর দিলেন। খলীফা তখনই সুবাদারকে ডাকিয়া পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কি? হঠাৎ এমন সময়ে কেন? কোন দুঃসংবাদ নাই তো?"

খুজায়মা---না, জাহাঁপনা, কোন দুঃসংবাদ নাই, সমস্তই ঠিকমত চলছে।

খলীফা—তবে এ আকস্মিক আবির্ভাব কেন?

খুজায়মা—জাহাঁপনা, আমার 'বিপন্নের সেবক'কে দেখতে চেয়েছিলেন।

খলীফা—তাঁর সম্বন্ধে কোন সংবাদ আছে?

খুজায়মা—হাঁ, জাহাঁপনা, তাঁকে পেয়ে একেবারে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

খলীফা—চমৎকার! তাঁকে এখানে নিয়ে এস, আমি তাঁকে দেখবার জন্য উদগ্রীব।

খুজায়মা—যো হুকুম (বাহির হইয়া যাইয়া ইকরামাকে লইয়া ফিরিলেন)।

ইকরামা—বন্দেগী, জাহাঁপনা।

খলীফা—এ কি? এ যে ইকরামা!

খুজায়মা—হাঁ, জাহাঁপনা, ইনিই আমার 'বিপন্নের সেবক'— আমাকে ইনিই চার হাজার আশরফী দান করার পর সেই দায়ে জেলে গিয়েছিলেন ---আমিই তাঁকে জেলে পাঠিয়েছিলাম।

খলীফা---ইকরামা, তুমি ধন্য; —এস বন্ধু (কোলাকুলি)। তোমার মত আমলা পেয়ে আমি কৃতার্থ। এই নও তোমার খেলাত।

ইকরামা—জাহাঁপনার মেহেরবানীর অন্ত নাই।

খলীফা—খুজায়মা, ইকরামাকে তোমারই হাতে সঁপে দিতে চাই।

খুজায়মা—তাহলে আমার প্রার্থনা, জাহাঁপনা, আমার ইস্তাফা মঞ্জুর করে ইকরামাকে পুনরায় জজীরার সুবাদার পদে বহাল করুন।

খলীফা—তোমার আবেদন মঞ্জুর। কিন্তু তোমাকেও তো আমার প্রয়োজন। এই নাও দশ হাজার আশরফী তোমার পুরস্কার—তুমি স্বেচ্ছায় জজীরার সুবাদারী ত্যাগ করে যথার্থ মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছ। আর এক্ষণে আর্মেনিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। তোমাকে সেই প্রদেশের সুবাদার নিযুক্ত করলাম।

—ইদ্রিস আহমদ

রিচার্ড ও সালাহুদ্দীন

জেরুজালেমে খৃস্টানদের প্রতি মুসলমানেরা ভয়ানক জুলুম করিতেছে—এই কল্পিত কাহিনী কয়েকজন ধর্মোন্মত্ত পাদ্রী য়ুরোপের দরবারে দরবারে, শহরে বাজারে ক্রমাগত প্রবেশ করিয়া সমগ্র খৃস্টান-জগৎকে মুসলিম-জগতের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিল। য়ুরোপের বহু রাজা, সামন্ত ও সৈন্য সাগর তরঙ্গের মত এশিয়ার উপকূলে ভাঙ্গিয়া পড়িল। এদিকে মুসলিম জাহানের তদানীন্তন নেতা মহাবাহু সালাহুদ্দীন ইসলামের ইজ্জত রক্ষার জন্য আল্লাহু-আকবর বলিয়া দাঁড়াইলেন। তৃতীয় ক্রুসেড শুরু হইল।

তখন ইংল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন সিংহ-হৃদয় রিচার্ড। বিপুল বপু, আসুরিক শক্তি, অসাধারণ রণ-কৌশল, অফুরন্ত উৎসাহ, নির্ভীক হৃদয় আর অটুট যৌবন —সমস্ত মিলিয়া তাঁহাকে অজেয় করিয়া তুলিয়াছিল। তিনিও এ ক্রুসেডে যুদ্ধ করিতে আসিলেন।

জাফফার যুদ্ধ। খৃস্টান-মুসলমানে ভয়াবহ রক্তারক্তি চলিতেছে। অবশেষে মুসলিম বাহিনী দুলিয়া উঠিল; রণক্ষেত্র নাইট যোদ্ধাদের মুহুর্মুহু বিজয় হুঙ্কারে কাঁপিতে লাগিল; মুসলমান সৈন্যরা পলায়নপর হইল।

এমন সময় রিচার্ডের ঘোড়া আহত হইয়া পড়িয়া গেল, রিচার্ড মাটিতে দাঁড়াইলেন। এ অবস্থা তাঁহার পক্ষে বিষম বিপজ্জনক হইয়া পড়িল। কিন্তু তাঁহার এ বিপদ বেশীক্ষণ টিকিল না, একজন মুসলমান সৈন্য একটি অতি সুন্দর তাজী আনিয়া রিচার্ডকে দিতে দিতে বলিল, "আমার প্রভু, মহামান্য সুলতান দূর হইতে হুজুরের এই বিপদ লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি মনে করেন, তাঁহার দেশে আসিয়া আপনার মত একজন সাহসী যোদ্ধা মাটিতে দাঁড়াইয়া লড়িবেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অশ্লাঘার কথা। তাই তিনি এই উপহার পাঠাইয়াছেন।"

রিচার্ড তাজীতে চড়িয়া পুনরায় সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। মুসলমান সৈন্যরা পরিশেষে ময়দান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

নূতন ফৌজের জন্য সালাহুদ্দীনের সিঙ্গা বাজিয়া উঠিল; অমনি মিসর, সিরিয়া ও মসুল হইতে অগণ্য সৈন্য আসিয়া হাজির হইল। জাফ্ফার পরাজয়ের প্রতিশোধের জন্য সালাহুদ্দীন-বাহিনীতে রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল।

এমন সময় রিচার্ড পীড়িত হইয়া পড়িলেন। শুনিয়া সালাহুদ্দীন আক্রমণ স্থগিত রাখিলেন। সুলতান আরও শুনিলেন, নূতন দেশের গরমে রিচার্ড অস্থির; তাহার উপর প্রবল জ্বর; রাজা কেবল এপাশ ওপাশ করিতেছেন। সালাহুদ্দীনের মন গলিয়া গেল। সারিয়া না উঠা পর্যন্ত সুলতান প্রত্যহ রাজাকে ঠাণ্ডা ফল ও বরফ পাঠাইতে লাগিলেন।

রাজা ভাল হইলেন, কিন্তু ক্রুসেডে সুবিধা হইল না—পাষাণময় উপকূলে ক্রুদ্ধ তরঙ্গ যেমন আছাড়িয়া পড়িয়া ফিরিয়া যায়, সুলতানের সঙ্গে লড়িয়া রণ-ক্লান্ত খৃস্টান-বাহিনী তেমনই দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল।

বিদায়কালে জাহাজে চড়িয়া রিচার্ড সুলতানকে সংবাদ পাঠাইলেন, "আমি আবার আসিব—আবার যুদ্ধ করিয়া জেরুজালেম উদ্ধার করিব। আর সেবার আমার সঙ্গে থাকিবে অগণ্য সৈন্যবাহিনী।"

সুলতান উত্তর দিলেন, "আপনাকে সাদর আহ্বানের জন্য আমার ময়দান মুক্ত রহিল, বন্ধু! আর সঙ্গে অগণ্য সৈন্যের কথা লিখিয়াছেন—তা আমার দেশে তাহাদের কবরের স্থানের অভাব হইবে না।"

—লেইনপুল

হযরত রাবেয়া (র.)-এর ঈমান

বসরার সুবিখ্যাত তপস্বিনী রাবেয়া (র.)। তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির যশ প্রভায় চারিদিক উদ্ভাসিত: তাঁহার স্নিগ্ধ-মধুর কল্যাণপরশে পরিবেশ আমোদিত।

একদা রাত্রিতে হযরত রাবেয়া (র.) খাইতে যাইবেন, এমন সময় দুইজন মেহ্মান আসিয়া হাজির হইল। তাঁহার তহ্বিলে তখন মাত্র দুইটি রুটি। তিনি মহা ফাঁপরে পড়িলেন।

এমন সময় একজন ফকির আসিয়া কিছু খাবার চাহিয়া হাঁক ছাড়িল। রাবেয়া (র.) রুটি দুইটির সবই ফকিরের হাতে তুলিয়া দিলেন, নিজের জন্য বা মেহ্মানদের জন্য কিছুই রাখিলেন না।

মেহ্‌মান দুইজন মুখে প্রতিবাদ না করিলেও মনে মনে খুব ক্ষুণ্ন হইলেন। ভাবিলেন, "মিস্‌কিনের বাড়ীতে মেহ্‌মান হইলে এমনই হয়। নিজ বাড়ীর মেহ্‌মানকে অভুক্ত রাখিয়া ইনি পথের ফকিরকে সর্বস্ব দিয়া দিলেন।"

একটু পরেই পাশের এক বাড়ী হইতে একটি চাকরাণী এক খাঞ্চা ভরিয়া রুটি লইয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "হুজুরের খেদমতে নজর পাঠাইয়াছেন।" রাবেয়া (র.) গণিয়া দেখিলেন, আঠারটি রুটি। তিনি রুটি ফেরত দিয়া বলিলেন, "বাছা, তুমি ভুল করিয়াছ, এ রুটি আমার জন্য নয়।"

চাকরাণী সে কথা কানেই তোলে না, বলে, "না হুজুর। এ রুটি আপনার জন্যই।" কিন্তু রাবেয়া (র.) অটল।

অগত্যা চাকরাণীটি রুটি ফেরত লইয়া চলিয়া গেল।

মেহ্‌মানেরা আবার বিরক্ত হইয়া মুখ ভার করিল; বলিল, "বুড়ীর কাণ্ড দেখ।" কিন্তু একটু পরেই চাকরাণীটি খাঞ্চা লইয়া ফিরিয়া আসিল; বলিল, "সত্যিই ভুল হইয়াছিল, হুজুর, একই জায়গায় কয়েকটি খাঞ্চা ছিল কিনা, তাই একটার বদলে আর একটা আনিয়াছিলাম।"

রাবেয়া (র.) এবার গুণিয়া দেখিলেন, কুড়িটি রুটি আছে, বলিলেন, "হাঁ, এবার ঠিক আছে।" এই বলিয়া রুটি রাখিয়া দিলেন।

মেহ্‌মানেরা এতক্ষণ কৌতূহলের সঙ্গে এই ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন। এবার তাঁহারা রাবেয়া (র.)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাবেয়া (র.) বলিলেন, "আমি জানিতাম, আপনারা ক্ষুধায় কাতর আছেন। কিন্তু আমার মাত্র দুইখানা রুটি সম্বল ছিল। আমি ভাবিয়া হয়রান হইয়াছিলাম, কেমন করিয়া এই অপর্যাপ্ত খাবার আপনাদের সামনে হাজির করি। কাজেই, ফকির আসিয়া যখন হাঁক ছাড়িল আমি যেন বাঁচিয়া গেলাম। তাহাকে দুই খণ্ড রুটি দিয়া মুনাজাত করিলাম, 'আল্লাহ্, তোমার পথে কিছু দান করিলে তুমি দশ গুণ করিয়া তাহা ফিরাইয়া দাও। তোমার এ আশ্বাস মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। তোমারই মহান নামে আমি এই ভিক্ষুককে দান করিলাম, তুমি ইহার দশগুণ আমাকে ফেরত দাও, যেন আমার মেহ্‌মানকে ভুখা থাকিতে না হয়।'

কাজেই, যখন মাত্র আঠারটি রুটি আসিল, তখন ভাবিলাম, এ সওগাত আমার জন্য হইতে পারে না, কারণ দুই টুকরা কম ছিল। বিশটি রুটি যখন আসিল, তখন বুঝিতে পারিলাম, আল্লাহ্ আমার সামান্য দানের পরিবর্তে দশ্ গুণ দান পাঠাইয়াছেন।"

—সৈয়দ এমদাদ আলী

রাখীর ভাই

গুজরাট অধিপতি বাহাদুর শাহ্ চিতোর অভিযানে চলিয়াছেন। এই রণ-দক্ষ দুর্দান্ত আক্রমণকারীর আগমন সংবাদে সমস্ত রাজপুতনায় মহাত্রাসের সঞ্চার হইল।

এই সময়ে চিতোরের শাসনকর্ত্রী ছিলেন রাণী কর্ণাবতী। কর্ণাবতী বিধবা ছিলেন ; বাহাদুর শা'র তুলনায় তাঁহার সৈন্য-সম্পদ অতি সামান্যই ছিল। তিনি চিন্তার দরিয়ায় হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে কর্ণাবতী হঠাৎ কূল পাইলেন। বহুকাল হইতে রাজপুতদের মধ্যে রাখী বন্ধনের প্রচলন ছিল। কোন নারী হয়তো এক গাছি সুতা (রাখীর সুতা) কোন পুরুষকে পাঠাইয়া দিতেন। পুরুষ সেই সুতাটি গ্রহণ করিলে উভয়ের মধ্যে ভাই-বোন সম্বন্ধ স্থাপিত হইত। রাখীর বোনের কোন আপদ-বিপদ ঘটিলে রাখীর ভাইয়ের কর্তব্য হইত, প্রাণপণে ঐ বিপদ হইতে রাখীর বোনকে রক্ষা করা।

এই রাখীর কথা কর্ণাবতীর মনে পড়িল। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, এক হুমায়ূন ছাড়া সমগ্র ভারতে আর কেহই তাঁহাকে এ আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন না। তখন তিনি রাখীর একগাছি সুতা হুমায়ূনকে পাঠাইয়া লিখিলেন, "আজ হইতে আপনি আমার ভাই ; এখন আসিয়া আপনার বোনের রাজ্য ও ইজ্জত রক্ষা করুন।"

হুমায়ূন তখন বাংলাদেশে শেরশাহ'র সঙ্গে সংগ্রামে ব্যাপৃত। পত্র পাইয়া তিনি আকাশ পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এখন কি করা যায় ? যদি এই অবস্থায় বাংলা ছেড়ে যাই, তবে শেরশাহ্ অবাধে নতুন নতুন শক্তি সংগ্রহ করে দুর্জয় হয়ে পড়বে—তার ফলে হয়তো মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি পর্যন্ত টলে উঠবে। কিন্তু এই বিপন্ন নারীর কাতর প্রার্থনাই বা কি করে উপেক্ষা করি ? লোকে কি বলবে ? নিজ বিবেকের কাছেইবা কি জবাবদিহি করব ? না, অদৃষ্টে যাই থাক, রাখীর বোনের এ আহ্বান কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করা চলে না।

হুমায়ূন রাখী গ্রহণ করিলেন। অগৌণে তিনি চিতোরের পথে চলিলেন। চিতোরের অদূরে বাহাদুর শাহ'র সঙ্গে হুমায়ূনের সাক্ষাৎ ঘটিল। তুমুল যুদ্ধ শুরু

হইল। বাহাদুর শাহ্ পরাজিত হইয়া গুজরাটে পলাইয়া গেলেন। বিজয়ী হুমায়ুন রাখী বোনকে অভয় জানাইতে আনন্দচিত্তে চিতোর যাত্রা করিলেন। কিন্তু হায়! এ জীবনে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল না। হুমায়ূনের আগমন-সংবাদ সময় মত না পাওয়ায় কর্ণাবতী ভীত হইয়া ইতোপূর্বেই জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন।

শেরশাহ্ ইতোমধ্যে এত শক্তি সঞ্চয় করিয়া ফেলিলেন যে পরবর্তী যুদ্ধে হুমায়ূন পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইলেন।

—গোলাম মস্তফা

একটি তুর্কী ভাগ্যান্বেষী

তুরস্কের শতযুদ্ধ-বিজয়ী প্রতাপান্বিত সম্রাট মহান সুলতান সুলায়মান; —তাঁহারই অজেয় সৈন্যবাহিনীর অন্যতম যোদ্ধা ইউসুফ খাঁ।

এক নৌযুদ্ধে এই ইউসুফ খাঁ আহত হইয়া সেন্ট জনের নাইটদের হাতে বন্দী হইল। কতকগুলি পর্তুগীজ বণিক ভারতে আসিতেছিল; নাইটরা ইউসুফ খাঁকে ইহাদের নিকট বিক্রয় করিল। বণিকেরা সমস্ত পথ নিরাপদেই আসিল; কিন্তু ভারতের নিকটে আসিবামাত্র একদল জলদস্যু তাহাদের জাহাজ আক্রমণ করিল। এই দুর্দান্ত জলদস্যুদের আক্রমণ হইতে উদ্ধারের কোনই পথ রহিল না। এমন সময় তুর্কী গোলাম ইউসুফ খাঁ অনেক বলিয়া কহিয়া জাহাজ রক্ষার ভার গ্রহণ করিল এবং এমন দক্ষতা ও সাহসের সঙ্গে আক্রমণ চালাইল যে দস্যুরা পালাইয়া যাইতে বাধ্য হইল। জাহাজময় ইউসুফ খাঁর নামে জয়-জয়কার পড়িয়া গেল।

জাহাজ গোয়া বন্দরে আসিয়া নোঙ্গর করিল। জাহাজের কাপ্তান ইউসুফ খাঁকে ডাকিয়া কহিল, "ইউসুফ খাঁ, তুমি আমার জাহাজ রক্ষা করেছ, তোমার কাছে আমি ঋণী, আমি সেই ঋণের বদলে তোমাকে গোলামি হতে মুক্তি দিচ্ছি। আর এই লও এক থলিয়া মুদ্রা। এখন তুমি নিজ ভাগ্য অন্বেষণে বের হও।"

ইউসুফ খাঁ কাপ্তানকে ধন্যবাদ দিয়া সালাম জানাইল। কাপ্তান পুনঃ বলিল, "আরও শোন, ইউসুফ খাঁ, তুমি যদি ইচ্ছা কর, পর্তুগীজ লাটের নিকট তোমার চাকরির জন্য আমি সুপারিশ করতে পারি, কিন্তু তোমাকে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে।" ইউসুফ খাঁ পুনরায় কাপ্তানকে ধন্যবাদ দিয়া কহিল, "আমার চাকরির জন্য যা করতে চাচ্ছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ; কিন্তু চাকরির জন্য স্বধর্ম ত্যাগ না করে বরং ভারতের কোন মুসলমান রাজ্যে চেষ্টা করে দেখব।"

ইউসুফ খাঁ শুনিল, বিজাপুর ও বিজয়নগরের মধ্যে শীঘ্রই যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিবে। সে তখন বাজারে গেল, আর ঐ টাকা দিয়া সে খরিদ করিল একটি অতি সুন্দর তাজী ঘোড়া, একটি তলোয়ার, একটি বন্দুক, একটি ঢাল এবং একটি লোহার জেরা। তাহার পর সে রওনা হইল বিজাপুরের পথে।

১৫৬৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ইউসুফ খাঁ বিজাপুর উপস্থিত হইল। তখন বিজাপুরে আনন্দ-উৎসবের স্রোত বহিতেছিল। আহমদনগরের রাজকন্যা চাঁদ বিবির সঙ্গে সুলতান আলী আদিলশার পরিণয়—সেই উপলক্ষে নগরবাসীরা উল্লাসে মাতিয়া উঠিয়াছে। ইউসুফ খাঁ শুনিল, সেদিন অপরাহ্নে শাহী ময়দানে বিপুল ধূমধামে দ্বন্দ্বযুদ্ধের খেলা চলিবে এবং সে দ্বন্দ্বে যে জয়লাভ করিবে, সে সুলতানের দেহরক্ষীর কাপ্তান নিযুক্ত হইবে। সে দেখিল, দলে দলে লোক, কেহ ঘোড়ায়, কেহ গাড়ীতে, কেহ পাল্কীতে চড়িয়া, কেহ বা পায়ে হাঁটিয়া ময়দানের দিকে চলিয়াছে; তাহাদের পোশাক পরিচ্ছদের চমকে চোখ ঝলসিয়া যাইতে চায়। ইউসুফ ভাবিল, "আমার পক্ষে একটি স্বর্ণ-সুযোগ উপস্থিত। যদি জিতিতে পারি, আমার ভাগ্যের স্রোত ফিরিয়া যাইতে পারে।" সে তখনই ময়দানে গিয়া প্রতিযোগীদের মধ্যে নিজ নাম দাখিল করিয়া লইল।

ময়দান লোকে লোকারণ্য—কেহ চেয়ারে, কেহ বেঞ্চিতে, কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ গাছের ডালে।

পঞ্চাশটি যোদ্ধা প্রতিযোগিতার জন্য প্রার্থী ছিল। তখন তাহাদের তীরন্দাজীর একটা প্রাথমিক পরীক্ষা দ্বারা সংখ্যা কমানোর ব্যবস্থা করা হইল। চার ব্যক্তি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল; ইউসুফ খাঁ, সিদী হাসান, সুলতানের দেহরক্ষীদের একজন, সম্রাট আকবরের দরবার হইতে আগত একজন মোগল। সিদী হাসান এক বিরাট বপু হাবশী—বিজাপুর পুলিশের একজন বড় অফিসার।

প্রথমে সিদী হাসান ও সুলতানের দেহরক্ষীর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হইল। দুইজন ময়দানের দুই দিকে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। সমস্ত ময়দান নিস্তব্ধ। সহসা

বাঁশী বাজিয়া উঠিল, আর অমনই দুইজন তীরবেগে আসিয়া ময়দানের মাঝখানে পরস্পর সম্মুখীন হইল। দেহরক্ষীর বর্শা সিদী হাসানের ঢালের ঠিক মধ্যস্থলে আঘাত করিল; আঘাতের ধমকে ঢাল হইতে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল; কিন্তু সিদী হাসান টলিল না। সিদী হাসানের বর্শা দেহরক্ষীর দক্ষিণ স্কন্ধে আঘাত করিল, তবে কিছু করিতে পারিল না। লোহার জেরায় ঠেকিয়া বর্শা ফিরিয়া গেল। কিন্তু এই বিরাট বপু যোদ্ধার আঘাতের ধমকে দেহরক্ষীর ঘোড়া হটিয়া গিয়া পিছনের দুই পায়ের উপর দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া গেল; সিদী হাসান সোজা আগাইয়া গেল। বিচারকেরা ঘোষণা করিল, "সিদী হাসান জয়লাভ করিয়াছে।"

ইহার পর আসিল ইউসুফ খাঁ ও দিল্লীওয়ালা মোগলের পালা। ইহারা যথানিয়মে ময়দানের মধ্যস্থলে পরস্পর সম্মুখীন হইল। মোগলের বর্শা ইউসুফের ঢাল ভেদ করিয়া তাহাকে আঘাত করিল—লোহার জেরা না থাকিলে ইউসুফের বিপদ ছিল। ইউসুফ মোগলের মাথা লক্ষ্য করিয়া এমন জোরে আঘাত করিল যে মোগল অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ইউসুফ খাঁ তখনই ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল এবং মোগলের শুশ্রূষায় লাগিয়া গেল। একটু পরই মোগলের হুঁশ হইল; তখন সে ইউসুফ খাঁর কাঁধে ভর করিয়া ময়দান ত্যাগ করিল।

এইবার সিদী হাসান ও ইউসুফ খাঁর পালা আসিল। দুই যোদ্ধা ময়দানের দুই সীমায় গিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত দর্শক নিঃশ্বাস রোধ করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বাঁশী বাজিবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে মোগল যোদ্ধাটি আসিয়া ইউসুফ খাঁকে বলিল, "তোমার ঢালটি জখম হয়ে গেছে, এই নাও ভাই, আমারটি।" ইউসুফ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ঢাল বদল করিল। ইহার পর বাঁশী বাজিল। যোদ্ধাদ্বয় ভীষণ বেগে ঘোড়া হাঁকাইয়া ময়দানের মধ্যস্থলে পরস্পরকে আক্রমণ করিল। উভয়েরই বর্শা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। উভয়েরই ঘোড়া হটিয়া গিয়া পিছনের পায়ের উপর দাঁড়াইল, উভয় সওয়ারই গদীর উপর দুলিয়া উঠিল। সিদী হাসানের বেলায় একটা অঘটন ঘটিল: একদিকে হেলিয়া পড়িতেই, তাহার বিশালদেহের ভারে ঘোড়ার পেটি ছিঁড়িয়া গেল: সে অমনই মাটিতে পড়িয়া গেল। বিপুল উল্লাস ধ্বনিতে সকলে বিজয়ী ইউসুফ খাঁকে অভ্যর্থনা করিল। তাহাকে সুলতানের নিকট লইয়া যাওয়া হইল: সুলতান তাহাকে নিজ দেহরক্ষীদের কাপ্তান নিযুক্ত করিলেন।

এই সময় বিজয়নগর রাজ্য শক্তি সম্পদ ও শৌর্যে অদম্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার তরুণ শাসনকর্তা রাম রাজা ধীরে ধীরে পার্শ্ববর্তী মুসলিম রাজ্যগুলিকে গ্রাস করিবার আয়োজন করিতেছিলেন। তাই বিজাপুর, আহমদনগর, গোলাকুণ্ডা

ও বিদরের সুলতানগণ সন্ধিবদ্ধ হইয়া রাম রাজার প্রতিরোধে দাঁড়াইলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন, রাম রাজার প্রকৃত সৈন্যবল ও মতলব জানিবার জন্য একজন সাহসী হুঁশিয়ার লোককে বিজয়নগরে পাঠান প্রয়োজন। এই ভার ইউসুফ খাঁর উপর পড়িল।

ইউসুফ খাঁ শাদা দাড়ি লাগাইয়া ষাট বছরের বুড়া বনিয়া গেল; জামার নীচে লোহার কোট পড়িল, পকেটে একটি পিস্তল লইল, তাহার পর তুর্কী সওদাগর সাজিয়া বিজয়নগর যাত্রা করিল।

বিদেশী জিনিসের জন্য রাম রাজা ও তাঁহার রাণীর যথেষ্ট শখ ছিল। কাজেই, ইউসুফ খাঁ সহজেই অন্তঃপুরে রাজার খাস-কামরায় যাইবার অনুমতি পাইল। সেখানে রাজা ও রাণী সরস্বতী তাঁহার চারিজন পরিচারিকাসহ সওদাগরের জিনিসপত্র দেখিতে লাগিলেন। এই পরিচারিকাদের মধ্যে একটি ষোড়শী সুন্দরী ছিল; রাণী ইউসুফ খাঁর যে সব কথা সহজে বুঝিতেছিলেন না, এই সুন্দরী তরুণী তুর্কী ভাষায় তাহা ইউসুফ খাঁর নিকট শুনিয়া দেশী ভাষায় রাণীকে বুঝাইতেছিল।

এই তুর্কী রমণীর নাম আয়েশা। আয়েশা আহ্‌মদনগরের সুলতানের এক তুর্কী সেনাপতির কন্যা। এক যুদ্ধ-উপলক্ষে রাম রাজের সৈন্যরা আয়েশার বাপ-মাকে হত্যা করিয়া শিশু আয়েশাকে লুটিয়া আনে; রাম রাজা বালিকার সৌন্দর্যে প্রীত হইয়া তাহাকে রাণীর পরিচারিকা করিয়া দেন।

বহুদিন পর একজন স্বদেশবাসীকে দেখিয়া আয়েশার হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইল। রাজ-অন্তঃপুর হইতে বিদায়কালে সে রাজরাণীর অজ্ঞাতসারে তুর্কী ভাষায় চুপি চুপি ইউসুফকে বলিল, "আপনি যে সব হীরা জহরতের ব্যবসা করেন, তা খুব মূল্যবান—কিন্তু আজ দুপুর রাতে বড় শিবমন্দিরের ফটকে তার চেয়েও মূল্যবান কিছু মিলতে পারে, যদি তা কুড়িয়ে নেওয়ার মত সাহস থাকে।"

ইউসুফ খাঁ মুসাফিরখানায় ফিরিয়া আসিল। সে ভাবিতে লাগিল, আয়েশার এই হেঁয়ালীময় কথার মানে কি? অবশেষে সে ঠিক করিল, অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, সে শিব-মন্দিরের ফটকে যাইবেই।

ইতোমধ্যে যে সব মিলিটারী ব্যাপার ইউসুফ খাঁর চোখে পড়িয়াছিল, সে তাহা নোট বুকে লিখিয়া ফেলিল। ক্রমে রাত্রি বারটা বাজিল। ইউসুফ খাঁ তখন উঠিয়া বড় শিবমন্দিরের ফটকে গেল। আয়েশা আগেই আসিয়াছিল। সে ইউসুফ খাঁকে তাহার ব্যথিত জীবনের সব কথা জানাইয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল।

ইউসুফ খাঁ বলিল, "ভদ্রে! এই গোলামির শিকল ছিঁড়ে আপনাকে উদ্ধার করতে আমি আমার জান কুরবান করতেও রাজী; কিন্তু আমার সে চেষ্টা সফল হতে পারে যদি আসন্ন যুদ্ধে মুসলমানেরা বিজয় লাভ করতে পারে। অতএব হে ভদ্রে, আপনি এমন কোন জরুরী খবর দিতে পারেন কি, যা এই যুদ্ধে মুসলমান রাজাদের কাজে লাগতে পারে?" আয়েশা বলিল, "অন্দরের বাইরের কোন খবরই আমি জানি না—তবে একটা ছোট্ট সংবাদ হয়ত দিতে পারি। রাম রাজা রাণীকে চুপি চুপি বলছিলেন, 'বিজাপুর বাহিনীর সিদী হাসানকে ঘুষ দিয়ে বাধ্য করে ফেলেছি। বিজয়নগরের সৈন্যেরা লুকিয়ে থাকবে, সিদী হাসান বহু সৈন্য নিয়ে ইঙ্গুলগীর কাছে নদী পার হবে, তারপর সে আমাদের দলে যোগ দিবে; তখন আমাদের সৈন্যেরা হঠাৎ বের হয়ে আক্রমণ করবে এবং মুসলিম-বাহিনীকে ধ্বংস করে ফেলবে।"

এই সংবাদেই উসুফ উল্লাসিত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, আমি এখন যাই—আপনাকে উদ্ধারের সর্বপ্রকার চেষ্টা আমি নিশ্চয়ই করব।" ইউসুফ মুসাফির-খানায় ফিরিয়া আসিল। পরদিন সকালে ইউসুফকে বন্দী করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল, কারণ বিজয়নগরী পুলিশ তাহাকে গোয়েন্দা বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল। রাজা হুকুম দিলেন, "যুদ্ধের হাতীগুলো ফিরে আসুক—তাদেরই পায়ের তলায় এ পাষণ্ডকে পিষে মারতে হবে।"

ইউসুফ খাঁ কারাগারে বন্দী। এদিকে যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল—হিন্দু ও মুসলিম বাহিনী সদম্ভ পদক্ষেপে ময়দানের দিকে অগ্রসর হইল। পূর্ব ষড়যন্ত্র অনুসারে সিদী হাসান মুসলিম দলের চল্লিশ হাজারের এক অগ্রবাহিনীকে লইয়া ইঙ্গুলগীর দিকে চলিল। এদিকে রাম রাজা নিকটেই এক জঙ্গলে তাঁহার বিরাট বাহিনী লুকাইয়া রাখিলেন—তাঁহার সবগুলি কামানের মুখ মুসলিম বাহিনীর দিকে—ইশারামাত্র অগ্নিবর্ষণে উদ্যত। এমন সময় দেখা গেল, ইউসুফ খাঁ পাগ-লের মত ঘোড়া ছুটাইয়া সিদী হাসানের দিকে আসিতেছে। ইউসুফ বহু কৌশলে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াই লড়াইর ময়দানের দিকে ছুটিয়াছিল। কাছে আসিয়াই ইউসুফ খাঁ চীৎকার করিয়া বলিল, "সিদী হাসান, এক্ষুণি সৈন্যদলকে পাশ্চাদ্বর্তনের হুকুম দাও—নইলে তোমার ভাগ্যে বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যু!"

"পাষণ্ড, তুই আমাকে হুকুম দেবার কে?" এই বলিয়া সিদী হাসান তরবারি লইয়া ইউসুফকে আক্রমণ করিল।

ইউসুফ কৌশলে সে আক্রমণ এড়াইয়া পিস্তল দিয়া গুলী করিল,—সিদী হাসানের লাশ ধুলায় গড়াইয়া পড়িল।

এই আকস্মিক ব্যাপারে সৈন্যদলে ভয়ানক চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইল—ইউসুফকে বন্দী করিয়া সুলতান আলী আদিল শা'র নিকট লইয়া যাওয়া হইল। প্রমাণ লইয়া সুলতান দেখিলেন, ইউসুফের প্রত্যেক কথাই সত্য। তিনি তখন ইউসুফকে সিদী হাসানের স্থলে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। ১৫৬৫ সালের ২৫শে জানুয়ারীতে যে ভীষণ যুদ্ধ হইল তাহাতে রাম রাজা নিহত হইলেন, তাঁহার সৈন্যদল পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল।

সমগ্র বিজাপুরে ইউসুফ খাঁর জয় জয়কার পড়িয়া গেল। কিন্তু বিজয়ের মুহূর্তে তিনি বন্দিনী আয়েশাকে ভুলিলেন না। তিনি আয়েশাকে মুক্ত করিয়া আনিলেন। আয়েশা তাঁহার জীবনসঙ্গিনী হইল।

—ম্যাকমিলান

চিত্ত বিজয়ে বাবর

পানিপথের প্রান্তরে পাঠানদের পরাজয় ঘটিল। তারপর, পালা আসিল চান্দেরীর মেদিনী রাও এবং মিবারের রানা সঙ্গের। ইঁহারাও বাবরের শৌর্যের সম্মুখে মস্তক নত করিতে বাধ্য হইলেন। এইভাবে বাবর হিন্দুস্থানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাহানশাহ্ হইলেন।

কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানের পরাজয়কে রাজপুতের গর্বিত মন চরম পরাজয় বলিয়া মানিয়া লইতে পারিল না। তাহাদের যুবক-সম্প্রদায়ের ধমনীতে উষ্ণ শোণিত উষ্ণতর হইয়া ফুটিতে লাগিল: তাহারা প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিল।

দিল্লীর সমীপবর্তী যমুনার তীরভূমিতে একদা অপরাহ্নে একটি রাজপুত যুবককে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে দেখা গেল। সুস্থ, সবলকায় দীর্ঘাকৃতি যুবকের প্রশস্ত সুন্দর ললাট চিন্তার গভীর রেখায় কুঞ্চিত। যুবক ভাবিতেছিল: "বাবর, তোমার মৃত্যু অবধারিত, তুমি আমার দেশের স্বাধীনতা হরণ করেছ—তার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতেই হবে।"

পশ্চিম গগনে মেঘের বুকে বুকে আগুনের শিখা জ্বলিয়া উঠিল। আবার সন্ধ্যার ম্লানিমায় ক্রমে সে লালিমা ডুবিয়া গেল। ঊর্ধ্বে ঘনায়মান অন্ধকারের শামিয়ানা : তাহার তলে হাজার হাজার তারার ফানুস ফুটিয়া উঠিল। স্নিগ্ধ মলয় প্রবাহে ধরণীর বুক শীতল হইল।

কিন্তু রাজপুত যুবকের হৃদয়ের আগুন সমভাবেই জ্বলিতে লাগিল : তাহার মনে হইল, বাবরের রক্তধারা ভিন্ন সে শিখা নির্বাণের আর কোন উপায় নাই। ত্রস্ত হাতে তাহার সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বুকের কাপড়ের ভাঁজ হইতে বাহির করিল, ধার পরীক্ষা করিয়া আবার তাহা কাপড়ের তলে রাখিয়া দিল।

রাজপুত যুবক শুনিয়াছিল, বাবর কখনও কখনও দিল্লীর রাস্তায় বাহির হন —প্রজার অবস্থা নিজ চোখে দেখিবার জন্য। যুবকের মনে হইল, এই সুযোগে, একবার তাহাকে রাস্তায় পাইলেই হয়; হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাহার জীবলীলার অবসান ঘটাইব—সে দিল্লী রওনা হইল।

দিল্লীর রাজপথ। রাজপুত যুবক ধীরে পথ চলিতেছে; দেখিতেছে, বাবর বাহির হন কিনা। কিন্তু একি? হঠাৎ পথিকেরা এমনি চীৎকার করিতে করিতে পালাইতেছে কেন? যুবক চাহিয়া দেখিল, এক বিরাটাকায় মত্ত হস্তী বেগে ছুটিয়া আসিতেছে, আর পথিকেরা প্রাণভয়ে ইতস্তত পলায়ন করিতেছে।

কিন্তু পথের মাঝখানে; ও একটি শিশু নয়? হায়রে! উন্মত্ত পশুর পায়ের তলায় এখনি পিষ্ট হইয়া যাইবে। একজন পথিক চীৎকার করিয়া বলিল, "বাঁচাও—বাঁচাও, বাঁচাও শিশুটিকে" আর একজন বলিল, "চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা—কে ঐ শিশুকে বাঁচাইতে গিয়া প্রাণ হারাইবে?" তৃতীয় জন বলিল, "আরে ও ত মেথরের ছেলে, কে ওটাকে ছুঁইতে যাবে?"

ইতোমধ্যে হাতী একদম কাছে আসিয়া পড়িয়াছে! এই বুঝি শিশুটির ভবলীলা সাঙ্গ হয়। শিশুর বুকের উপর হাতী তাহার পা উঠাইল।—এমন সময় একটি পথিক উল্কার মত কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া শিশুটিকে লইয়া রাস্তার ওপারে গেল; হাতী নিজ পথে চলিল।

নিকটে লুক্কায়িত পথিকেরা সবিস্ময়ে দেখিল, শিশুটি আগন্তুকের কোলে —নিরাপদ। আগন্তুক বয়সে প্রৌঢ়—সুন্দর সুঠাম সবল দেহ, মাথা খালি, বহু মূল্য পাগড়ী রাস্তার মাঝখানে গড়াগড়ি যাইতেছে। কে একজন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবর—শাহানশাহ্ বাবর!"

রাজপুত যুবক নিকটেই ছিল। বাবরের নাম শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। "এই তবে বাবর? ইঁহাকেই হত্যা করিবার জন্য আমার এত দিনের আয়োজন?" সে ভাবিতে লাগিল।

একটু পরেই যুবক হঠাৎ অগ্রসর হইয়া বাবরের পদমূলে লুটাইয়া পড়িল। বাবর অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি যুবক? উঠ, কি বলিতে চাও, বল।"

যুবক কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "শাহনশাহ্, এই ছুরিকাঘাতে আপনাকে হত্যা করিবার জন্য আসিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি এখনই প্রমাণ করিলেন, প্রাণ নেওয়ার চেয়ে প্রাণ দান করাই মহত্তম।"

বাবর যুবককে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "হাঁ ভাই, জীবন নাশের চেয়ে জীবন রক্ষা করা সত্যই মহত্তম। আমি কিন্তু তোমার জীবন গ্রহণ করছি। আজ হতে তুমি সর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে: তোমাকে আমার প্রধান দেহরক্ষী নিযুক্ত করলাম।"

রাজপুত যুবক কুর্ণিশ করিয়া কহিল, "শাহানশাহ্, তাই হবে।"

—সুরেশ সমাজপতি

শান্তির দূত

নব ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে কুরায়েশরা ক্ষেপিয়া উঠিল! কহিল, "কী! এত বড় অন্যায়? আমাদের বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষের সনাতন ধর্ম—তার বিরুদ্ধে প্রচার? আর এই যে আমাদের স্বাধীন জীবন—সুরা, জুয়া, যুদ্ধ—যত ইচ্ছা ভোগ করতে পারি, ইহার উপর হস্তক্ষেপ? এ আমরা বরদাশ্‌ত করব না—কিছুতেই না। তলোয়ার হাতে নও, মুহম্মদকে হত্যা কর।"

কিন্তু মহানবী (স.)-এর প্রচার কাজ শত বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশেষে সত্যই কুরায়েশরা তাঁহাকে হত্যা করার জন্য লোক মোতায়েন করিল। অগত্যা মহানবী (স.) মদীনা চলিয়া গেলেন।

মদীনায় মহানবী (স.)-এর সাত বৎসর কাটিয়া গেল। একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন, কি ভীষণ বিপদের মধ্যে তাঁহার এই সময় অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার ও তাঁহার প্রচারিত ধর্মের নামনিশানা দুনিয়ার পিঠ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিবার জন্য দুশমনেরা চেষ্টার কোনও ত্রুটি করে নাই। তাঁহাকে হত্যা করার জন্য খঞ্জর, অগ্নি, বিষ, ছলনা কোনটিই ব্যবহার করিতে বাকী রাখে নাই।

এত যে অত্যাচারের তুফান, ইহার মধ্যেও মুহাজিরেরা তাঁহাদের মাতৃভূমি পবিত্র মক্কার মায়া ভুলিতে পারিলেন না। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে হযরত বেলাল (রা.)-কে কতই না জুলুম সহিতে হইয়াছে: মক্কার মরু ময়দানের উপর চিৎ করিয়া শোয়াইয়া তাঁহার বুকের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে ভারী পাথর: পিঠের তলের বালুকারাশি যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ, বুকের পাথর যেন জমাট অগ্নিটুকরা, উপর হইতে নিদারুণ সূর্য অনাবৃত দেহাংশের উপর আগুনের পিচকারী ছাড়িত। সেই বেলাল (রা.)-ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সময় সময় বলিতেন, "মক্কা, আমার চিরপ্রিয় মাতৃভূমি মক্কা, যদি তোমার স্নেহময় বুকে আর একটা রাতও কাটাতে পারতাম!"

সুতরাং এই সাত বৎসর পর যখন মহানবী (স.) হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন সকলে উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল।

হজ্জযাত্রীর শাদা পোশাক পরিহিত চৌদ্দ শত নিরস্ত্র সঙ্গীসহ হযরত (স.) মক্কা যাত্রা করিলেন। অবশেষে কাফেলা মক্কার নিকটবর্তী হোদায়বিয়ার ময়দানে আসিয়া পৌঁছিল।

যাত্রীরা পরদিন মক্কায় পৌঁছিবার স্বপ্নে বিভোর এমন সময় মক্কার সর্দারদের তরফ হইতে এক দূত আসিয়া রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে সংবাদ দিল, "মক্কা মুসলমানদের নিষিদ্ধ শহর: কিছুতেই তাহাদিগকে সেখানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না; আর এক পা মক্কার দিকে বাড়ালেই যুদ্ধ এবং সে যুদ্ধে মুসলমানদের ধ্বংস অনিবার্য।"

অনেক তর্কবিতর্কের পর মক্কাবাসীরা মুসলমানদের সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করিতে রাজী হইল। সন্ধির শর্তাবলী আলোচনার জন্য মক্কা হইতে ছহল নামে এক ব্যক্তি আসিল।

ছহল হযরত (স.)-কে ঘেঁষিয়া বসিল ও আলোচনাকালে মাঝে মাঝে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হযরত (স.)-এর দাড়িতে হাত দিতে লাগিল। ছহলের এ ব্যবহারে হযরত(স.) -এর সাহাবারা আগুন হইয়া উঠিলেন; কিন্তু হযরত(স.) ইশারা করিয়া তাঁহাদিগকে থামাইয়া রাখিলেন।

অনেক আলোচনার পর সন্ধির নিম্নরূপ শর্ত ঠিক হইল :

ক. এ বৎসর মুসলমানেরা কেহ মক্কায় প্রবেশ করিবে না।

খ. ভবিষ্যতে তাহারা মক্কায় আসিতে পারে, কিন্তু তিন দিনের বেশী তথা থাকিতে পারিবে না।

গ. যদি মক্কা হইতে কোন লোক মদীনায় পালাইয়া আসে, তবে মুসলমানেরা তাহাকে ফেরত পাঠাইবে কিন্তু মদীনা হইতে কেহ পালাইয়া মক্কায় গেলে মক্কাবাসীরা তাহাকে ফেরত পাঠাইবে না।

ঘ. বিবিধ।

সন্ধির এই শর্ত শুনিয়া মুসলমানেরা ক্ষেপিয়া উঠিল, কিন্তু হযরত (স.) তাহাদিগকে শান্তকরতঃ সন্ধিপত্র লিখিতে আদেশ দিলেন। হযরত আলী (রা.) লিখিতে শুরু করিলেন। কিন্তু প্রথমেই গোল বাধিয়া গেল, আলী (রা.) যেই লিখিয়াছেন, 'বিসমিল্লাহ্ হিররাহমানির রাহীম—পরম করুণাময় দয়াল আল্লাহ্‌র নামে'—অমনি ছুহল প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "কে তোমাদের আল্লাহ্ তাতো আমরা জানি না। এ কথাগুলি বাদ দিতে হবে"। হযরত (স.) বলিলেন, "বেশ, তাই হোক।" শব্দগুলি মুছিয়া দেওয়া হইল।

আবার যখন আলী (রা.) লিখিলেন, "আল্লাহ্‌র রসূল মুহম্মদের পক্ষ হইতে"—অমনই ছুহল বলিয়া উঠিল, "এ কেমন কথা"। আমরা মুহম্মদকে রসূল বলে মেনে নিলে আর এত ঝগড়াফ্যাসাদ কিসের? কাজেই ও শব্দ কয়টি কেটে দিতে হবে।" আলী (রা.) ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "অসম্ভব, আমার হাত দিয়ে ওকথা কাটা হবে না।" হযরত (স.) হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, তুমি না পার আমাকে স্থানটা দেখিয়ে দাও, আমি মুছে দেই।" আলী (রা.) দেখাইয়া দিলেন, হযরত (স.) শব্দ কয়টি মুছিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এখানেই বাদ-প্রতিবাদের শেষ হইল না। আবু জন্দল নামে একজন মক্কাবাসী কিছুদিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অপরাধে তাঁহার প্রতিবেশী তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া এক অন্ধকার ঘরে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। তারপর তাঁহার গায় তাহারা লোহা পোড়াইয়া দাগ দিয়াছিল। কিন্তু তথাপি আবু জন্দল ইসলাম ত্যাগ করেন নাই।

মুসলমানেরা মক্কার নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এ সংবাদে তাঁহার হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হওয়ায় তিনি কারাগার হইতে পালাইয়া কোন রকমে হামাগুড়ি দিতে দিতে অতি কষ্টে মুসলমানদের তাঁবুতে ঠিক এই সময়ে আসিয়া পৌঁছিলেন, এবং হৃদয়বিদারী ভাষায় মুসলমানদের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। তাহার দেহময় তখনও সদ্য পোড়া ঘায়ের চিহ্ন।

ছুহল বলিল, "সন্ধির শর্ত মোতাবেক এ লোকটিকে মক্কায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।" মুসলমানদের মধ্য হইতে একজন উত্তর করিল, "কিন্তু সন্ধিপত্রে ত এখনো যথারীতি দস্তখত হয় নাই; কাজেই, আমরা আবূ জন্দলকে ফিরিয়ে দিতে সঙ্গতভাবেই অস্বীকার করতে পারি।" ছুহল বলিল, "সন্ধিপত্র দস্তখত শেষ না হলেও সন্ধিশর্তের আলোচনা ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে; কাজেই, আবূ জন্দলকে ফেরত দিতেই হবে, নইলে সন্ধির প্রস্তাব এখনই অগ্রাহ্য হয়ে যাবে।"

রসূলুল্লাহ্ (স.) ছুহলকে বলিলেন, "বেশ, তাই হবে। আবূ জন্দল, ফিরে যাও, ভাই, সবর কর, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমার জন্য একটা পথ করে দিবেন।"

করুণ ক্রন্দনে আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া আবূ জন্দল ফিরিয়া গেলেন। চৌদ্দ শত মুসলমান হাজির—সবাই সুস্থ দেহী, সবাই শক্তিমান, সবাই যুদ্ধে পারদর্শী, ইসলামের জন্য জান দিতে সবাই উৎসুক, মুসলমান ভাইয়ের জন্য আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে প্রস্তুত। তাহাদেরই চোখের সামনে এই শোচনীয় দৃশ্যের অভিনয় হইয়া গেল, আর তাঁহারা কাঠের পুতুলের মত অক্ষমভাবে নীরবে তাহাই নিরীক্ষণ করিলেন।

কিন্তু উমর (রা.) সহিতে পারিলেন না। তিনি হযরত (স.)-এর কাছে গেলেন এবং রাগে দুঃখে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "হে পয়গম্বর, আপনি কি সত্যই আল্লাহ্‌র প্রেরিত নন?"

"নিশ্চয় আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত।"

"আমরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত, ওরা অসত্যে নিমগ্ন, একথা কি সত্য?"

"নিশ্চয় সত্য।"

"তবে আপনি এ অপমানজনক সন্ধিতে রাজী হন কেন?"

"নিশ্চয় তার কারণ আছে।"

"আপনি আমাদেরকে শুধু অনুমতি দিন, আমরা তলোয়ার হাতে নিয়ে এর একটা মীমাংসা করে নেই।"

"কিন্তু উমর, আমি যে শান্তির দূত। ধৈর্য ধারণ কর, দেখবে, নিশ্চয় আল্লাহ্ এই বিপদের মধ্যে কোন বিপুল সম্পদ লুকিয়ে রেখেছেন।"

হযরত উমর (রা.) নীরব হইলেন। মহানবী (স.) সন্ধিপত্রে তাঁহার নামের মোহর অঙ্কিত করিয়া উহা ছুহলের হাতে দিয়া দিলেন।

—ইবনে হিসাম

ঝাণ্ডা মেরা উঁচা রহে

মুছ্'আব ইবনে উমায়র—ধনী ঘরের সন্তান। সে আমলে মক্কা ও তাহার আশেপাশে মুছ্'আবের মত শৌখীন বিলাসী যুবক আর একটিও ছিল না। সেই মুছ্'আব একদা সহসা ইসলাম গ্রহণ করিলেন। কথা তাহার মাতাপিতার কানে গেল। তাহারা তাঁহার হাত-পা বাঁধিয়া তাঁহাকে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

কিছুদিন পরে মুছ্'আব (রা.) কারাগার হইতে পলায়ন করিলেন। তখন অত্যাচারের জ্বালায় নও-মুসলিমদের মক্কায় তিষ্ঠিয়া থাকা কঠিন ছিল। আবিসিনিয়ায় গিয়া আশ্রয় লইতে মহানবী (স.) কয়েকজনকে অনুমতি দিলেন। মুছ্'আব (রা.) তাঁহাদের অন্যতম।

সময় মত তাঁহারা মদীনায় ফিরিয়া আসিলেন, সেখানে নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে মুছ্'আব (রা.)-এর দিন কাটিতে লাগিল।

একদা মুছ্'আব রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সামনে দিয়া যাইতেছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (স.) দেখিলেন তাঁহার গায়ে একটি শতছিন্ন বসন, তাহাও হাঁটুর নীচে নামিতে নারাজ—এত ছোট। তাঁহার চোখের কোণ ভিজিয়া উঠিল।

ওহুদের লড়াইয়ে মুছ্'আব (রা.)-এর হাতেই দিলেন মহানবী (স.) নবরাষ্ট্রের ঝাণ্ডা। মুছ্'আব (রা.) সে ঝাণ্ডার ইজ্জত রক্ষার জন্য জান পণ করিয়া দাঁড়াইলেন।

একজন দুশমন আসিয়া মুছ্'আব (রা.)-এর উপর অস্ত্রাঘাত করিল; মুছ্'আব (রা.)-এর দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তিনি ত্বরিতে হাত বদলাইয়া বাম হস্তে ঝাণ্ডা ধারণ করিলেন। আর একজন শত্রুর আঘাতে তাঁহার বাঁ হাতটিও কাটা পড়িল।

মুছ্'আব (রা.) তখন কাটা হাতদ্বয়ের বাকী অংশ দিয়া পতাকার বাঁট বুকে চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন, ''ঝাণ্ডা মেরা উঁচা রহে।''

আর একজন শত্রু তীর মারিয়া মুছ্'আব (রা.)-এর বুক ফুঁড়িয়া দিল। তিনি ময়দানে পড়িয়া গেলেন, কিন্তু তখনও তাহার দীর্ণ বুকের উপর দাঁড়াইয়া ইসলামের হেলালী ঝাণ্ডা।

—জাকারীয়া

মস্তক কাটিয়া দেয় বীরেরা নজর

১৭৩৯ সাল। কর্নালের যুদ্ধে নাদির শা'র দুর্ধর্ষ বাহিনীর সম্মুখে মোগল সম্রাট মুহম্মদ শা'র সৈন্যদল মস্তক নত করিল।

সেই কর্নালের যুদ্ধের আগের দিন। ফরোক্কাবাদের নবাব মুহম্মদ খাঁর উপর মুহম্মদ শাহ্ তাঁহার হেরেম রক্ষার ভার দিলেন। যুদ্ধের নামে মুহম্মদ খাঁ পাগল; কাজেই, হেরেম রক্ষার ভার লইয়া দিল্লীতে নীরবে বসিয়া থাকিতে মুহম্মদ খাঁ প্রথমে ঘোরতর আপত্তি করিলেন। বাদশাহ্‌র আগ্রহাতিশয্যে অবশেষে তিনি রাজী হইলেন—নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে।

কর্নালের ময়দানে ইরান-বীরের ভীম আঘাতে ভারতের ভাগ্য ভাঙিয়া পড়িল। অভিমান-বিক্ষুব্ধ মুহম্মদ খাঁ বাদশাঘাটে চলিয়া গেলেন।

নাদির শাহ্ মুহম্মদ খাঁর শৌর্যবীর্যের কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি মুহম্মদ খাঁকে দেখিতে চাহিলেন। মুহম্মদ শাহ্ মুহম্মদ খাঁকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মুহম্মদ খাঁ আসিতে অস্বীকার করিয়া সংবাদ দিলেন। আবার বাদশাহ্‌র নিকট হইতে লোক গেল; আবার তাহারা নিষ্ফল ভাবে ফিরিয়া আসিল। এইবার মোগল বাদশাহ্‌র পক্ষ হইতে একজন ও নাদির শা'র পক্ষ হইতে একজন, এই দুইজন দূত গিয়া হাজির হইল।

মুহম্মদ খাঁ নাদির শা'র দরবারে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি লোহার জেরা পরিধান করিলেন, সুদৃঢ় বর্মে তাঁহার পৃষ্ঠ ও বক্ষদেশ সুরক্ষিত হইল, তাঁহার মাথায় লোহার টুপি, কোমরে ছুরিকা, হাতে তলোয়ার—এই বেশে যাত্রা করিলেন। বন্ধুগণকে বলিলেন, "আমার জন্য একটা কবর প্রস্তুত রেখো, আমি জীবিত নাও ফিরতে পারি।"

নাদির শাহ্ ও মুহম্মদ শাহ্ দরবারে আসীন; এমন সময় দৌবারিক সংবাদ দিল, মুহম্মদ খাঁ হাজির, কিন্তু সে হাতহাতিয়ার খুলে রেখে আসতে নারাজ। বলে, "আমি তো আর আমীর নই, আমি যোদ্ধা, আর যোদ্ধার হাতিয়ারই হলো তার হীরার মালা।" নাদির শাহ্ বলিলেন। "বেশ, তাকে সশস্ত্রই আসতে দাও।"

মুহম্মদ খাঁ দরবারে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রথমে তাঁহার প্রভু মুহম্মদ শা'কে অভিবাদন করিলেন; তারপর কোমর হইতে ছুরিকা খুলিয়া নাদির শা'কে নজর দিলেন। নাদির শাহ্ ছুরিকাটি ছুঁইয়া ফেরত দিলেন। তখন মুহম্মদ খাঁ যাইয়া মোগল সম্রাটের ডান পাশে দাঁড়াইলেন।

নাদির শাহ্ মুহম্মদ শা'র দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ভাই, আপনার মাত্র তিনজন বিশ্বাসী কর্মচারী আছে, তাদের মধ্যে একজন এই খাঁ; এরা ছাড়া আর সবাই আমাকে দাওয়াত করে পত্র লিখেছিল।" মুহম্মদ খাঁ কিছু বলিতে অনুমতি চাহিলেন। অনুমতি পাইয়া বলিলেন, "না, শাহানশাহ্, আমিই সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক; তাই যদি না হতাম, তবে আজ আপনি এতদূর আসতে পারতেন না। আমার পরম দুর্ভাগ্য, আমার প্রভু আমাকে সৈন্যদলের পুরোভাগে যেতে দেন নাই।" নাদির শাহ্ শুনিয়া চুপ রহিলেন।

বিদায়ের আগে নাদির শাহ্ মুহম্মদ খাঁকে মূল্যবান খেলাত দিলেন। মুহম্মদ খাঁ সালাম করিয়া বিদায় লইলেন। নাদির শা'র উজীর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বোধ হয় ভুলক্রমে আপনি নাদির শা'কে কোন নজর দেন নাই।" মুহম্মদ খাঁ বলিলেন, "আমরা যোদ্ধা, আমরা টাকা-পয়সার নজর দিই না। ও কাজের ভার আমরা আমীর রইসদের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। আমি সৈনিক: যখন দরকার হবে আমার এই মস্তক কেটে নজর দেব।"

—ইরফান

নূতন সপাই

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে—সে আজ অনেক বৎসর আগেকার কথা, কিন্তু এখনও সেই দিনের বীরত্ব-কাহিনী বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া যায় নাই। মজলিসে মজলিসে আজিও সে মহা আহবের কথা আলোচনা হয়; আজিও সে আমলের সিপাইরা তলোয়ার ঘুরাইয়া, লাঠি ভাঁজিয়া দেখায়, কিভাবে তাহারা যুদ্ধজয় করিয়াছিল; তরুণ দর্শকেরা অবাক হইয়া সে কথা শুনে। বিস্ময়ভরা 'বাহবা' দিয়া তাহাদিগকে অভিনন্দন জানায়।

দিল্লীর উপকণ্ঠে একটি মহল্লা—সেই মহল্লায় একখানি ছোট্ট বাড়ী—সেই বাড়ীর একটি কামরায় বসিয়া সেকালের কয়েকজন সিপাই পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কথা আলাপ করিতেছিল।

একজন বলিতেছিল, "বাপরে বাপ! সে কথা মনে হলে এখনো গা শিউরে উঠে। পাহাড়ের মত মারাঠা যোয়ান—তার হাঁকে ময়দান কাঁপে—এল আমার সামনে—আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে দুই চোখ বুঁজে জোরে দিলাম এক কোপ—জানইতো আমার সেই হায়দরী তলোয়ার—তাঁর এক কোপেই বাবাজী সাবাড়।"

আর একজন সিপাই হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "আরে মারাঠা সিপাইত তুমিও দু'দশটা মেরেছ, আমিও দশ-বিশটা মেরেছি; কিন্তু মারাঠা সেনাপতি দেখেছ? সেগুলি এক একজন এক একটা কামান—যেখান দিয়ে চলে, তাদের হাতের তলোয়ারে কেবল বিজলী চমকায়, আর সামনের শত্রুর মাথাগুলি হঠাৎ কাঁধ হতে লাফিয়ে লাফিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এমনি একটা ভীষণ সেনাপতি ছিল সদাশিব রাও—যেদিকে যায়, সমস্ত কাবার। সকলেরই 'পালাই-পালাই' ভাব। আমি দেখলাম, অবস্থা তো সঙ্গীন; তখন দূর হতে কষে মেরে দিলাম এক তীর; সোঁ করে তীর গিয়ে বিঁধল তার ডান কানের পাশে—ঘোড়া হতে পড়ি-পড়ি করে সেনাপতি কোনও মতে সামলে নিলে, কিন্তু ময়দানে আর রইল না; তখ্‌খনি শিবিরে চলে গেল।"

তৃতীয় সিপাই মুখটাকে বিকৃত করিয়া কহিল, "আরে ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা! তেলাপোকাও পাখি আর মারাঠারাও সিপাই। ওদের দু-দশটাকে মেরে আবার গল্প শুরু করেছ। তওবা! তওবা! তওবা! আরে দুনিয়ার আসল লড়নে-ওয়ালা যদি কেউ থাকে তবে সে তুর্কী সিপাই—এক একজন এক একটা জ্বলন্ত ধূমকেতু—তাদের চোখের ইশারায় আগুন, তাদের মুখের কথায় আগুন, তাদের হাতের বন্দুকে আগুন, কেবল বন্দুকের ঘোড়া উঠানো আর নামানো—অমনি ধমাধ্‌ধম আওয়াজ—অমনি শত্রুর লাশ মাটিতে গড়াগড়ি; একদম তেলেসমাত! কোথা থেকে একটা তুর্কী ওরা ভাড়া করে এনেছিল, খোদা মালুম, দেখি যে সে-ব্যাটা একাই কেল্লা ফতে করে যায় আর কি! এখন উপায়? বন্দুকের গুলী, তীরন্দাজের তীর—এ সমস্ত তার গায় লেগে ফিরে আসে—সমস্ত শরীর লোহার পোশাকে ঢাকা কিনা! অবশেষে 'আলী' 'আলী' বলে ছাড়লাম আমার সেই ভীম বর্শা—লোহার জাল ছিঁড়ে তার বুক পার হয়ে গেল। যুদ্ধে জিতে গেলাম।"

সিপাইদের একজন খানসামা তামাক সাজিতেছিল, সে হাতের চিলিমটা নামাইয়া রাখিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, "হুজুর, আমিও কিন্তু সে লড়াইয়ে গিয়াছিলাম।"

"বটে! বটে!! তারপর?"

"তারপর আমার সামনে এল একটা পর্বতের মত যোয়ান।"

"বাঃ—বাঃ! তারপর?"

"তারপর কোমর না আচ্ছা করে বেঁধে—বুঝলেন কিনা, তলোয়ার না খুলে, বুঝলেন কিনা—চোখ না বুঁজে—বুঝলেন কিনা—ঝেড়ে মারলাম এক কোপ।"

"বেশ—বেশ। তারপর?"

"তারপর আর কি? এক কোপেই ব্যাটার ঠ্যাং কেটে দুইখানা হয়ে গেল।"

"আরে—সিপাইরা কি শত্রুর ঠ্যাং কাটে? তারা যে শত্রুর মাথা কাটে!"

(অভিযোগের সুরে) "তার মাথা যে আগেই আর কেউ কেটে নিয়েছিল; তা আমি কি করব?"

উৎসবের দিনে

আজ ঈদ। মদীনার ঘরে ঘরে আনন্দ উল্লাস, মাঠে মাঠে আনন্দ কোলাহল। নানা বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া আতর-গোলাবের গন্ধ হাওয়ায় ছড়াইতে ছড়াইতে দলে দলে লোক ঈদের মাঠে যাত্রা করিয়াছে; বালকেরাও তেমনই সজ্জিতভাবে আনন্দ-কলরোলে পথ মুখরিত করিয়া পশ্চাতে ছুটিয়াছে।

নামায হইয়া গেল। বালকেরা দল বাঁধিয়া পরম উল্লাসে নানা ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত হইল। মহানবী (স.) বাড়ী ফিরিতেছিলেন; দেখিলেন, জীর্ণ মলিন বসন-পরিহিত একটি শীর্ণকায় বালক মাঠের এক প্রান্তে বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতেছে।

হযরত (স.) ধীরে বালকের নিকট গিয়া তাহার হাত ধরিয়া কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদছ কেন বাছা?" বালক সরোষে হযরত(স.)-এর হাত ঝাড়িয়া

ফেলিয়া দিয়া বলিল, "হাত ছাড়।" মহানবী (স.) তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আবার বলিলেন, "বল না, বাবা, শুনি তোমার কি হয়েছে?" বালক হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিতে লাগিল, "হযরত মুহম্মদ (স.)-এর ফৌজের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আমার বাবা মারা গিয়েছেন, মায়ের অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেছে।, বিষয়-আশয় অন্য লোকে কেড়ে নিয়েছে। মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম, বৈ-পিতা তাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যেরা আজ কত সুন্দর কাপড় পরে আনন্দে লাফালাফি করছে; আর আমার না আছে থাকবার জায়গা, না আছে কাপড়, না আছে পেটে ভাত।"

মহানবী (স.)-এর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "বাঃ, তাতে কি? আমার মাতাপিতাও তো আমার বাল্যকালেই মারা গিয়েছেন।"

এইবার বালক মুখ তুলিয়া হযরত (স.)-এর মুখের দিকে তাকাইল ও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া বড় অপ্রস্তুত হইল।

হযরত (স.) স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা, যদি আমি তোমার পিতা হই, আয়েশা তোমার মাতা হন, আর ফাতেমা তোমার বোন হয়, তবে তুমি সুখী হবে?" বালক মাথা নাড়িয়া জানাইলে, সে খুশী হইবে।

মহানবী (স.) বালকের হাত ধরিয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া গেলেন এবং বিবি আয়েশা (রা.)-কে ডাকিয়া বলিলেন, "'এই লও, তোমার জন্য একটি ছেলে এনেছি।"

আয়েশা (রা.) নিজ হাতে বালককে গোসল করাইয়া পরম পরিতোষের সঙ্গে খাওয়াইলেন এবং সুন্দর পোশাক পরাইয়া বলিলেন, "যাও, এখন আর আর বালকদের সঙ্গে একবার খেলে এস।" বালক লাফাইতে লাফাইতে গিয়া খেলায় যোগ দিল। তাহার নূতন বেশভূষা দেখিয়া আর আর বালকেরা, তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। বালক সব কথা বর্ণনা করিল।

হযরত (স.)-এর জীবনকাল পর্যন্ত এই বালক তাঁহার পরিবারভুক্ত ছিল। তাঁহার মহাপ্রয়াণের দিন এই বালক রাস্তায় বাহির হইয়া বিলাপ ও আর্তনাদ করিতে লাগিল। তখন আবুবকর (রা.) তাহার হাত ধরিয়া নিজ গৃহে লইয়া গিয়া তাহাকে নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন।

—হীরকহার

ভাইয়ের অংশ

খাওয়ারিজ্‌মের অধিপতি সুলতান তাকীশের নিকট এক ব্যক্তি পত্র লিখিয়া জানাইল: "আমি আপনার ভাই; কাজেই আপনার শরীক। আপনার রাজ-কোষ হইতে আমার প্রাপ্য অংশ দিন।"

সুলতান খাজাঞ্চীকে আদেশ দিলেন: "লোকটিকে দশটি মোহর দিয়ে দাও।"

মোহর দশটি লোকটির হাতে পেঁছিলে সে আবার লিখিল, "আমি আপনার ভাই; আর ঐ ভরা রাজকোষ হতে আমার ভাগে পড়ল মাত্র দশটি মোহর?"

সুলতান উত্তরে লিখিলেন, "আর বেশী গোল করিও না, ভাই, কারণ, আমার সব ভাইয়েরা আসিয়া যদি তাহাদের শরিকী হিস্যা দাবী করে, তবে তোমার ভাগে ইহার চেয়ে কম পড়িবে।"

—তাবাকাতে নাসিরী

চন্দ্রগুপ্তের মহাপ্রয়াণ

॥ এক ॥

(মগধ সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের দরবার)

১ম চারণ—সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর—

২য় চারণ—অমিততেজা পরাক্রান্ত সম্রাট—

৩য় চারণ—মহামতি চন্দ্রগুপ্ত কি—

সকলে সমস্বরে—জয়।

(সম্রাট ও মন্ত্রীর প্রবেশ—চারণদের নিষ্ক্রমণ)

সম্রাট—সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর! মন্ত্রী, আমি সত্যি অত বড় হয়েছি?

মন্ত্রী—সম্রাট তার চেয়েও বড় হয়েছেন।

সম্রাট—সে কেমন?

মন্ত্রী—শুধু পৃথিবীর মানুষেরা নয়, সম্রাট, জঙ্গলের বাঘ-ভালুক, জলের হাঙ্গর-কুমীর, পাতালের যক্ষ-রক্ষ—সবাই সম্রাটকে মেনে চলে।

সম্রাট—বটে!

মন্ত্রী—সত্য।

সেনাপতি—(প্রবেশান্তে) জয়, সম্রাটের জয়!

সম্রাট—কি সংবাদ, সেনাপতি?

সেনাপতি—সংবাদ শুভ; আমাদের সৈন্যগণ সর্বত্র জয়লাভ করেছে।

মন্ত্রী—পূর্বে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে, উর্ধ্বে-অধে: কেবল সম্রাটের জয়ধ্বনি।

সম্রাট—তবে আপাততঃ কি কর্তব্য, সেনাপতি?

সেনাপতি—আবার নতুন অভিযানের জন্য তৈয়ার হতে হয়।

মন্ত্রী—ঠিক, ঠিক, নব নব বিজয়ের বিদ্যুৎ-প্রভায় সম্রাটের শত্রুদের চোখ ঝলসে যাক।

(বাইরে কোলাহল)

সম্রাট—এ কি! ও কিসের শব্দ, মন্ত্রী?

মন্ত্রী—তাই তো! (জানালায় দাঁড়িয়ে) এক উন্মত্ত জনতা প্রাসাদের দিকে আসছে।

সম্রাট—ওরা বলছে কি?

সেনাপতি—ওরা বল্‌ছে, ভাত চাই—ভাত চাই—ভাত চাই।

সম্রাট—তার মানে?

মন্ত্রী—নগরে ও পল্লীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে—মানুষ না খেয়ে মরছে!

সম্রাট—মানুষ না খেয়ে মরছে? আপনিও তা জানেন, সেনাপতি?

সেনাপতি—জানি, সম্রাট!

সম্রাট—আমার সাম্রাজ্যে মানুষ না খেয়ে মরছে আর আপনি আমাকে পরামর্শ দিচ্ছেন, নতুন রাজ্য জয়ের জন্য?

সেনাপতি—সম্রাট, ওরা বাজে লোক—ওরা জনসাধারণ—ওদের না খেয়ে মরবার অভ্যাস আছে।

মন্ত্রী—আর এই রকম সঙ্কট থেকে বাঁচবার একটি পথ হচ্ছে যুদ্ধ।

সম্রাট—তার মানে?

মন্ত্রী—শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, অতএব এ সময় সব চুপ, নইলে গর্দান যাবে—এই বলে এই বাজে লোকগুলার চেঁচামেচি বন্ধ করা যায়।

সম্রাট—কিন্তু লড়াইয়ের পর যে ওরা ফের চেঁচাবে?

সেনাপতি—লড়ায়ের পর ওরা আর চেঁচাবে না, সম্রাট।

সম্রাট—কেন? তখন তাদের আর ক্ষিদে থাকবে না? ওরা দেবতা হয়ে যাবে?

মন্ত্রী—না, ওদের ক্ষিদে থাকবে না, সম্রাট; ওরা দেবতা না হোক, অন্ততঃ ভূত হয়ে যাবে।

সম্রাট—অর্থাৎ?

মন্ত্রী—অর্থাৎ কতক মরবে যুদ্ধে গিয়ে, কতক মরবে বাড়ীতে শুয়ে।

সম্রাট—তবে বাঁচবে কারা, মন্ত্রী?

মন্ত্রী—বাঁচবে তারা, বাঁচবার অধিকার যাদের আছে।

সম্রাট—অর্থাৎ?

মন্ত্রী—ধন, সম্পদ, ক্ষমতার মালিক যারা সেই ভদ্রশ্রেণী বাঁচবে।

সম্রাট—কিন্তু সে তো হয় না, মন্ত্রী; সে তো কখ্খনো চল্‌তে পারে না, সেনাপতি।

সেনাপতি—কি চলতে পারে না, সম্রাট?

সম্রাট—আমার রাজ্যে কেবল বড়রা বাঁচবে আর ছোটরা না খেয়ে মরবে, এ চল্‌তে পারে না।

মন্ত্রী—কিন্তু চিরকাল তো এই-ই চলে এসেছে, সম্রাট।

সম্রাট—(স্বগতঃ) চিরকাল! চিরকাল! চিরকাল! এদের মুখে কেবলি, 'চিরকাল'। (মন্ত্রীকে) কিন্তু মন্ত্রী, বলুন তো, চিরকাল কি সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত জন্মায়?

মন্ত্রী—না, সম্রাট; চন্দ্রগুপ্ত হাজার বছরেও একটি জন্মায় না।

সম্রাট—আপনি কি বলেন, সেনাপতি, বিজয়ী সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব কি যখন তখন হয়?

সেনাপতি—না, সম্রাট; ইতিহাস খুঁজলে চন্দ্রগুপ্ত খুব বেশী পাওয়া যায় না।

সম্রাট—তাহলে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত চিরন্তনের বাইরে একটি জীব?

সেনাপতি—তাই সম্রাট।

মন্ত্রী—সত্যি তাই।

সম্রাট—আমিও স্বীকার করি, বন্ধুগণ, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত চিরন্তনের বাইরেই একটি জীব; আর সেই জন্যই তার রাজ্যের আইনও হবে চিরাচরিতের বাইরে।

সেনাপতি—বুঝতে পারলাম না, সম্রাট।

সম্রাট—অর্থাৎ চিরকাল বড়রা বেঁচেছে, ছোটরা মরেছে; কিন্তু সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে ছোটরাই বাঁচবে, তারপর যদি সম্ভব হয়, তবে বড়রাও বাঁচবে।

মন্ত্রী—সম্রাটের জয় হোক। কিন্তু—

সম্রাট—আবার 'কিন্তু' কি, মন্ত্রী?

মন্ত্রী—যদি অভয় দেন, তবে নিবেদন করি।

সম্রাট—আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ, বলে যান।

মন্ত্রী—সম্রাট, যদি এই নিয়মই বলবৎ করেন, তবে দেশের সর্বত্র রাজত্ব হবে ছোট জাতের।

সম্রাট—সে তো মন্দ হবে না, মন্ত্রী। আমি তো ঐ ছোটদেরই সম্রাট, ওরাই তো লক্ষ কোটি মুখে আমার জয়গান গায়, ওরাইতো অগণ্য বাহুর শক্তিতে আমার রাজ্য রক্ষা করে।

মন্ত্রী—কিন্তু—

সম্রাট—আর 'কিন্তু' নয়, মন্ত্রী; ভেবে দেখুন, স্বয়ং ভগবান সবার আগে ছোট-দেরই ভগবান; ওদেরই জন্য ব্যাকুল হয়ে তিনি বার বার মানুষের মধ্যে নেমে এসেছেন।

মন্ত্রী—কিন্তু তাহলে এই অকালের সময় যে দেশের অভিজাত শ্রেণী মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, সম্রাট!

সম্রাট—আমার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র প্রজাকে বাঁচাতে গিয়ে যদি মুষ্টিমেয় বড়কে মরতে হয়, তবে তারা মরবে বইকি?

মন্ত্রী—কিন্তু—সম্রাট—কিন্তু—

সম্রাট—বলে যান।

মন্ত্রী—কিন্তু স্বয়ং সম্রাটও যে সেই বড়র দলে পড়ে যান!

সম্রাট—হোঃ হোঃ হোঃ! হাতী চুরি করে গা ঢাকা দিয়ে চলা যায় না, সে আমি জানি, মন্ত্রী।

সেনাপতি—তা জানেন, সম্রাট, আপনি সত্যি তা জানেন।

সম্রাট—বেশ, এই তো হয়ে গেল। মরতে হয়, আমি, আপনি, মন্ত্রী—আমরা সবাই আগে মরব, তারপর মরবে গরীবেরা।

সেনাপতি—তবে এক্ষণে কর্তব্য?

সম্রাট—যে সৈন্যদল নিয়ে পররাজ্য জয় করতে চেয়েছিলেন, তাদেরে নিযুক্ত করুন দুর্ভিক্ষ নিবারণের কাজে—ধনীর ঘরের সঞ্চিত খাদ্য বার করে আনুন, বিতরণ করুন তা গরীবদের মধ্যে।

মন্ত্রী—আর এ দাসের উপর কি হুকুম, সম্রাট?

সম্রাট—আপনি তো বলেছিলেন, বাঘ-ভালুক, হাঙ্গর-কুমীর, যক্ষ-রক্ষ এরা সবাই আমার কথা মানে!

মন্ত্রী—তাই, সম্রাট!

সম্রাট—বেশ, দুর্ভিক্ষ নিবারণের কাজে তাদেরে নিযুক্ত করার ভার রইল আপনার উপর।---আর শুনুন মন্ত্রী, শুনুন সেনাপতি, আমি মরবার আগে আমার কোন প্রজা যদি না খেয়ে মরে, তবে আমার কর্মচারীদের কারো ঘাড়ে আমি মাথা রাখব না, এ কথা সবাইকে জানিয়ে দিন।

॥ দুই ॥

(মগধের রাজপথ—জীর্ণ পরিচ্ছদে চন্দ্রগুপ্ত ও ধর্মগুরু ভদ্রবাহু)

জনগণ—জয়, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের জয়। জয়, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের জয়।

চন্দ্রগুপ্ত—আর তো আমি তোমাদের সম্রাট নই, বন্ধুগণ; তোমাদের সম্রাট বিন্দুসার।

জনগণ পক্ষে—কিন্তু কেন কুমারকে সিংহাসন ছেড়ে দিলেন, সম্রাট? আপনার তো আরো দিন ছিল?

চন্দ্রগুপ্ত—না বন্ধুগণ, আমার আর দিন নাই। মনের বলে, অস্ত্রের বলে, বুদ্ধির বলে এ জগতে চন্দ্রগুপ্ত অজেয়, এই ভেবে এতদিন বড় অহঙ্কার ছিল—এই বুড়ো বয়সে পরাজয় মানতে হল।

জনগণ পক্ষে—আমরা বেঁচে থাকতে আমাদের সম্রাটকে পরাজয় মানাতে পারে, বিশ্বভুবনে এমন কে আছে, সম্রাট?

চন্দ্রগুপ্ত—কেউ নাই, বন্ধুগণ; কিন্তু হেরে গেলাম অন্যভাবে; রাজার সবচেয়ে বড় কর্তব্য—প্রজাপালন; সে কর্তব্য আমি শেষ পর্যন্ত পালন করতে পারলাম না। আমার প্রজারা আজ অনেক উপবাসী, কাল হয় তো তারা না খেয়ে মরবে।

জনগণ পক্ষে—কিন্তু আপনাকে সামনে রেখে যে আমাদের মরলেও সুখ, সম্রাট। আপনি থাকুন—আমাদের মধ্যে থাকুন।

চন্দ্রগুপ্ত—তা হয় না, বন্ধুগণ। আমি সুদূরের পথিক, আর ঘরে ফিরতে পারি না।

জনগণ পক্ষে—কোথায় যাচ্ছেন?

সম্রাট—আপাততঃ মহীশূরে। শুনেছি, মহীশূর শস্যের ভাণ্ডার।

জনগণ পক্ষে—সাথী ?

চন্দ্রগুপ্ত—তোমাদের ধর্মগুরু ভদ্রবাহু। আরো অনেকে যাবে আমাদের সঙ্গে: সেইখানে এরা খেয়ে বাঁচবে; যারা রয়ে গেল, তাদের জন্য সেখান থেকে পাঠাব খাদ্য।

জনগণ—জয়, সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের জয়।

॥ তিন ॥

(মগধের রাজপথ)

সেনাপতি—মহীশূরের শেষ সংবাদ জান, মন্ত্রী ?

মন্ত্রী—না ভাই, জানি না। কি, বল তো ?

সেনাপতি—হাজার হাজার গাড়ীতে খাদ্যশস্য আসছে সে দেশ থেকে।

মন্ত্রী—গরীবেরা খেয়ে বাঁচবে ?

সেনাপতি—তাই।

মন্ত্রী—তাহলে এবারের মত আমরাও বেঁচে গেলাম।

সেনাপতি—নিশ্চয়।

মন্ত্রী—শতং জীবতু, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত শতং জীবতু।

সেনাপতি—কিন্তু সম্রাট চলে গেছেন, মন্ত্রী।

মন্ত্রী—চলে গেছেন ? কোথায় ?

সেনাপতি—যে দেশ থেকে কেউ কোনদিন ফিরে নাই, সেই দেশে।

মন্ত্রী—বুঝতে পাচ্ছি না, সেনাপতি, খুলে বল।

সেনাপতি—মহীশূর রাজ্য যথেষ্ট শস্য রফতানী করতে নারাজ ছিল, অথচ মগধ হতে সংবাদ গেল—প্রজারা না খেয়ে মরমর হয়েছে।

মন্ত্রী—তারপর ?

সেনাপতি—সম্রাট বললেন, তাহলে প্রজার আগে আমাকেই মরতে হবে।

মন্ত্রী—হাঁ-হাঁ—তারপর ?

সেনাপতি—তারপর সম্রাট স্বয়ং উপবাস শুরু করলেন।

মন্ত্রী—ওঃ! তারপর ? বল—বল—বল।

সেনাপতি—তারপর সেই ক্ষুধার জ্বালা পেটে নিয়েই তিনি মহাপ্রয়াণ করলেন।

মন্ত্রী—সেনাপতি, সেনাপতি, সত্যি সত্যি মহাপ্রাণ সম্রাট অমনি ভাবেই গেলেন ?

সেনাপতি—তাই। তারপর তাঁর জন্য মহীশূরের রাজ্যময় পড়ে গেল হাহাকার।

মন্ত্রী—সেতো পড়বেই, সেনাপতি, সেতো পড়বেই।

সেনাপতি—তারপর কাড়াকাড়ি শুরু হল, কে কত শস্য মগধে পাঠিয়ে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।

মন্ত্রী—ওঃ! মহামনা সম্রাট, সত্যিই তুমি নিজের মৃত্যুর পেয়ালায় জীবনের সুধা ঢেলে আমাদের জন্য পাঠিয়ে গেলে!

সেনাপতি—মন্ত্রী!

মন্ত্রী—কথা বলো না, সেনাপতি, নীরবে ধ্যানের চোখে চেয়ে দেখ সেই মহা-যাত্রীর পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে—দেখ মৌন ত্যাগের প্রশান্ত মহিমায় কি মহোজ্জ্বল! রাজর্ষি, তুমি চিরঞ্জীব হয়ে রইলে—তোমায় নমস্কার।

॥ গান ॥

মানুষের তরে প্রাণ দিয়ে গেলে সম্রাট সুমহান!
অমৃতের পথে নবজীবনের সে যে নব উত্থান॥

বহায়ে আনিলে জীবনের সুধা
নিবারিতে লাখো জঠরের ক্ষুধা
একপ্রাণ দিয়ে বাঁচাইলে তুমি কোটি মুমূর্ষু প্রাণ॥

মরণের ভয়ে লুকাওনি তুমি বিলাসের মোহ মাঝে
এড়িয়ে চলনি জীবনের ভার আপনার কোনো কাজে।

প্রজা হিত লাগি আপনারে ভুলি
মরণের সুধা নিয়েছ যে তুলি
মরতের রাজা—স্বরগে এবার চলে তব অভিযান॥

সালাহুদ্দীন ও জেরুজালেম

য়ুরোপের দরবারে দরবারে, শহরে বাজারে মধ্যযুগের পাদ্রীরা এতদিন ইসলামের বিরুদ্ধে যে ভয়াবহ অত্যাচারের অলীক কাহিনী প্রচার করিয়া বেড়াই-য়াছে, তাহারই ফলে সমস্ত য়ুরোপ ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিল এবং তাহার

বুক শূন্য করিয়া তাহাদের পবিত্র তীর্থস্থান জেরুজালেম রক্ষার জন্য অগণ্য সৈন্য বাহিনী পাঠাইল।

এদিকে ইসলামের ইজ্জত রক্ষার জন্য বীরবাহু সুলতান সালাহুদ্দীনও 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন।

যুদ্ধের পর যুদ্ধ চলিল। খৃস্টান মুসলমান উভয় পক্ষের সৈন্য দলের হৃদয়ের রক্তে লড়াইর ময়দান লালে লাল হইল; ঝটিকাতাড়িত উন্মত্ত সাগর-তরঙ্গের মত একে একে খৃস্টান-বাহিনী মুসলিম যোদ্ধাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল; কিন্তু সে নিষ্কম্প পাষাণ প্রাচীরের মূলে ক্রুদ্ধ লহরীর উল্লম্ফন মাত্র।

১১৮৭ খৃস্টাব্দ। সালাহুদ্দীন জেরুজালেম অবরোধ করিলেন। খৃস্টান যোদ্ধারা অসম সাহসে লড়াই করিল, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিল না। জেরুজালেম আত্মসমর্পণ করিল। সালাহুদ্দীন শর্ত দিলেন: অধিবাসীরা নিরাপদে ধন-সম্পত্তিসহ নগর ত্যাগ করিতে পারিবে, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেককে মুক্তি কর দিতে হইবে। এই মুক্তি কর দিয়া চলিয়া যাইবার মেয়াদ চল্লিশ দিন থাকিবে; চল্লিশ দিন পর যাহারা শহরে থাকিবে তাহারা গোলামে পরিণত হইবে।

তাহার পর নগর-ত্যাগ শুরু হইল। প্রথমে আসিলেন খৃস্টান সেনাপতি বেলীয়ান, সঙ্গে তাঁহার সাত হাজার নিঃস্ব বাসিন্দা—ইহারা সকলে ইংল্যাণ্ডের রাজার টাকায় মুক্তি ক্রয় করিল। দিনের পর দিন, কাতারে কাতারে নগরবাসীরা বাহির হইতে লাগিল। অনেক পরিবার তাহাদের চাকর-চাকরাণীর মুক্তি মূল্য দিয়া তাহাদিগকে খালাস করিয়া আনিল। অনেক ধনী খৃস্টান হাজার হাজার অসহায়কে উদ্ধার করিল।

প্রধান পাদ্রী গীর্জার বহু ধন-রত্নসহ প্রস্থান করিলেন। একথা সালাহুদ্দীনকে জানাইয়া কেহ কেহ তাঁহাকে আটকাইতে পরামর্শ দিল। তিনি বলিলেন, "না, আমি আমার করার ভঙ্গ করব না।"

চল্লিশ দিন চলিয়া গেল, কিন্তু তখনও নগরে হাজার হাজার অধিবাসী—নিঃস্ব, বৃদ্ধ, রুগ্ন। ধনী স্বধর্মীরা ইহাদিগকে চিরদাসত্বের হীনতায় ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সালাহুদ্দীনের ভাই আদিল আসিয়া সালাহুদ্দীনকে বলিলেন, "হযরত, এই নগর জয় করতে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করেছি; তারই বিনিময়ে আমি এক হাজার খৃস্টান গোলাম চাই।" সুলতান বলিলেন, "কিন্তু এত গোলাম দিয়ে কি করবে, আদিল?" আদিল কহিলেন, "আমার যা ইচ্ছা, তাই করব।"

সালাহুদ্দীন ভাইকে চিনিতেন; তিনি হাসিলেন—তৃপ্তির হাসি। তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করা হইল। আদিল এই এক হাজার গোলামকে তখনই আল্লাহ্‌র নামে আজাদ করিয়া দিলেন।

বেলীয়ান ও প্রধান পাদ্রী নিকটেই ছিলেন। তাঁহারাও আদিলের অনুরূপ প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহারাও প্রত্যেকে এক এক হাজার গোলামকে আজাদ করিয়া দিলেন।

তখন সুলতান তাঁহার সঙ্গীদিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ, এই মহানুভবেরা যা করলেন তা দেখে আমাকে কি তাদের পেছনে থাকতে বলেন? নকীব, এখনই শহরময় ঘোষণা করে দিক যে শহরে যত শিশু, রোগী ও বৃদ্ধ আছে তারা সবাই মুক্ত, সবাই বিনা পয়সায় চলে যেতে পারে।"

যে সব নাইট যোদ্ধারা যুদ্ধে নিহত বা বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের স্ত্রী-কন্যারা কাঁদিতে কাঁদিতে সুলতানের সম্মুখে আসিল। সুলতানের চোখ ভিজিয়া উঠিল; তিনি তখনই বন্দী নাইটগণকে মুক্তির আদেশ দিলেন এবং নিহত নাইটদের স্ত্রী-কন্যাগণকে নিজ ভাণ্ডার হইতে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিলেন।

১০৯৯ সালের সেই প্রথম ক্রুসেডে খৃস্টান যোদ্ধারা নিরপরাধ অসহায় মুসলমানগণকে যে চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে অকারণে হত্যা করিয়াছিল, মহান সুলতান এমনই ভাবে তাহার উদার প্রতিশোধ নিলেন।

—লেইনপুল

বিধবার রুটি

প্রথে হজ্জযাত্রীদের নেতা হিসাবে যাঁহারা মক্কা শরীফ যান, তাঁহাদিগকে আমীরুল হজ্জ বলা হয়। হযরত উসমান (রা.) স্বেচ্ছায় আমীরুল হজ্জ হিসাবে মদীনা হইতে মক্কায় যাইতেন। এক বৎসর মদীনায় গোলমাল দেখা দিল। কয়েক শত বিদ্রোহী আসিয়া রাজধানী অবরোধ করিয়া বসিল। সুতরাং হজ্জের মৌসুম যায়-যায় দেখিয়াও হযরত উসমান (রা.) মদীনা ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

অতএব আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে সে বৎসরের জন্য আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করিয়া খলীফা তাঁহাকে মদীনার হাজী-কাফেলার নেতৃত্বে পাঠাইলেন।

আবদুল্লাহ্ (রা.) মক্কার পথে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাড়াতাড়িতে তিনি যথেষ্ট খাদ্য সঙ্গে লইতে পারেন নাই ; ফলে পথে খাদ্য ফুরাইয়া গেল।

আবদুল্লাহ্ (রা.) কাফেলা থামাইয়া তাঁবু গাড়িয়া বসিলেন এবং নিকটস্থ পল্লী হইতে খাদ্য সংগ্রহের জন্য লোক পাঠাইলেন। আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর লোকেরা গাঁয়ে এক কুটিরে একটি বুড়ীকে দেখিতে পাইয়া তাহার কাছে গিয়া কথাবার্তা শুরু করিল।

'মা, আমাদের কাছে কিছু খাদ্য বেচতে পার? আমরা ভারি বিপদে পড়েছি। খাদ্য আমরা উপযুক্ত দাম দিয়েই নিব।'

'না, আমার কাছে দেবার মত অতিরিক্ত খাদ্য নাই। আমি আর আমার দুই ছেলে: পরিবারে আমরা এই তিনটিই প্রাণী: এই তিনজনের জন্য যতটুকু দরকার, কেবল তাহাই ঘরে আছে।'

'কিন্তু তোমার ছেলেরা কোথায় বুড়িমা?'

'তারা কাঠ কাটতে জঙ্গলে গিয়েছে।'

'আচ্ছা, তোমার ছেলেদের জন্য কি রান্না করেছ?'

'মাত্র একটা বড় রুটি।'

'এই রুটি ছাড়া খাবার আর কিছু নাই?'

'কিছু নাই।'

'বেশ, ঐ রুটির অর্ধেকটা আমাকে দাও—আমি অনেক পুরস্কার দিব।'

'আচ্ছা, তুমি আমাকে এত বখীল ও হীন মনে কর কেন? আমি তোমাকে একটা রুটির অর্ধেক কখনো দিতে পারি না। তোমার যদি অতই ঠেকা থাকে, বেশ, সমস্ত রুটিখানাই নিয়ে যাও।

* * * *

আবদুল্লাহ্—তোমরা ত দেখছি এক অদ্ভুত মহিলার দর্শন পেয়েছিলে। তাঁকে দেখবার আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হচ্ছে। যাও, তাঁকে এখানে দাওয়াত করে নিয়ে এস।

* * * *

'বুড়িমা, তোমাকে দাওয়াত।'

'কোথায়?'

'আমাদের তাঁবুতে।'

'কারণ ?'

'আমাদের মনিব মস্তবড় মানুষ, তিনি তোমাকে দেখতে চান।'

'কিন্তু আমার মত একজন গরীব বেদুঈন বুড়ীর সঙ্গে তোমাদের মনিব কেন দেখা করতে চায় ?'

'আর কিছুই নয়, মা, শুধু তোমাকে দেখে ভক্তি করা।'

'আমার ভক্তির দরকার নাই, বাপু ; আমি যেতে পারব না।'

'কিন্তু যেতে যে তোমাকে হবেই, মা।'

'কেন যেতেই হবে ?'

'তোমাকে নিতে না পারলে কি আমাদের মুখ থাকবে ? হয়তো গর্দান যেতে পারে।'

'বটে ! আচ্ছা, তবে চল।'

* * * *

আবদুল্লাহ্—(উঠিয়া অগ্রসর হইয়া) 'এস, বুড়িমা, এস। আস্সালামু আলাইকুম।'

বুড়ী—'ওয়া আলাইকুম আস্সালাম।'

'তুমি কোন্ কওমের, মা ?'

'আমি বনি কল্‌ব কওমের অন্তর্গত।'

'কেমন আজকাল তোমার চলছে ?'

'ভালই চলছে। আমার নিজের রুটি নিজেই তৈয়ার করে গরম ছাইয়ের উপর সেকে নেই।'

'তারপর ?'

'আমরা জঙ্গলের ঝর্ণার পানি খাই।'

'আর ?'

'আর কিছু না : আমরা ভাবনা-চিন্তাকে আমাদের বাড়ীর কাছে ঘেঁষতেই দেই না। আল্লাহ্ বেশ শান্তিতে রেখেছেন।'

'তোমার রুটিটা দিয়ে আমার মহা উপকার করেছ।'

'ও কথা না হয় না-ই বল্লে : আমার নিজের প্রশংসা শুনতে ত আর তোমার কাছে আসি নাই।'

'কিন্তু সবটুকু রুটি আমাকে দিয়ে দিলে, তোমার ছেলেদেরকে কি খাওয়াবে ?

'আবার সেই একই কথা ! রুটি সম্বন্ধে এই সব আবোলতাবল বকে তুমি সত্যি আমাকে শরম দিচ্ছ।'

'কেন, বল তো মা ?'

'আচ্ছা—তুমি-না মস্ত সর্দার, তা কোন একটা বড় বিষয়ে আলাপ করতে পার না ? কেবল রুটি—রুটি—রুটি, আমি শুনে শুনে একদম হয়রান।'

'তা কি করব, মা ?

'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এ বিষয় ছেড়ে এখন অন্য বিষয়ে কথা কও।'

'আচ্ছা, মা, আমি কসম খাচ্ছি, আর ও প্রসঙ্গে আমি কোন কথাই বলব না।'

'খুব ভাল। এতক্ষণে তা হলে তোমার একটু বুদ্ধির লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি।'

'এখন, বল মা, আমি তোমার কি উপকার করতে পারি ?'

'উপকার ? কই, তার তো কোন পথ দেখি না।'

'যদি অনুমতি কর, তোমাকে একটা উপহার দেই।'

'কিন্তু চারদিকে এত গরীব দুঃখী আছে! তাদের দাবীই বড়। আমাদের তো খোদার ফজলে কোন ঠেকা নাই।'

'কিন্তু তোমাকে একটা কিছু সওগাত না দিলে যে আমি মনে সোয়াস্তি পাচ্ছি না, মা ?'

'আচ্ছা কেবল ওরই জন্য যদি তুমি এত বেকারার থাক, তবে পাঠিয়ে দিও আমাকে সামান্য কিছু।'

* * *

আবদুল্লাহ্‌—'দেখ, এক্ষুণি বুড়ীকে দশ হাজার দিরহাম ও চল্লিশটি উট পাঠিয়ে দাও।'

—ইদ্রিস আহমদ

খালেদার আশা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইয়াছে। তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুল মিত্র-সৈন্যরা দখল করিয়া বসিতেছে, জার্মানীর সঙ্গে তুরস্কও এ যুদ্ধে হারিয়াছে—তাহারই পরিণাম।

তুরস্কের বিরুদ্ধে খৃস্টান শক্তিদের এই বিজয় লাভে তুরস্কের খৃস্টান বাসিন্দা-দের মনে এক বিরাট পরিবর্তন আসিয়াছে: দাম্ভিকতায় তাহাদের মন ভরিয়া

উঠিয়াছে, তাহারা মুসলিম প্রতিবেশীগণের উপর সর্বপ্রকার জুলুম শুরু করিয়া দিয়াছে।

খৃস্টান বালকগুলি পর্যন্ত মুসলিম বালকদের উপস্থিতি বরদাশ্‌ত করিতে পারিতেছে না।

বয়স্ক তুর্করা এ অপমান বিষবড়ির মত নীরবে হজমের চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তুর্ক বালকেরা রুখিয়া উঠিতেছে। তাহারা দল বাঁধিয়া খৃস্টান বালকগণকে পাল্টা আক্রমণ করিতেছে। ফলে মাঝে মাঝে রাস্তায় ইহাদের মধ্যে খণ্ড-যুদ্ধ হইয়া যাইতেছে।

এমনই একটি ঘটনা সম্পর্কে তুরস্কের বিখ্যাত মহিলা নেতা খালেদা খানম বলিতেছেন :

'খুব একটা হুড়মুড় হট্টগোল শুনে জানালার কাছে গেলাম। রাস্তার এপারে ওপারে দুই দল ছোকরা সামনাসামনি দাঁড়িয়েছে—খৃস্টান আর মুসলমান। এরা লড়াই করবে।

এদের মধ্যে দাঁড়িয়ে—চারটি মা—দুইটি খৃস্টান, দুইটি মুসলমান। এদের পরনে ময়লা ছেঁড়া কাপড়। কিন্তু এদের বুকভরা স্নেহের মধু। এরা নিজদের বাচ্চাকে ও অপর দলের বাচ্চাদেরকে কত স্নেহ, কত আদর, কত সোহাগ, কত অনুনয়ে বলছে, 'সোনার চাঁদেরা আমার, তোমরা ঝগড়া করো না, বাড়ী যাও, বাড়ী যাও।'

ছেলেরা মায়েদের সে আবেদন উপেক্ষা করতে পারল না, তারা যার-যার বাড়ী ফিরে গেল। অনেক কাল পর সেই দিন রাস্তায় লড়াই হলো না।

আমি জানালা হতে ফিরে এসে বসলাম। আমার দুই চোখ বয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল : আশার অশ্রু। মনে হল, যেন এই মলিন-বসনা নারীদের ভিতর দিয়ে আমি ভবিষ্যতের ছবি দেখলাম। দেখলাম, জগতের ছেলেরা কামান-বন্দুক, তলোয়ার হাতে লড়াইর জন্য দাঁড়িয়েছে; এমন সময় এলো জগতের সমস্ত জাতির মায়েরা—তারা স্নেহে আদরে চোখের পানির হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বলে কয়ে তাদের যুদ্ধ-উন্মুখ সন্তানদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

এ জগতে সংগ্রাম নিবারণের একমাত্র ভরসা আমাদের ভবিষ্যতের মায়েরা।'

—খালেদা খানম

দুর্ভেদ্য দুর্গ

সেলজুকীয় সম্রাট মালিক শাহ্ জ্ঞানে, পরাক্রমে, প্রভাবে, ন্যায়-পরায়ণতায় আদর্শস্থানীয়। আর তাঁহারও চেয়ে সর্ববিষয়ে আদর্শস্থানীয় মহামনস্বী মন্ত্রী নিজামুল মুল্‌ক্। মন্ত্রীর সততা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতার উপর সুলতানের অগাধ আস্থা, অটুট ভক্তি; তাই তিনি মন্ত্রীর উপর যাবতীয় কাজের পর্যবেক্ষণভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

মহামনা মন্ত্রীও এ সুযোগের সম্যক সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তিনি মালিক শাহের বিশাল সাম্রাজ্য সাতবার পরিভ্রমণ করিয়া প্রজাপুঞ্জের অবস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলেন এবং রাজ্যময় বহু পয়ঃপ্রণালী, পুল, মসজিদ, হাসপাতাল, মুসাফিরখানা, অনাথ আশ্রম ও বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। উচ্চশিক্ষার সুবিধার জন্য বাগদাদে বিশ্ব-বিশ্রুত নিজামীয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল।

এই সব বিভিন্ন কাজে বিশেষতঃ শিক্ষাবিস্তারমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয় নির্বাহ করিতে রাজকোষে ভাটা পড়িয়া আসিল।

মালিক শাহ্ শঙ্কিত ও বিরক্ত হইয়া একদা উজীরকে ডাকিয়া বলিলেন, "উজীর সাহেব, এই সব প্রতিষ্ঠানের খরচ যোগাতে গিয়া আপনি রাজকোষ নিঃশেষ করে এনেছেন, অথচ একটা সুরক্ষিত দুর্গও নির্মাণ করলেন না, বা একটা নতুন প্রবল বাহিনীও গঠন করলেন না যে বিপদকালে আমার রাজ্য রক্ষা পাবে।"

নিজামুল মুল্‌ক্ বলিলেন, "আপনি যে দুর্গের কথা বলেন, তা অস্থায়ী ধ্বংসশীল; কিন্তু আমি আপনার জন্য যে দুর্গ নির্মাণ করেছি, তা চিরস্থায়ী অটুট। আর সৈন্যদের কথা বলছেন। তাদের তীর-গোলা দুই চারশত গজ পর্যন্ত যেতে পারে; কিন্তু আমি যে সৈন্যদল গঠন করলাম, তাদের তীর আকাশ ভেদ করে আল্লাহ্‌র আরশে পৌঁছাবে এবং তারা আপনাকে চিরজীবী করে রাখবে।"

—ছিন্নাছতনামা

গবাক্ষ পথে

গবাক্ষের পথে ঘরের ভিতরের অবস্থা কিছু কিছু চোখে পড়ে। ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়াও মানুষের জীবনের ভিতরের অবস্থা কিছু কিছু অনুমান করা সম্ভব হয়। এসব ঘটনা যেন মানুষের জীবন-কক্ষের গবাক্ষ পথ।

একদিন নেপোলিয়ন বোনাপার্টির প্রতাপে ইউরোপ, আফ্রিকা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। এই অসামান্য সামরিক প্রতিভার অধিকারী অক্লান্ত কর্মীর আবির্ভাব ছিল জ্যোতির্ময় উল্কার মতই আকস্মিক, আবার তাহার তিরোধানও ছিল তেমনই আকস্মিক। কিন্তু তাঁহার অল্পকালব্যাপী কর্মজীবনে তিনি জগতের ইতিহাসে যে গভীর রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা মুছিয়া যাইবার নহে। নিম্নে তাঁহারই জীবন-প্রাসাদের কয়েকটি ঘটনা-গবাক্ষের পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

॥ এক ॥

১৭৬৯ খৃস্টাব্দ। পর্বত-সংকুল ক্ষুদ্র দ্বীপ—কর্সিকা। দ্বীপের একটি পাষাণময় কোণে একটি ছোট্ট তাঁবু; সেই তাঁবুতে আসীন একটি তরুণী; তরুণীর কোলে দুধের শিশু। জননী বাচচা কোলে লইয়া কান পাতিয়া শুনিতেছেন দূরাগত রণধ্বনি; ভাবিতেছেন, 'রাত হয়ে গেল, তবু ওদের লড়াই থামল না? গোলাগুলী এখনো অবিরাম চলছে?'

ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ কানে আসিল। জননী উঠিয়া দাঁড়াইলেন—তাঁহার স্বামী লড়াই হইতে ফিরিতেছেন। জননীর ওষ্ঠপুট দৃঢ়বদ্ধ, নাসিকা বক্র, কোমরে ছুরিকা, সমস্ত মুখমণ্ডলে দৃঢ়মনোবলের সুস্পষ্ট চিহ্ন পরিস্ফুট। স্বামীর সমস্ত দেহে শক্তিমত্তার পরিচয়—বলিষ্ঠ, সুন্দর, চঞ্চল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই প্রাচীন অভিজাত ঘরের সন্তান—যে গর্বিত অভিজাতেরা প্রথমে ইটালীতে, পরে কর্সিকা দ্বীপে যুগের পর যুগ দুর্জয় সাহসে ময়দানে ময়দানে লড়িয়া ফিরিয়াছে।

কর্সিকা ফরাসীর গোলামির জিঞ্জিরে আবদ্ধ। সে জিঞ্জির ভাঙিয়া আজাদী অর্জনের জন্য কর্সিকার বীর-সন্তানেরা তলোয়ার ধরিয়াছে। সে স্বাধীনতা সংগ্রামে ইঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শরীক হইয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদী ফরাসী জাতির

অত্যাচারের ভয়ে ইঁহারা জনপদ ছাড়িয়া পর্বতের কোলে আশ্রয় লইয়াছেন। এই বীরাঙ্গনার বুকের দুধে পুষ্ট হইতেছে শিশুর দেহ, এই বীর-পিতার অঙ্কে বাড়িতেছে তার শরীর, এই যুদ্ধ-ধ্বনি অনুদিন রণিত হইতেছে তাহার কর্ণ-বিবরে; এই আজাদী লড়াইয়ের জীবনময় হাওয়া সে গ্রহণ করিতেছে প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে।

এই জননী লেটিজীয়া, এই জনক বোনাপার্ট, এই শিশু নেপোলিয়ন।

॥ দুই ॥

১৭৭৯ খৃস্টাব্দ। শৈশব কাটাইয়া নেপোলিয়ন এখন বালক। সে স্কুলে যায়। ব্রিয়েনা স্কুলের বাগানের এক কোণের খানিক জায়গা সে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া লইয়াছে। সেইখানে বসিয়া সে পড়ে। লাজুক, স্বল্পভাষী, নির্জনতাপ্রিয়। সে যতখানি জায়গা ঘিরিয়া লইয়াছে, সবখানি তাহার প্রাপ্য নয়, তাহার দুইজন সহপাঠী ঐ জায়গার অংশ দাবী করিতে পারে। বালক ঐ দুইজনকে সেখানে আসিতে দিতে রাজী, কিন্তু আর কাহার সাধ্য ঐ ঘেরা জায়গার মধ্যে ঢোকে? কেহ অমন দুঃসাহস করিলে সে বাঘের বাচ্চার মত তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িতে চায়। একটু আগে বাগানে আতশবাজী হইতেছিল; দুইজন শিক্ষকের হাত আগুনে একটু পুড়িয়া যাওয়ায় তাঁহারা ঐ ঘেরা জায়গায় আশ্রয় লইতে যাইতেছিলেন। বালক একটি খোন্তা হাতে লইয়া তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। শিক্ষক দুইজন চলিয়া যাইতে যাইতে কহিলেন, 'ছোকরার উপরটা পাথরের মত শক্ত, কিন্তু ওর ভিতরে লুকিয়ে আছে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি।'

বালক তাহার স্বাধীনতার জন্য সর্বদা ব্যস্ত। স্কুল হইতে সে তাহার পিতাকে লিখিয়া জানাইল, 'বাবা, আমি কারখানার কুলীদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হয়ে থাকতে রাজী, প্যারিসের চিত্রশিল্পীদের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি হয়ে থাকতে রাজী নই।'

॥ তিন ॥

মিলিটারী স্কুল হইতে বাহির হইয়া নেপোলিয়ন কমিশন পাইয়াছেন। কিছুকাল মধ্যেই তাঁহাকে রাষ্ট্রবিরোধী কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা হইল। তাঁহার বন্ধুরা বলিলেন, 'সময় থাকতে সরে পড়, নইলে মস্তক নিয়ে টানাটানি শুরু হতে পারে।'

নেপোলিয়ন উত্তর দিলেন, 'পলায়ন? সে কখ্‌খনো হতে পারে না। মানুষ আমার প্রতি অবিচার করতে পারে, কিন্তু আমি তো জানি যে আমি

নির্দোষ; কাজেই, তাদের এ দোষারোপে আমার আসে যায় কি? আমার বিবেক আমার বিচারক: আমি তারই কাছে আমার কাজের বিচারভার দিয়ে নিশ্চিন্ত। আমাকে রক্ষা করার জন্য তোমরা কিছু করো না; তাতে আমাকে বেইজ্জত করা হবে। আমি আমার দেশের সেবার জন্য বেঁচে আছি; তার জন্য আমি সর্বপ্রকার দুঃখ বরণ করতে রাজী।'

॥ চার ॥

নেপোলিয়নের সামরিক প্রতিভায় ফ্রান্সের দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; ইউরোপের দিকে দিকে লক্ষ কণ্ঠে তাঁহার যশঃগৌরব ঘোষিত হইতেছে। আর সেই কীর্তি অর্জন ও রক্ষণের জন্য নেপোলিয়ন দিন-রাত অসুরের মত অশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন।

অনেকদিন পর মাতা লেটিজীয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ। স্নেহময়ী জননী বীর-পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, 'বড় কাবু হয়ে গেছিস, বাছা। এত কঠোর খাটুনী তোর সইবে না রে, সইবে না।'

'আমি একটুও কাবু হই নাই, মা! সত্যিকার যে জীবন, আমি এখন তাই উপভোগ করছি।'

'না না, বাছা, তুই খেটে মরছিস; অনাগত ভবিষ্যতের জন্য তুই শরীর-পাত করছিস?'

'একেই তুমি বলছ শরীরপাত, মা? না না না, মা, এই-ই সত্যিকার জীবন; তোমার ছেলে এই জীবনই তো চায়।'

॥ পাঁচ ॥

১৭৯৯ খৃস্টাব্দ। নেপোলিয়ন মিসর জয় করিয়া একর অবরোধ করিয়া বসিয়াছেন। একর বীর-বিক্রমে আত্মরক্ষা করিতেছে, কিছুতেই বৈদেশিক আক্রমণ-কারীর নিকট মস্তক নত করিতে রাজী হয় নাই।

দুইমাস এমনই ভাবে কাটিয়া গেল। নেপোলিয়নের সাহসী সেনাপতিরা একে একে এই মহাহবে আত্মাহুতি দিতে লাগিল। ইতোমধ্যে নেপোলিয়নের সৈন্যদলে ভীষণ প্লেগ দেখা দিল। দলে দলে সিপাহীরা মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল।

সৈন্যদলে মহাত্রাসের সঞ্চার হইল। সেনাপতিরা প্রমাদ গণিলেন।

সংবাদ পাইয়া নেপোলিয়ন তখনই সামরিক হাসপাতালে চলিয়া গেলেন

এবং তাঁহার সেই অতুলনীয় ওজস্বিনী ভাষায় সৈন্যদের বুকে নূতন আশা, নূতন শক্তি ফিরাইয়া আনিলেন। প্লেগের রোগী ছুঁইতে কেহ সাহস পাইতেছিল না; নেপোলিয়ন তাহাদের পাশে বসিয়া নিজ হাতে টিপিয়া টিপিয়া গলিত অঙ্গের ক্লেদ পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেলেন।

সৈন্যরা অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, 'আমাদের সেনাপতি মানুষ, না ফিরিশ্‌তা?'

॥ ছয় ॥

১৮০০ খৃস্টাব্দ। সম্মুখে আল্পস পর্বতমালা: জনহীন, পথহীন, বরফ-আকীর্ণ অলংঘ্য। তুষারঢাকা চোরাপথ, একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই, চির-অন্ধকার গভীর গর্তে পড়িয়া ইহলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে। কোথা হইতে হাজার, দশ হাজার মণী বরফের স্তূপ অকস্মাৎ স্থানচ্যুত হইয়া ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। সে পর্বতের চূড়ায় পাখিরা ভয়ে বাসা বাঁধে না, মানুষ ভয়ে তাহার পাশ দিয়া চলে না।

তবু এই পর্বত সসৈন্য অতিক্রম করিতে হইবে, নহিলে পর্বতের ওপারের দুশমনগণকে কাবু করা যাইবে না।

সংবাদবাহী আসিয়া কহিল—এ পর্বত অতিক্রম মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

নেপোলিয়ন বলিলেন, 'সৈন্যগণ, তোমাদের সেনাপতির অভিধানে 'অসম্ভব' শব্দ নাই—অতএব অগ্রসর! —অগ্রসর!'

কামানগুলি কাঠের সঙ্গে বাঁধা হইল। সৈন্যরা সেই কাঠ টানিয়া পর্বতের উপর তুলিতে লাগিল: এক-একটি কামান টানিতে ৫০, ৬০, ১০০ সৈন্য লাগিয়া গেল। গাড়ীর চাকা, ডলনা, ছাউনী সমস্ত খুলিয়া কাঠের সঙ্গে বাঁধা হইল, সেই কাঠের দুইদিক কাঁধে লইয়া সৈন্যরা অগ্রসর হইতে লাগিল। গোলা-বারুদ ঘোড়া, গাধা, খচ্চরের পিঠে তুলিয়া দেওয়া হইল। নেপোলিয়ন নিজে কখনও ঘোড়ায় চড়িয়া, অধিকাংশ সময় পায়ে হাঁটিয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

এমনই করিয়া ষাট হাজার সৈন্য লইয়া নেপোলিয়ন আল্পস পার হইলেন। ওপারের শত্রু সৈন্যদের অন্তরে সীমাহীন ত্রাসের সঞ্চার হইল। তাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল—আকাশ হতে নেমে আসে যেসব সিপাহী, তাদের সাথে লড়াইয়ে বিজয়ের আশা কোথায়?

নেপোলিয়ন বলিতেন, 'দুনিয়াতে দুইটি মাত্র শক্তি আছে—একটি তলোয়ারের শক্তি, আর একটি আত্মার শক্তি ; পরিণামে আত্মার শক্তিই জয়ী হয়।'

আল্পস অভিযানে আত্মার শক্তিরই জয় হইল।

॥ সাত ॥

১৮০৪ খৃস্টাব্দ। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাটপদে বৃত হইতেছেন। গীর্জায় অভিষেক দরবারের ব্যবস্থা হইয়াছে: বিচিত্র আলোকসজ্জায় সমস্ত দরবার ঝলসিত। মহামূল্য পোশাকে আজ নেপোলিয়ন সজ্জিত; অপূর্ব বেশভূষায় তাঁহার পত্নী জোসেফাইন নেপোলিয়নের পাশে উপবিষ্ট। খৃস্টীয় জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু মহামান্য পোপ উপস্থিত। তাঁহারই পবিত্র হাত দ্বারা শাহীতাজ সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর মস্তকের উপর স্থাপিত হইবে, ইহাই চিরাচরিত প্রথা।

যে জানু দুনিয়ার কোন মানুষের সম্মুখে নেপোলিয়ন এ যাবৎ নত করেন নাই, আজ পোপের সম্মুখে সেই জানু নত করিয়া তাঁহাকে রাজমুকুট গ্রহণ করিতে হইবে ; জোসেফাইনও তাহাই করিবেন।

অবশেষে সেই পরম মুহূর্ত উপস্থিত হইল। উপস্থিত সকলে বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিল যে নেপোলিয়ন তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস মোতাবেক সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া প্রথম রাজমুকুট তুলিয়া লইলেন এবং নিজ হাতে তাহা নিজের মস্তকের উপর স্থাপন করিলেন। জোসেফাইন তাঁহারই সম্মুখে নত জানু হইয়া বসিলেন, নেপোলিয়ন দ্বিতীয় মুকুটটি জোসেফাইনের মাথায় পরাইয়া দিলেন।

উপস্থিত সভাসদ, পাদ্রী, পুরোহিত, পোপ, উজীর, নাজীর, সেনাপতি সকলে নিশ্চুপ।

নেপোলিয়ন তাঁহার ভাইয়ের দিকে একটু ঝুঁকিয়া ছোট করিয়া বলিলেন, 'জোসেফ, আহা! আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতেন, আর নিজ চোখে এই সব দেখতেন!'

এত সমারোহের মধ্যেও নেপোলিয়নের মনের মুকুরে ভাসিয়া উঠিয়াছে তাঁহার শৈশবের বিহার ভূমি—তাঁহার চির প্রিয় কর্সিকা—কর্সিকার আজাদী জেহাদে তাঁহার মাতা-পিতার সক্রিয় অংশ গ্রহণ।

অভিষেক উৎসব সমাপ্ত হইল। নেপোলিয়ন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

'আহ! বাঁচা গেল। এর চেয়ে লড়াইর ময়দানে দাঁড়িয়ে দুহাত লড়তে পেলে আমি অধিকতর সুখী হতাম।'

॥ আট ॥

১৮০৯ খৃস্টাব্দ। নেপোলিয়ন প্রাশীয়া জয় করিয়া শনব্রান শহরে সৈন্য পরিদর্শন করিতেছিলেন। সন্দেহজনক অবস্থায় ১৮ বৎসরের অত্যন্ত সুন্দর অত্যন্ত ভদ্র একটি যুবক ধরা পড়িল—তাহার কাপড়ের নীচে একটি মস্তবড় ছোরা আর একটি ছবি। সে বলিল, 'স্বয়ং সম্রাট ভিন্ন আর কারো কাছে আমি কিছু বলব না।' তাহাকে সম্রাটের নিকট নেওয়া হইল।

নেপোলিয়ান—যুবক, তুমি আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে?

যুবক—হাঁ, আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম।

নে—যুবক, তুমি হয় উন্মাদ, নাহয় অসুস্থ।

যু—আমি উন্মাদও নই, অসুস্থও নই; আমি সম্পূর্ণ বহাল-তবিয়তে আছি।

নে—তবে তুমি আমাকে মারতে চাও কেন?

যু—কারণ আপনি আমার দেশের সর্বনাশ করছেন।

নে—তোমার দেশের?

যু—হাঁ, আমার দেশের—প্রত্যেক জার্মানবাসীর দেশের।

নে—কে তোমাকে উসকানি দিয়েছে?

যু—কেউ না। আমার অন্তরাত্মা আমাকে বলছে, আপনাকে হত্যা করলে আমার জার্মানী বাঁচবে, সমগ্র ইউরোপ বাঁচবে।

নে—ডাক্তার, যুবকটিকে নিয়ে যাও—দেখ তো, এর মধ্যে উন্মাদের কি কি লক্ষণ আছে? (নেপথ্যে স্বগত—সৌম্য সুন্দর সাহসী যুবক! আহা! যদি পাগল বলে একটা রিপোর্ট পাওয়া যেত!)

*   *   *   *

ডাক্তার—সম্রাট, যুবক সম্পূর্ণ সুস্থ।

যু—আমি তো তা আগেই বলেছিলাম, সম্রাট।

নে—কিন্তু ডাক্তার যাই বলুক, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোমার মাথা খারাপ। তুমি তোমার সমস্ত পরিবারের উপর বিপদ ডেকে আনছ। বল যে তুমি একাজের জন্য দুঃখিত আমি তোমায় ক্ষমা করে দিব।

যু—দুঃখিত? আমি মোটেই দুঃখিত নই। তবে হাঁ, আপনাকে হত্যা করতে পারি নাই বলে আমি দুঃখিত বটে!

নে—তুমি একটা আহ্মক, না শয়তান? হত্যার মত ভীষণ অপরাধ—এ তোমার কাছে কিছুই নয়?

যু—হাঁ, সম্রাট! হত্যা অপরাধের কাজ, কিন্তু আপনাকে হত্যায় অপরাধ নাই; কারণ তাতে দশের উপকার হবে।

নে—আচ্ছা, তোমার সাথের ছবিটিতে এ বালিকাটি কে?

যু—ওকে আমি ভালবাসি।

নে—তোমার এই হত্যা-চেষ্টা উনি সমর্থন করবেন?

যু—আমি আপনাকে হত্যা করতে পারলাম না বলে উনি দুঃখিত হবেন,—কারণ উনি আপনাকে আমার মতই মনে-প্রাণে ঘৃণা করেন।

নে—(স্বগত) কি সুন্দর মেয়েটি! আর কি সুন্দর এই যুবক! অবশেষে ওর কাছে আজ আমি হার মানব? না—আমি ওকে ক্ষমা করব—আমি ওকে বাঁচাব। ও আমাকে ঘৃণা করে?—তা করুক না কেন; তাতে আমার কি আসে-যায়?

যু—সম্রাট!

নে—শোন, যুবক, আমি তোমাকে ক্ষমা করব—তুমি বাঁচ, মেয়েটি বাঁচুক।

যু—যাক, তাহলে আপনাকে হত্যা করার সত্যি একটা সুযোগ পাব!

নে—না! আমি পরাজয় মানলাম—একে রক্ষা করা গেল না। জহ্লাদ, নিয়ে যাও!

জহ্লাদ—যো হুকুম।

নে—শোন মন্ত্রী, শোন সেনাপতি—সন্ধি এ জাতের সাথে করতেই হবে। জলদী কর—দাবীদাওয়া কমিয়ে ফেল—তবু সন্ধি হোক।

সেনাপতি—যো হুকম।

*　　*　　*　　*

নে—ওহ! এত সুন্দর, এত ভদ্র, এত সাহসী এই জার্মান যুবক! আচ্ছা, মরবার কালে ছোকরা কি ব্যবহার করে গেল?

সেনাপতি—চীৎকার করে বলে গেল—স্বাধীনতা চিরদিন বেঁচে থাক—অত্যাচারীর ধ্বংস হোক।

নে—অদ্ভুত! হাঁ, যুবকের হাতের ঐ ছোরাটা প্যারিসে নিয়ে চল: যাদুঘরে রেখে দেওয়া যাবে।

॥ নয় ॥

যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ। অবশেষে স্বয়ং নেপোলিয়নও বুঝি ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন। রাশিয়া, জার্মানী, অস্ট্রিয়া—সর্বত্র সংগ্রাম।

নেপোলিয়ন তাঁবুতে দাঁড়াইয়া আছেন—সন্ধির প্রস্তাব লইয়া দূত পাঠাইয়াছেন, তাহারই প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায়। রাত গভীর হইতে গভীরতর হইয়া আসিল।

সহসা নেপোলিয়নের পেটের ব্যথা শুরু হইল—অন্ত্রক্ষতের নিদারুণ বেদনায় তিনি তাঁবুর খুঁটিতে হেলান দিয়া দাঁড়াইলেন। সেনাপতি কাছে আসিয়া কহিলেন, 'ডাক্তার ডেকে পাঠাই?'

'না। আমার তাঁবু স্বচ্ছ, আমি দাঁড়িয়ে থাকলে সবাই তাদের নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে কাজ করে।'

'অন্তত একটুখানি শুয়ে পড়ুন।'

'না—আমি দাঁড়িয়ে মরব।'

'দয়া করে অনুমতি দিন, ডাক্তার নিয়ে আসি।'

'বলছি, না—না—না। সৈন্যদের কারো অসুখ হলে আমি তাকে হাসপাতালে পাঠাই, আমাকে হাসপাতালে পাঠায় কে?'

সকালবেলায় সম্রাট নেপোলিয়ন হুকুম জারি করেন—'সৈন্যগণ—অগ্রসর।'

॥ দশ ॥

যুদ্ধ—যুদ্ধ—যুদ্ধ—! রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, জার্মানী নেপোলিয়নকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের দূতেরা আসিয়া সংবাদ দিল—নেপোলিয়ন পরাজয় স্বীকার করিয়া ফ্রান্সে ফিরিয়া যাউন।

নেপোলিয়নের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; তিনি সগর্বে বলিলেন, 'আমার সঙ্গে ৫০ হাজার সৈন্য আছে। তাদের সঙ্গে আমাকে যোগ কর, তবেই পাবে ১ লাখ ৫০ হাজার সৈন্য।'

লড়াই শুরু হইল। নেপোলিয়নের সেনাপতি মারমন্ট পশ্চাদাবর্তন করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়নের সঙ্গে মাত্র কয়েক হাজার সৈন্য। সেই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া শত্রুর অগণ্য সৈন্যের সম্মুখীন হওয়া বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। 'কসাক'!—'কসাক'! চীৎকারের সঙ্গে তাঁহার সৈন্যদল ভাগিয়া চলিল। নেপোলিয়ন ঘোড়া ছুটাইয়া পলায়নপর সৈন্যদের মধ্যে যাইয়া বলিলেন, 'সৈন্যগণ, ফিরে দাঁড়াও—যুদ্ধ কর। আমি আছি।'

নেপোলিয়ন তলোয়ার খুলিয়া কসাকদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাঁহার পশ্চাতে মাত্র তাঁহার দেহরক্ষীদল। ছয় হাজার কসাক সৈন্য ময়দান ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

১৮১৫ খৃস্টাব্দ। ছয় মাসের অধিক কাল নেপোলিয়ন এলবায় কাটাইয়াছেন। ইতোমধ্যে বুরবন বংশীয় রাজা ফ্রান্সের সিংহাসনে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বুরবনদের প্রত্যাগমনে ফ্রান্সের সুখ হয় নাই। নেপোলিয়ন ভাবিতেছেন— 'আমিই ফ্রান্সের এ দুর্ভাগ্যের কারণ, এ দুর্ভাগ্য হতে প্রিয় ফ্রান্সকে রক্ষা করা আমারই কর্তব্য।'

একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ লেটিজীয়ার কাছে যাইয়া নেপোলিয়ন বলিলেন, 'মা, একটা কথা, কিন্তু গোপনে রেখো—আমি আগামী কালই এ দ্বীপ ছেড়ে ফ্রান্সের দিকে চলছি।' লেটিজীয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'ওহ্! কি পরম শান্তির মধ্যেই-না দ্বীপের বুকে এ-কয়টা মাস কেটেছে, আবার বুঝি শুরু হবে সেই প্রচণ্ড তুফানময় জীবন।' কিন্তু তিনি মুহূর্তে আত্মসম্বরণ করিয়া লইলেন; বলিলেন, 'আশীর্বাদ করছি, যাও—তোমার ভাগ্যের পথে তুমি অগ্রসর হও: কর্মহীন বার্ধক্যের মধ্যে তুমি তিলে তিলে মরণের মুখে চলবে এ বোধ হয় বিধাতার ইচ্ছা নয়, তুমি তলোয়ার হাতে লড়াইর ময়দানে আত্মোৎসর্গ করবে, এই হয়তো তাঁর বিধান।'

এক হাজার সৈন্য, কয়েকটি কামান—এই সামান্য সম্বল লইয়া সাতটি ছোট ছোট নৌকায় নেপোলিয়ন দরিয়া পাড়ি দিয়া ফ্রান্সের উপকূলের দিকে যাত্রা করিলেন।

কূলে অবতরণ করিয়া নেপোলিয়ন প্যারিসের দিকে চলিয়াছেন। রাজকীয় বাহিনী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। সে বাহিনীর সেনাপতিরা রাজার নিকট বাইবেল মাথায় লইয়া শপথ করিয়া আসিয়াছিলেন—নেপোলিয়নকে তাঁহার দল-সহ তাহারা পথের পিপীলিকার মত পায়ের তলে পিষিয়া মারিবেন। সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য তাঁহারা হুঙ্কার ছাড়িয়া আক্রমণের আদেশ দিলেন। নেপোলিয়ন ঘোড়া হইতে নামিয়া সে সৈন্যদের সম্মুখে আসিলেন; বলিলেন, 'সৈন্যগণ, তোমরা কি আমাকে চিনতে পাচ্ছ না? তোমাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে যে তার সম্রাটকে হত্যা করতে চায়, সে এগিয়ে আসুক—এই আমি বুকের কাপড় খুলে দিচ্ছি।' এই বলিয়া তিনি তাঁহার গায়ের কোট খুলিয়া তাঁহার বুক বাড়াইয়া দিলেন। সৈন্যরা 'জয় সম্রাটের জয়' বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া নেপোলিয়নের পতাকাতলে আসিয়া দাঁড়াইল।

'তবে চল' বলিয়া তিনি তাহাদের সবাইকে লইয়া প্যারিসের পথে অগ্রসর হইলেন।

তের মাস আগে নেপোলিয়নকে ফ্রান্সের সিংহাসন ত্যাগ করিয়া প্যারিস হইতে বাহির হইতে হইয়াছিল; একটিও গুলী খরচ না করিয়া তিনি আবার প্যারিসে প্রবেশ করিলেন।

॥ বারো ॥

ওয়াটারলুর ময়দানে নেপোলিয়নের সৌভাগ্য রবি অস্তমিত হইয়াছে। বিজয়ী শক্তিরা তাঁহাকে সেন্টহেলেনা দ্বীপে অন্তরীণে পাঠাইয়াছেন।

সকালবেলা নেপোলিয়ন বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। দেখিলেন—একটা কৃষক ক্ষেতে লাঙ্গল দিতেছে। নেপোলিয়ন ঘোড়া হইতে নামিলেন; সাথীর হাতে লাগাম দিয়া কৃষকের কাছে গেলেন, বলিলেন, 'দাও তো, ভাই, দেখি তোমার এ বিদ্যায় পাস করি কিনা।' এই বলিয়া তিনি লাঙ্গলের কুটি হাতে লইলেন এবং অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সোজা লাঙ্গল চালাইয়া গেলেন। কৃষক অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

একদিন তিনি তাঁহার সঙ্গীর সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে বলিলেন। 'আমি অনেক ভেবে দেখলাম,—আমার এ পতনের জন্য আমিই দায়ী। আমি চোখ বুঁজলে মাঝে মাঝে দেখি, আমার সমস্ত ভুল প্রেতের মত আমার সামনে দিয়ে সারি বেঁধে চলেছে। ওহ্! আমি বড় বেশী চেয়েছিলাম। কেন এত বড় লোভ আমার হয়েছিল? দুনিয়ার কেউ আমার সামনে দাঁড়াতে পারে নাই, কেউ আমার গায়ে আঁচড় বসাতে পারে নাই। নেপোলিয়নের পরাজয় স্বয়ং নেপোলিয়ন ছাড়া এ দুনিয়ায় আর কেউ ঘটাতে পারত না।'

॥ তেরো ॥

নেপোলিয়নের অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত। ধীরে তাঁহার কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, 'ফ্রান্স! সৈন্যদল! জোসেফাইন!'

এই শেষ তিন শব্দের সঙ্গে নেপোলিয়নের কণ্ঠধ্বনি চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গেল।

বাহিরে ঝড়। ঝড় তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিল। নেপোলিয়নের হাতে শেষ বোনা দুইটি গাছ উপড়িয়া পড়িয়া গেল।

ধীরে ঝড় থামিয়া আসিল। নেপোলিয়নের দেহেও নামিয়া আসিল এক অভাবনীয় স্থৈর্য। তাঁহার চোখে-মুখে বেদনার কোনও চিহ্ন নাই: শুধু গলায় মাঝে মাঝে একটু অস্পষ্ট শব্দ।

মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড সূর্য সায়াহ্নের ম্লানিমার মধ্যে সেন্টহেলেনার দরিয়ার কোলে ঢলিয়া পড়িল; সেদিন সেই সঙ্গে একটি শতযুদ্ধজয়ী বীরের ক্লান্ত দেহ ছাড়িয়া তাঁহার অমর আত্মা মহাযাত্রা করিল।

গ্রানাডার শেষ বীর

তখন স্পেনে মুরদের ভাগ্যের দরিয়ায় ভাটা শুরু হইয়াছে: ক্যাথটিলি ও আরাগনের সম্মিলিত রাজ্যের রাজা-রাণী ফার্দিনান্দ ও ইজাবেলা স্পেন হইতে মুসলিম শক্তি নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

গ্রানাডা রাজ্য—স্পেন মুসলিম প্রভুত্বের শেষ দুর্গ—সেও আত্মকলহে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতেছিল: সুতরাং খৃস্টান শক্তির পক্ষে মালাগা, আলমুনিকার, গাদীক্স, বাজা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি দখল করিয়া লওয়া মোটেই কঠিন হইল না।

অবশেষে ১৪৯১ খৃস্টাব্দে ফার্দিনান্দ ও ইজাবেলার সৈন্যরা গ্রানাডা অবরোধ করিয়া বসিল। খৃস্টান সৈন্য অগণ্য, তাহাদের রসদ অপরিমিত, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র প্রচুর। আর মুসলিম সৈন্য? তাহারা সংখ্যায় অল্প, তাহাদের রসদ অপ্রচুর, তাহাদের অস্ত্র পুরাতন, তাদের মন বিষণ্ণ। তবু গ্রানাডা সংকল্প করিল, না লড়িয়া তাহারা এক ইঞ্চি জমিও দুশ্মনকে ছাড়িয়া দিবে না।

সাত মাস পর্যন্ত অসহনীয় অবস্থার ভিতর দিয়া গ্রানাডা আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে: আর বুঝি পারে না।

কিন্তু মুসলিম শক্তির জীবনসন্ধ্যার সেই ঘনায়মান অন্ধকারের বুক চিরিয়া সহসা একটি অদ্ভুত জ্যোতিষ্ক ফুটিয়া উঠিল। দূর স্মৃতির দিগন্ত-রেখায় সেই বিষাদময় গোধূলির উদাস ললাটে আজিও মহাবাহু মুসার বীরত্ব মহিমা সন্ধ্যা-তারকার মত জ্বলিতেছে।

অসাধারণ শৌর্য বীর্যের অধিকারী ছিলেন এই তরুণ যোদ্ধা মুসা ইবনে আবুল গাচ্ছান। অভাবের জ্বালায় বার বার গ্রানাডাবাসীদের মন ভাঙিয়া পড়িয়াছে, বার বার মুসা তাঁহার প্রাণের আগুন চারিদিকে ছড়াইয়া তাহাদিগকে উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন; বার বার তাঁহার তীব্র আক্রমণে খৃস্টান সৈন্যের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

ফার্দিনান্দ গ্রানাডার রাজা আবদুল্লাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "অস্ত্র ত্যাগ কর—অন্যথায় ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হও।"

মূসা প্রত্যুত্তর দিলেন, "রাজন! জেনে রাখুন যে মুরদের জন্ম লড়বার জন্য—দীর্ঘ বর্শা, উজ্জ্বল তরবারি, ক্ষিপ্রগতি তাজী—এরা মুরের চির সহায়। রাজা যদি সত্যই আমাদের তরবারি চান, তবে তাঁকে স্বয়ং আসতে হবে, আর অনেক রক্তের বিনিময়ে এই অস্ত্রলাভ করতে হবে।"

একজন বলিল, "কিন্তু সন্ধি করে যদি শান্তিময় জীবনের পথ করা যায়, তবে তাতে দোষ কি?"

মূসা দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিলেনঃ "শান্তিময় জীবন? তার চেয়ে সহস্রগুণ গৌরবময় হবে আমার সেই মৃত্যু যা আমি অর্জন করব লড়াইয়ের ময়দানে। এই অবিশ্বাসী শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করে যদি তার সুরম্য প্রাসাদের দুগ্ধফেননিভ শয্যা লাভ করাও সম্ভব হয়, তবু আমার কাছে তার চেয়ে লক্ষগুণে লোভনীয় এই রাজধানীর দেওয়ালের তলে একটি ছোট্ট কবর যেখানে দাঁড়িয়ে হয়তো আমি শেষ যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ব।"

অবস্থা ক্রমে আরও গুরুতর হইয়া উঠিল। রাজধানীময় নিরাশার কালো-ছায়া ছড়াইয়া পড়িল।

একজন প্রস্তাব করিল, "আমাদের আত্মসমর্পণই শ্রেয়।" সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "তাই হোক, তাই হোক!"

মূসার অন্তর জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু কিছু বলিলেন না, শুধু রুদ্ধরোষে জ্বলিতে জ্বলিতে তাঁহার সৈন্যদলসহ শহরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "যদি শত্রুদল সত্য সত্যই নগরে প্রবেশ করতে চায়, তবে আমার ও আমার সৈন্যদলের মৃত-দেহের উপর দিয়ে তাদের আসতে হবে।"

কয়েক দল খৃস্টান সৈন্য ফটকের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল; মূসার সৈন্য-দল তাহাদিগকে হটাইয়া দিল। মূসা তাঁহার সঙ্গিগণকে বলিলেন, "আমরা যে জমিটুকুর উপর দাঁড়িয়ে আছি, এছাড়া আমাদের আর কিছুই নাই। এও যদি যায়, তবে আমাদের নাম, আমাদের ইজ্জত, আমাদের দেশ, কিছুই থাকবে না।"

কিন্তু ফার্দিনান্দের সৈন্যরা যাহা করিতে পারে নাই, দুর্ভিক্ষ তাহা করিল। অনশনে নগরবাসীরা একে একে মরিতে লাগিল, তাহাদের ধৈর্যের শেষ বাঁধ-টুকুও ভাঙিয়া গেল।

আবার পরামর্শ সভা বসিল। আত্মসমর্পণের শর্ত আলোচনা হইতে লাগিল।

মূসার প্রতিবাদের কণ্ঠ আবার বজ্রস্বরে বাজিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন (এবং পরে তাঁহার প্রত্যেক কথা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল): "বন্ধুগণ, স্বপ্নেও ভেব না যে খৃস্টানেরা তাদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে তোমাদের ধন-প্রাণ রক্ষা করবে। এবং যে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা তারা করবে, তার তুলনায় মৃত্যু কিছুই নয়। আমাদের শহর বাজার লুণ্ঠিত হবে, আমাদের দরগা-মসজিদকে অপবিত্র করা হবে, আমাদের বাড়ী-ঘর বিধ্বস্ত হবে, আমাদের মা-বোনেরা বেইজ্জত হবে। আজ যারা গৌরবময় মৃত্যুর চেয়ে, কলঙ্কময় জীবনকে শ্রেয় মনে করছে, কালই তারা নিঃসন্দেহে রকমে উপলব্ধি করবে যে তাদের ভাগ্যে আছে অত্যাচার, উৎপীড়ন, চাবুক, শিকল, পদাঘাত, কারাগার ও মৃত্যু। আমি এই সব দৃশ্য দেখবার জন্য বেঁচে থাকতে চাই না।"

কিন্তু মূসার কথায় কেহ কান দিল না। তাহাদের পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলিতেছিল; কাজেই, তাহারা আত্মসমর্পণে বদ্ধপরিকর হইল।

নগরবাসীদের সিদ্ধান্তে মূসা মর্মান্তিক ক্লেশ অনুভব করিলেন। তিনি নীরবে সভাস্থল হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সিংহ দরবার ও আল হাম্রার পাশ দিয়া স্বগৃহে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর তিনি আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইলেন এবং তাহার প্রিয় তাজীতে আরোহণ করিয়া প্রিয় জন্মস্থান গ্রানাডার দিকে শেষবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া নগরদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

সেই দিন অপরাহ্নে একদল বর্শাধারী স্পেনীয় সৈন্য জেনীল নদীর তীর বাহিয়া যাইতেছিল। তাহারা ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখিল, আপাদমস্তক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কে একজন যোদ্ধা তাহাদের দিকে আসিতেছে। কেবল নিজের নয়, তাহার তেজস্বী অশ্বের সর্বাঙ্গ পর্যন্ত লোহার জালের বর্মে সুরক্ষিত।

তাহারা ডাকিয়া বলিল, "দাঁড়াও, আর পরিচয় দাও তুমি কে!" অপরিচিত যোদ্ধা কোন উত্তর না দিয়া শুধু নীরবে তাহাদের উপর আপতিত হইল। সে তাহার বর্শার এক আঘাতে একজনকে বিদ্ধ করিয়া ঘোড়া হইতে ফেলিয়া দিল, তাহার পর ঘুরিয়া বাকী কয়জনকে তরবারি হস্তে আক্রমণ করিল। তাহার অব্যর্থ আঘাতে একে একে স্পেনীয় যোদ্ধারা ধরাশায়ী হইতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল সে কেবল প্রতিশোধ লইবার জন্য দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া ভীষণভাবে যুদ্ধ করিতেছে, বাঁচিয়া থাকিয়া বিজয়ের ফল ভোগ করিবে এ যেন তাহার লক্ষ্যই নয়! তাই তাহার শরীরে কে কোথায় আঘাত করিতেছে, সেদিকে তাহার দৃষ্টি নাই, সে যেন কেবল মারিতে পারিলেই খুশী।

এমনই ভাবে ক্রমে আটজন স্পেনীয় যোদ্ধার মস্তক দেহবিচ্যুত হইল; কিন্তু ইতিমধ্যে সেও ভীষণভাবে আহত হইল এবং তাহার ঘোড়াও বর্শা বিদ্ধ হইয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু সে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তলোয়ার চালাইতে লাগিল। অবশেষে যখন দেখিল যে তাহার হাত অবশ হইয়া আসিতেছে, আর যুদ্ধ করা সম্ভব নয়, তখন সে বন্দী হওয়াকে ঘৃণ্য মনে করতঃ দেহের শেষ শক্তিটুকু কেন্দ্রীভূত করিয়া জেনীলের পানিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল; তাহার লোহার ভারী পোশাক তাহাকে নদীর অতল পানিতে টানিয়া লইল। ধরণীর শ্যামলিমা যাহার বুকের আগুন নিভাইতে পারে নাই, তটিনীর স্নিগ্ধ কোলে তাহার ঠাঁই হইল। পরাজয়ের গ্লানিকে এমনই ভাবে পরাজিত করিয়া গ্রানাডার শেষ বীর মূসা মহাপ্রয়াণ করিলেন।

—ইনান

রাখাল না খলীফা ?

ইয়ারমুকের ময়দানে মুসলিম ও রোমক সৈন্যের ভীষণ লড়াই হইল। লড়াইয়ে রোমক সৈন্যগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। মুসলিম সেনাপতি আবু ওবায়দা রোমকদের নগরের পর নগর অধিকার করিয়া চলিলেন। অবশেষে তিনি জেরুজালেম অবরোধ করিয়া বসিলেন।

জেরুজালেম অতিশয় প্রাচীন নগর। প্রাচীনকালের ইহুদী ও খৃস্টানগণ অতি পবিত্র নগরজ্ঞানে ইহাকে বিশেষ সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। জেরুজালেম মুসলিমগণেরও পবিত্র তীর্থস্থান। সুতরাং আবু ওবায়দা নগর অবরোধ করিয়া বসিয়া রহিলেন, নগরপ্রাচীর ধ্বংসের কোন চেষ্টা করিলেন না এবং নগরের শাসনকর্তাকে অনর্থক রক্তপাতের কারণ না ঘটাইয়া নগর সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

নগরের খৃস্টান শাসনকর্তা সেনাপতি আবু ওবায়দাকে সংবাদ পাঠাইলেন:

"স্বয়ং খলীফা উমরের হাতে আমি নগর সমর্পণ করিতে রাজী আছি; কিন্তু নগরের একটি প্রাণীও জীবিত থাকিতে স্বেচ্ছায় অন্য কাহারও কাছে নগর সমর্পণ করিব না।"

আবূ ওবায়দা সমস্ত বিবরণ লিখিয়া মদীনায় খলীফা উমর (রা.)-এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

পত্র পাইয়া খলীফা উমর (রা.) স্বয়ং জেরুজালেমে উপস্থিত হইবার সংকল্প করিলেন। অবিলম্বে যাত্রার আয়োজন হইল।

কিন্তু কি আয়োজন? যে মহাপরাক্রান্ত খলীফার অঙ্গুলি হেলনে তখন দিকে দিকে সম্রাটদের মুকুট খসিয়া পড়িতেছিল, তদানীন্তন জগতের সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রনায়ক একটি মাত্র উট ও একটি মাত্র রাখাল সঙ্গে লইয়া অতি সাধারণ বেশে জেরুজালেম যাত্রা করিলেন। মদীনা হইতে জেরুজালেম দুই শত মাইলেরও উপরের পথ। পথে কত কঠোর বিস্তীর্ণ মরুভূমি, কত বৃক্ষ-লতাহীন মরুপর্বত। সেই দুরূহ পথ ধরিয়া উমর (রা.) চলিলেন।

ঊর্ধ্বে নির্মেঘ নীলাকাশ প্রচণ্ড সূর্যের অগ্নিময় কিরণে পুড়িয়া তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, নিম্নে সীমাহীন বালুকাসমুদ্র মরুসূর্যের অগ্নিজ্বালায় স্ফুলিঙ্গময় অগ্নি-সমুদ্র হইয়া উঠিয়াছে, মাঝে মাঝে নির্মম সাইমুম তপ্ত নিঃশ্বাস ছড়াইয়া ছুটিতেছে; দিগন্তে শুধু ধুধু মরীচিকা-মায়া! এই দুর্গম পথ অতিবাহন করিয়া ইসলামের অদ্বিতীয় খলীফা চলিলেন।

সঙ্গে একটি মাত্র উট, একটি রাখাল। লাগাম ধরিয়া না টানিলে উট চলে না। যখন তিনি উটে ওঠেন রাখাল উটের লাগাম ধরিয়া টানিয়া আগে চলে। কিন্তু খলীফা ভাবেন, 'রাখালও মানুষ, তাঁহারই মত আল্লাহ্‌র বান্দা!' তিনি নিজে নামিয়া পড়েন, রাখালকে উটের উপর চড়াইয়া দেন, আর নিজে উটের লাগাম ধরিয়া আগে আগে চলেন। এমনিভাবে একের পর অপরে উটে চড়িয়া দিনের পর দিন, মঞ্জিলের পর মঞ্জিল রাস্তা অতিক্রম করিয়া খলীফা উমর (রা.) চলিলেন।

অবশেষে পথ ফুরাইয়া আসিল, খলীফা জেরুজালেমের সমীপবর্তী হইলেন। তাঁহার আগমন সম্ভাবনায় জেরুজালেমের খৃস্টান প্রতিনিধি ও আবূ ওবায়দা অগ্রসর হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দিগন্তে খলীফার উট দেখিয়া তাঁহারা উৎফুল্ল হইয়া অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইলেন।

খলীফার উট সমীপবর্তী হইল। তখন উটে চড়িবার পালা রাখালের আর উট টানিয়া লইয়া যাইবার পালা খলীফার। খলীফা পালা মত উটের লাগাম ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। খৃস্টান সম্বর্ধনাকারীরা রাখালকে অভিবাদন

করিতে যাইতেছিলেন; দোভাষী বুঝাইয়া দিল, উটের আরোহী খলীফা নহেন, উটের চালক খলীফা।

সহস্র সহস্র কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে খলীফা উটের লাগাম ছাড়িয়া নগরপতির হাত ধরিলেন, পরস্পরের মধ্যে সৌজন্যের বিনিময় হইল।

তারপর দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া জেরুজালেমের ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনা করিতে করিতে পবিত্র নগরে প্রবেশ করিলেন।

—হীরকহার

খৃস্টান সম্রাটের মুসলিম বন্ধু

কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট ক্যান্টাকিউজীন এবং আয়োনীয়ার তুর্ক সর্দার আমির ইবনে আইদীন পরস্পর বন্ধুত্বের সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

খৃস্টীয় ১৩৪৩ সাল। আমীর ক্যান্টাকিউজীনের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন: 'বন্ধু, আমার সম্মুখে সমূহ বিপদ—বিশ্বাসঘাতক উজীর ও সেনাপতিদের হাতে আমার জীবন বিপন্ন।'

আমীর তৎক্ষণাৎ তিন হাজার রণতরীর এক নৌবাহিনী এবং উনত্রিশ হাজার সৈন্যের এক স্থলবাহিনীসহ ভীষণ শীতের মধ্যেই কনস্টান্টিনোপল যাত্রা করিলেন।

সম্রাট আগেই সার্ভিয়ায় পলায়ন করিয়াছিলেন। এই সুযোগে বুলগেরিয়ানরা রাণীকে ডিমোটিকায় অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; আমীর তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন।

কৃতজ্ঞ রাণী আমীরকে উপযুক্ত সওগাত পাঠাইয়া অনুরোধ করিলেন: 'বাহিরে প্রচণ্ড শীত—আপনার জন্য নগরদ্বার মুক্ত, প্রাসাদকক্ষ সজ্জিত; আমিও আমার মুক্তিদাতাকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত।'

আমীর উত্তর দিলেন: 'আমার দুর্ভাগ্য, বন্ধু আজ দেশান্তরে; তিনি ফিরিয়া আসুন, আপনার সঙ্গে দেখা হইবে। আর, প্রাসাদকক্ষের আমন্ত্রণ? নগরের

বাহিরে আমার সঙ্গে এইক্ষণ যে কয় হাজার যোদ্ধা আছে, আমার মত তারা প্রত্যেকেই আপনার উদ্ধারের গৌরবের অধিকারী; প্রাসাদের দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যার চেয়ে ইহাদের সঙ্গে আকাশের শামিয়ানার তলে রাত্রি যাপনই আমার পক্ষে অধিকতর শোভনীয় ও লোভনীয়।

—গীবন

•

সবাই সমান

হযরত উমর (রা.) হজ্জ করিতে মক্কায় গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আছেন তাঁহার বন্ধু জাবালা। জাবালা এক ছোট্ট রাজ্যের রাজা। ছোট্ট রাজা হইলেও জাবালার প্রতাপে বাঘে-ছাগে এক ঘাটে পানি খায়।

কা'বার চারিদিকে তাওয়াফকালে একজন সাধারণ হজ্জযাত্রীর পায়ে হঠাৎ জাবালার চাদর জড়াইয়া গেল। ক্রুদ্ধ রাজা ফিরিয়া কোন কৈফিয়ত তলব না করিয়া অমনই লোকটিকে নিদারুণভাবে প্রহার করিলেন।

লোকটি খলীফার কাছে গিয়া নালিশ করিল। খলীফা জাবালাকে তলব করিলেন।

'জাবালা, তোমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ সত্য?'

'হাঁ, সত্য, এই হতভাগা আমার চাদর মাড়িয়াছে, আর আল্লাহ্‌র ঘরে আমাকে বে-আবরু করেছিল আর কি!'

'কিন্তু এ তো তার ইচ্ছাকৃত নয়, জাবালা, হঠাৎ অমন ঘটেছিলো।'

'ওসব আমি কিছু বুঝি না। কা'বার ঘরে না হলে ওকে আমি খুনই করে ফেলতাম : ওর ভাগ্যি যে ও কেবল মার খেয়ে বেঁচে গেছে।'

'চপলতা রাখ, জাবলা, কথা শোন।'

'বলুন।'

'তুমি নিজ মুখে অপরাধ স্বীকার করেছ—তোমার অন্যায় গুরুতর। যদি ফরিয়াদীর নিকট হতে ক্ষমা ভিক্ষা করে না নিতে পার, তবে তুমি যেমন তাঁকে মেরেছ সেও এই দরবারে তোমাকে তেমনি মারবে—এই আমার হুকুম।'

'কিন্তু আমি যে রাজা আর ও একটা সাধারণ লোক।'

'তোমরা দু'জনই মুসলমান, আল্লাহ্‌র কাছে সব মুসলমান সমান।'

—লেইনপুল

শহীদ জননী

হযরত খানসা (রা.) আরবের একজন বিখ্যাত মহিলা কবি ছিলেন। আরবী সাহিত্যের সমঝদার সমালোচকেরা এ বিষয়ে সকলে একমত যে তাঁহার পূর্বে বা পরে কোন মহিলা কবি তাঁহাকে কাব্য-প্রতিভায় ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই।

খানসা (রা.) তাঁহার কওমের কতিপয় লোকজনসহ মদীনায় আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। এখানে পরম শান্তিতে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

খলীফা উমর (রা.)-এর আমল। কাদেছীয়ার ময়দানে রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল। পারস্য-সম্রাট ইয়াজদার্দ চাহিলেন, ইসলাম ধর্ম ও ইসলামের এই নূতন রাজ্যকে দুনিয়ার বুক হইতে মুছিয়া ফেলিবেন। ইসলামের নায়ক হযরত উমর (রা.) বলিলেন, 'জান কবুল করিয়াও আমরা ইসলামের ইজ্জত রক্ষা করিব—সত্যকে জয়যুক্ত করিব।'

দলে দলে মুসলিম স্বেচ্ছাসেবক কাদেছীয়ার দিকে তলোয়ার হাতে ছুটিল। সে দুর্দিনে কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়া খানসা তাঁহার চারি পুত্রসহ কাদেছীয়ায় গিয়া উপস্থিত হইল।

যুদ্ধের আগের দিন। খানসা (রা.) তাঁহার পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বাছারা, আমি তোমাদেরে পেটে ধরেছি, লালন পালন করেছি। এখন তোমরা বড় হয়েছ। আমি কোনও বিষয়ে তোমাদের পরিবারের সম্মান লাঘব করি নাই, তোমাদের কওমের ইজ্জত নষ্ট করি নাই। আমি তোমাদের পিতার গৌরব সযত্নে রক্ষা করে আসছি। আর তোমাদের মাতার চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে কেহই সন্দেহের লেশ মাত্র প্রকাশ করতে পারবে না।—কেমন, আমি এসব ঠিক বলছি?'

পুত্রেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, 'হাঁ, ঠিক বলেছেন, মা, সম্পূর্ণ ঠিক বলেছেন।

খানসা (রা.) বলিতে লাগিলেন, 'তবে এখন আমার একটা কথা শোন! জিহাদের অফুরন্ত সওয়াবের কথা একবার স্মরণ কর, আর বিপদকালে ধৈর্য অবলম্বনের জন্য ইসলামের যে নির্দেশ তার কথা ভাব।'

'তা স্মরণ রাখব, মা, নিশ্চয় রাখব, তোমার উপদেশ তো আমরা কোনো দিন অমান্য করি নাই।'

'হাঁ, অমান্য কর নাই। কেন করবে? সতীমা কি তোমাদের জঠরে ধারণ করে নাই? আচ্ছা, এখন শোন, কাল খুব ভোরে শয্যাত্যাগ করেই আল্লাহ্‌র নামে শান্তচিত্তে দুর্জয় সাহসে জিহাদে যোগ দিবে।'

'তাই হবে, মা। তোমার আদেশ আমরা কখনো লংঘন করি নাই, এখনও করব না।'

'কিন্তু কেবল তাই নয়, পুত্রগণ, বীরসন্তানের মত যুদ্ধ করা চাই। যেখানে যুদ্ধ সবচেয়ে নির্মম সেইখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপর যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়, শহীদের শয্যা গ্রহণ করতে একটুও ইতস্তত করবে না।'

পরদিন পুত্রেরা যুদ্ধে গেল এবং অসম সাহসে সংগ্রাম করিয়া একে একে সকলেই কাদেছীয়ার বুকে অনন্ত নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িল।

এ সংবাদ পাইয়া জননী খানসা (রা.) দুই হাত উর্ধ্বে তুলিয়া বলিলেন, 'দয়াময় আল্লাহ্‌, তুমি যে আমাকে শহীদের জননী হওয়ার এই ইজ্জত দান করলে, কেমন করে আমি তার শুক্‌রিয়া আদায় করব?'

—জাকারীয়া

বড় দাতা কে?

কা'বা মসজিদে বসিয়া একদা তিনজন যুবক বন্ধু তুমুল তর্কে মাতিয়া উঠিল। তর্কের বিষয়, মক্কা শরীফে সবচেয়ে বড় দাতা কে?

একজন বলিল, 'জাফরের পৌত্র আবদুল্লার মত দাতা আর কেহই নাই।' দ্বিতীয়জন বলিল, 'কায়েছ্ বিন সাঈদের মত দাতা আমার চোখে কখনো পড়ে নাই।' তৃতীয়জন বলিল, 'বুড়ো শেখ আরাবা,—আহা! তার মত দাতা আর হয় না।'

তর্ক ক্রমে বিতর্কে এবং বিতর্ক ক্রমে বিতণ্ডায় পরিণত হইল। ইহার পর যুবকেরা কোষ হইতে তলোয়ার খোলে আর কি!

একজন দর্শক বলিল, 'বন্ধুগণ, ঝগড়া না করে একটা কাজ কর না। তোমরা এক একজন একজন দাতার কাছে যাও, কিছু চাও, কে কি বলে শোন, তারপর এখানে ফিরে এস, আমরা সব কথা বিচার করে রায় দিব, কে এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দাতা।'

একথা সকলের মনঃপুত হইল। তখনই তিনজন যুবক তিনদিকে ছুটিল।

দীর্ঘ সফরে যাত্রার জন্য তৈয়ার হইয়া আবদুল্লাহ্ উটে চড়িতে যাইতেছিল, এমন সময় প্রথম বন্ধু যাইয়া বলিল, 'হে দানবীর, আমি সফরে যাব, যানবাহন কিছু নাই, কি করি?' আবদুল্লাহ্ কহিল, 'বেশ, তাহলে আমার এই সাজানো উট তুমি নিয়ে যাও।' বন্ধু সাজানো উট লইয়া আসার পথে দেখিল, তাহার সাজের ভিতর লুক্কায়িত আছে পাঁচ হাজার আশরফী।

দ্বিতীয় বন্ধু কায়েছের সঙ্গে দেখা করিল। কায়েছের চাকর বলিল, 'আমার মনিব ঘুমে আছেন। আপনি কি মনে করে এসেছেন বলুন।' বন্ধুটি কহিল, 'আমি বড় অভাবগ্রস্ত, তাই কিছু সাহায্যের জন্য এসেছিলাম।' চাকরটি বলিল, 'আমার মনীবকে এখন জাগালে তাঁর কষ্ট হবে, তাঁকে জাগানোর চেয়ে বরং আপনাকে আমিই কিছু দেই।' তখন ঘরে মাত্র দশ হাজার আশরফী ছিল, চাকর বন্ধুকে দিয়া বলিল, 'এই চিহ্ন নিয়ে বাগানবাড়ী যান, সেখান হতে একটি উট ও একজন দাস নিবেন।' কায়েছ জাগিলে চাকর সব কথা বলিল। মনিব শুনিয়া এত খুশী হইলেন যে তিনি তখনই চাকরটিকে আযাদী দিয়া দিলেন এবং অভিযোগের সুরে বলিলেন, 'আহা আমাকে ডাকলে না; ডাকলে আমি আরো দিতে পারতাম।'

তৃতীয় বন্ধু শেখ আরাবার কাছে গেল। শেখ আরাবা যোহরের নামায পড়ার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কা'বার দিকে রওনা হইয়াছেন, এমন সময় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নিতান্ত ক্ষীণ হওয়ায় দুই পাশের দুইজন দাসের কাঁধের উপর ভর দিয়া তিনি পথ চলিতেছিলেন। বন্ধু নিজ অভাবের কথা তাঁহাকে জানাইলে তিনি দাস দুইটির কাঁধ হইতে হাত তুলিয়া লইলেন এবং তাঁহার হাতে তখন টাকা না থাকার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন, 'ভাই, মেহেরবানী করে এই দাস দুটিকে নিয়ে যাও।' বন্ধু দাস দুইটিকে নিতে অস্বীকার করিল তখন আরাবা ফের আফ্সোস করিয়া বলিলেন, 'যাক, যখন আপনি ওদের নিবেন না, আর আমিও ওদেরকে ছেড়ে দেওয়ার কথা মুখে বার করেছি, তখন ওদেরকে আমি আযাদ করে দিলাম'।

এই কথা বলিয়া শেখ আরাবা দাস দুইটিকে ছাড়িয়া দিয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে দেওয়াল ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

বন্ধু তিনজন কা'বা মসজিদে ফিরিয়া নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিল। সকলে সমবেত ভাবে রায় দিল, 'আরাবাই সবচেয়ে বড় দাতা।'

—টমাস

•

অশোকের দীক্ষা

[১]

(মগধের রাজদরবার)

নকীব—সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর সম্রাট অশোক—হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার।

(অশোকের প্রবেশ)

অশোক—সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর—এই কথা হেঁকে বলছিলে না, নকীব?

নকীব—(থতমত খেয়ে) বান্দার গোস্তাখী মাফ হয়, সম্রাট, তাই বলছিলাম।

অশোক—তোমার আর দোষ কি, নকীব? দেশসুদ্ধ লোকেইত একথা বলে।

নকীব—তারা সত্য বলে, সম্রাট।

অশোক—(সদর্পদাপে) তারা সবাই মিথ্যা বলে, জঘন্য মিথ্যা!

নকীব—(থতমত খেয়ে) বান্দার গোস্তাখী মাফ হয়, সম্রাট।

অশোক—ওরা সবাই মিথ্যা বলে আমায় ভুলিয়ে রেখেছে। নইলে ক্ষুদ্র কলিঙ্গ রাজ্য, তার ক্ষুদ্র রাজা, সেই তুচ্ছ কীট, তার গর্বোদ্ধত মস্তক উন্নত করে মগধের সম্রাটকে বলে 'যুদ্ধংদেহী'?

সেনাপতি—(প্রবেশান্তে) জয়, সম্রাট অশোকের জয়!

অশোক—ফের একটা মিথ্যা অভিনয়, সেনাপতি? কলিঙ্গরাজ মাথা উঁচু করে 'যুদ্ধংদেহী' বলে দাঁড়ায় মগধের সম্রাটের সামনে, তবু—তবু মগধ-সম্রাটের জয়গান?

সেনাপতি—পিপীলিকার পাখা হয়েছে সম্রাট, নিশ্চয় মরবে।

অশোক—কিন্তু কবে মরবে?

সেনাপতি—শিগ্‌গিরই—সম্রাটের হুকুম হলেই।

অশোক—বেশ, সে হুকুম আমি দিচ্ছি,—কিন্তু কলিঙ্গরাজের প্রাসাদ চূড়া চূর্ণ হয়ে পথের ধূলায় মিশে গেছে—এ আমি নিজ চোখে দেখতে চাই, সেনাপতি; আর সেই জন্য আমি নিজেই এ অভিযানের চালক হব।

[২]

(কলিঙ্গ—লড়াইয়ের ময়দানে শিবির)

অশোক—সেনাপতি?

সেনাপতি—সম্রাট!

অশোক—তবে লড়াই আমাদের ফতে হল?

সেনাপতি—সম্পূর্ণ ফতে।

অশোক—কলিঙ্গরাজ?

সেনাপতি—যুদ্ধে নিহত।

অশোক—তাঁর মহিষী?

সেনাপতি—আহত।

অশোক—রাজকুমারেরা?

সেনাপতি—নিরুদ্দেশ, হয়তো কোথাও মরে পড়ে আছে।

অশোক—রাজকুমারীরা?

সেনাপতি—বন্দিনী।

অশোক—তবে লড়াই আমাদের সম্পূর্ণ ফতে?

সেনাপতি—তাই, সম্রাট।

অশোক—আচ্ছা, যাও, বিজয় উৎসবের আয়োজন কর।

সেনাপতি—যো হুকুম। (নিষ্ক্রমণ)

অশোক—ওঃ! এত রক্ত! ঘোড়ার খুর ডুবে যাচ্ছিল রক্তের স্রোতে!······ পাহারাওয়ালা?

পাহারাওয়ালা—সম্রাট, বান্দা হাযির।

অশোক—সেনাপতিকে বোলাও।

পাহারাওয়ালা—যো হুকুম। (নিষ্ক্রমণ)

অশোক—লড়াই ফতে হল, কিন্তু এত রক্তের বিনিময়ে।

সেনাপতি—(প্রবেশান্তে) সম্রাটের জয় হোক!

অশোক—সেনাপতি, আচ্ছা, লড়াইয়ে ওরা মরল কতজন।

সেনাপতি—ওরা মরেছে এক লাখ!

অশোক—আর?

সেনাপতি—আর বন্দী হয়েছে প্রায় দেড় লাখ।

অশোক—আচ্ছা যাও।

সেনাপতি—যো হুকুম। (সেনাপতি গমনোদ্যত)

অশোক—আচ্ছা, একটু দাঁড়াওতো সেনাপতি।

সেনাপতি—যো হুকুম।

অশোক—আচ্ছা, ঐ যে লড়াইয়ের ময়দানে আবার কান্না শুনছি, ও কারা?

সেনাপতি—ওরা নিহতদের আত্মীয়স্বজন: কেউ মা, কেউ বোন, কেউ স্ত্রী, কেউবা কন্যা।

অশোক—কিন্তু ওরা কাঁদে কেন? যারা মরে গেছে তারা তো আর ফিরবে না?

সেনাপতি—কিন্তু ওরা ত কেবল নিজেরা মরে নাই, সম্রাট, ওরা যে এদেরও মেরে গেছে।

অশোক—তার মানে?

সেনাপতি—রোজগার করে খাওয়াবার মত এদের তো আর কেউ রইল না।

অশোক—এরা তাহলে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বাকী জীবন কাটাবে?

সেনাপতি—তাই সম্রাট!

অশোক—অভাগিনীর দল! এরা বেঁচেও মৃত!

সেনাপতি—এক্ষণে সম্রাটের হুকুম?

অশোক—হু—কু—ম। আচ্ছা সেনাপতি, এ আমাদের খুব একটা মস্ত জয় হল, কি বল?

সেনাপতি—এতে একটুও সন্দেহ নাই, সম্রাট।

অশোক—আচ্ছা কত দামে এই জয়কে খরিদ করতে হল?

সেনাপতি—বুঝতে পাচ্ছি না, সম্রাট!

অশোক—এই ধর, ওরা মারল আমাদের ৫০ হাজার, আমরা মারলাম ওদের এক লাখ, আহত দেড় লাখ, বন্দী দেড় লাখ, এদের সবার পোষ্য ধর এদের তিনগুণ, দাঁড়াল পনর লাখ?

সেনাপতি—তাই, সম্রাট।

অশোক—তাহলে এই পনর লাখ মানুষের বিনিময়ে আমি করলাম কলিঙ্গ বিজয়।

সেনাপতি—যুদ্ধে চিরদিনই এমনি হয়ে এসেছে, সম্রাট।

অশোক—তাই বিজয় উৎসব করতে চাও?

সেনাপতি—সম্রাটের যদি অনুমতি হয়।

অশোক—আচ্ছা যাও, যোগাড় কর।

সেনাপতি—যো হুকুম। (গমনোদ্যত)

অশোক—সেনাপতি, সেনাপতি! ফের একটু শুনে যাও।

সেনাপতি—(ফিরে) সম্রাটের জয় হোক!

অশোক—সেনাপতি, এই পনর লাখ লোককে তো আমরাই মেরেছি, কি বল?

সেনাপতি—তা ঠিক, সম্রাট।

অশোক—আচ্ছা, কেন এদের মারলাম? এরা এদের দেশকে ভালবাসে এই অপরাধে তো? বল, সেনাপতি বল, চুপ কেন?

সেনাপতি—এরা সম্রাটের বশ্যতা স্বীকারে অসম্মত হয়েছিল?

অশোক—আচ্ছা সেনাপতি, বলতে পার আমাদের পক্ষে দেশপ্রেম যদি পুণ্য হয়, তবে ওদের পক্ষে দেশপ্রেম পাপ হবে কেন?

সেনাপতি—চিরকাল এই-ই তো চলে এসেছে, সম্রাট।

অশোক—ফের চিরকাল—চিরকাল—চিরকাল। সব যুক্তির সার হল চিরকাল। আচ্ছা তবে চিরকালেরই জয় হোক। যাও, উৎসবের আয়োজন শুরু কর।

সেনাপতি—যো হুকুম, সম্রাট! (গমনোদ্যত)

অশোক—সেনাপতি! সেনাপতি!

সেনাপতি—সম্রাটের জয় হোক!

অশোক—আচ্ছা, সেনাপতি, কখনও কোন মানুষকে জান দিয়েছ?

সেনাপতি—না, সম্রাট, তা দেই নাই।

অশোক—আর কেউ কোথাও দিয়েছে জান?

সেনাপতি—কখনো শুনি নাই।

অশোক—যে দেয় সে ফিরিয়ে নিতে পারে—ভগবান সৃষ্টি করেন, তাই ধ্বংসে তাঁর অধিকার। আচ্ছা বলতে পার, সেনাপতি, যে ব্যক্তি একটি মানুষকে বাঁচাতে পারে না, সে মানুষ মারবার অধিকার কোথায় পেল?

সেনাপতি—সম্রাটের কি বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিব?

অশোক—হাঃ—হাঃ—হাঃ! প্রশ্নটা বড় অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছে, না?

সেনাপতি—আমি সম্রাটের বিশ্রামের প্রয়োজন বোধ করেছিলাম মাত্র।

অশোক—সেই চিরকালের কথাই আবার বলছ, সেনাপতি। আমার প্রশ্নটা অসুবিধাজনক বলে আমাকে বিশ্রাম নিতে বলছ প্রাসাদে, সাধারণ প্রজা হলে তাকে বিশ্রাম নিতে বলতে জেলখানায়।

সেনাপতি—তবে আমি নিরুত্তর, সম্রাট!

অশোক—অগত্যা। আচ্ছা যাও। কিন্তু শোন, আর উৎসবের আয়োজন কর না।

সেনাপতি—যো হুকুম। (নিষ্ক্রমণ)

অশোক—আবার অভাগিনীদের সেই বুকফাটা কান্না ভেসে আসছে। মানুষ তো দেখি না, তবু এ কান্না কোথা হতে আসে? তবে কি রক্ত কাঁদতে জানে? ওর অণুতে পরমাণুতে ব্যথার রাগিনী বাজে? কই? কান্না তো কিছুতেই থামছে না! ও কান্না কি আমার কানের ভিতরে বাসা বেঁধে বসল? হায় বিজয়! হায় সর্বনাশা বিজয়!!

[গান]

আকাশে বাতাসে কেঁদে ফিরে আজ রক্তের ফরিয়াদ
অশ্রুর মেঘে ঢেকে মুছে যায় বিজয়ের নব চাঁদ
মনের অকূল পাথার দরিয়া
বেদনায় আজ উঠেছে দুলিয়া
আছাড়িয়া পড়ে নয়নের কূলে বিলাপের প্রতিঘাত।

রণজয় নহে, নর জয় সে যে মানব শোণিত পান,
হিংস্র পিপাসা জাগে যার মনে সেই করে অভিযান,
মনোজয়ে বাড়ে রাজার আসন
রণজয়ে শুধু আত্ম নাশন
মনোজয়ে জমে প্রীতির বাঁধন, রণজয় সাধে বাদ।

[৩]

(মগধ রাজ্য—সাধারণ রাজপথ)

নকীব—ঘুমের ঔষধ খুঁজি—ঘুমের ঔষধ—কে জান, ভাই, ঘুমের ঔষধ?

পথিক—এ কি গো? ঘুমের ঔষধের জন্য এত হাঁকাহাঁকি কেন?

নকীব—জান ভাই, ঘুমের ঔষধ? একটু দিবে?

পথিক—কেন ভাই, কি করে ঘুম হারালে তুমি?

নকীব—আমি নয়, আরে ভাই, আমি নয়; আর একজনের ঘুম হারিয়ে গেছে।

পথিক—তবে তার জন্য তোমার এত মাথা ব্যথা কেন, বন্ধু?

নকীব—মাথা ব্যথা হবে না? আরে ঔষধ না নিয়ে গেলে যে ঘাড়ে এ মাথাটি থাক্‌বে না।

পথিক—বল কি ? এত বড় রোগীটা কে, ভাই ?
নকীব—রোগী স্বয়ং সম্রাট অশোক।
পথিক—ওরে বাপরে, বাপ! শুনেই কলজে কেঁপে উঠছে।
নকীব—ঐখানেইত বিপদ রে ভাই ; রোগীর নাম শুনে আমরা কাঁপি, তোমরা কাঁপ, কাঁপে না শুধু রোগ নিজে।
পথিক—আচ্ছা, মাথায় মধ্যম-নারায়ণ তেল খুব করে মাখাও না কেন ?
নকীব—মধ্যম-নারায়ণ মাখতে মাখতে সম্রাটের মাথার অর্ধেক চুল উঠে গেছে।
পথিক—বটে! আচ্ছা, ঘুমের ঔষধ খাইয়েছো ?
নকীব—ঔষধ খাওয়াতে খাওয়াতে রাজবৈদ্যের ভাণ্ডার উজাড়।
পথিক—এখন রাজবৈদ্যকে বেঁটে খাইয়ে দাও।
নকীব—তাতেও ভাল হলে তো রক্ষা ছিল, এ গরীবদের মাথা বেঁচে যেত !
পথিক—ঐ দেখ কে আসছে ; ওঁর কাছে জিজ্ঞেস কর!
নকীব—কে উনি ?
পথিক—উনি যে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত ; এ রাজ্যে ওঁর মত বড় ঋষি কেইবা আছে ?

(সন্ন্যাসীর আবির্ভাব)

নকীব—সন্ন্যাসী বাবা, পেন্নাম হই—একটু ঘুমের ঔষধ দিতে পারেন ?
উপগুপ্ত—ঘুমের ঔষধ ?
নকীব—হাঁ, তাবিজ, কবজ, পানিপড়া, অষ্টবজরসারন, তন্ত্রমন্ত্র, যা কিছু হয় দিন, সাধু বাবা, আপনার পায়ে পড়ি। (পায়ে পড়তে উদ্যত)
উপগুপ্ত—(টেনে তুলে) কি হয়েছে, বৎস, একটু খুলে বল, শুনি।
নকীব—সম্রাট অশোকের ঘুম নাই—তারই ঔষধ কুড়াতে বেরিয়েছি—না নিয়ে ফিরলে মাথা থাক্‌বে না, বাবা, মাথা থাক্‌বে না।
উপগুপ্ত—বাঃ, ঘুমের পাখীকে খাচা ভেঙ্গে উড়িয়ে দিলেন উনি, আর মাথা যাবে তোমাদের, এ কেমন কথা ?
নকীব—তাই তো হয়, সন্ন্যাসী-মহারাজ, রাজরাজড়াদের দরবারে তো তাই হয়। একটু কিছু দিবেন, সাধু বাবা ?
উপগুপ্ত—কিন্তু রোগী না দেখে ঔষধ কেমন করে দেই ?
নকীব—তবে চলুন, সন্ন্যাসী মহারাজ, দয়া করে চলুন।
উপগুপ্ত—বেশ, চল।

[৪]

(নগর রাজদরবার)

অশোক—মন্ত্রী রাজ্যে সমস্ত বলি বন্ধ করে দিন।

মন্ত্রী—বলি বন্ধ করে দিব, সম্রাট

অশোক—হাঁ, বলি বন্ধ করে দিন। যেখানে যত বলির মন্দির আছে, আজ থেকে তার সব দুয়ার বন্ধ হয়ে যাক।

মন্ত্রী—কিন্তু দেশের পূজারী, পুরোহিত, জনগণ সবাই যে ক্ষুব্ধ হবে সম্রাট ?

অশোক—আমি সবাইকে বুঝিয়ে বলব; জীবহত্যায় ধর্ম নাই—ধর্ম আছে অহিংসায়।

মন্ত্রী—কিন্তু এ তো আমাদের ধর্ম নয়, সম্রাট, এ যে বৌদ্ধদের ধর্ম।

অশোক—অহিংসা পরম ধর্ম—এ আমার, তোমার, শাক্যমুনির, কারো নিজস্ব ধর্ম নয়, মন্ত্রী, এ মানুষের ধর্ম। এই অহিংসাতেই পরম শান্তি। আমি নিজ জীবনে সে শান্তি পেয়েছি।

মন্ত্রী—পেয়েছেন, সম্রাট ? সত্যিকার শান্তি পেয়েছেন ?

অশোক—পরম শান্তি পেয়েছি। কলিঙ্গের ময়দানে লড়াই ফতে করেছিলাম, মন্ত্রী, কিন্তু জীবনের শান্তি হারিয়েছিলাম—রক্তের দরিয়ায় সেই যে মানুষের কাটা মুণ্ডু ভেসে যেতে দেখলাম, আর সেই যে শুনলাম আহতের আর্তনাদ, নিহতদের মা-বোনের করুণ বিলাপ, সে আর কিছুতেই ভুলতে পারলাম না—আঁখিপল্লব মুদ্রিত হওয়া মাত্র চোখের সামনে ভেসে উঠত সেই নিদারুণ ছবি। তারপর ভয় পেয়ে ঘুম যে কোথায় পালিয়ে যেত, আর তার পাত্তা পাওয়া যেত না।

মন্ত্রী—তারপর ?

অশোক—তারপর চল্‌লো যাগযজ্ঞ, অসংখ্য বলি, মন্দিরপ্রাঙ্গণ রক্তে ভেসে গেল। রাজবৈদ্যের ভাণ্ডার শূন্য হয়ে পড়ল, কিন্তু আমার মনে শান্তি ফিরে এলো না, আমার চোখে ঘুমের পরশ নামল না।

মন্ত্রী—সে তো জানি, সম্রাট।

অশোক—তারপর এলেন আমার দরবারে সন্ন্যাসী উপগুপ্ত, তিনি কি বল্‌লেন শুনবেন, মন্ত্রী ?

মন্ত্রী—সম্রাট, আজ্ঞা করুন।

অশোক—তিনি বল্‌লেন, শরীরের যে অংশ আগুনে পুড়ে গেছে, সেখানে ফের আগুন প্রয়োগে কি যন্ত্রণার কোন উপশম হয় ?

মন্ত্রী—তা হয় না, সম্রাট।

অশোক—তেমনি কলিঙ্গের ময়দানে রক্তস্রোতে ভেসে গেল আমার যে শান্তি, মন্দিরের অঙ্গনে আবার রক্তস্রোত বইয়ে সে শান্তিকে তো ফিরিয়ে আনা যায় না।

মন্ত্রী—তা যায় না, সম্রাট।

অশোক—তাই অহিংসাকেই গ্রহণ করলাম আমার ধর্মের মূলনীতি হিসাবে; প্রাণী মাত্রকেই ভালবাসতে সংকল্প করলাম। অমনি ফিরে পেলাম আমার সুখ—আমার শান্তি।

মন্ত্রী—বিশ্বপ্রেমের শক্তি অদ্ভুত, সম্রাট।

অশোক—তাই পণ করেছি, মন্ত্রী; বাকী জীবন পীড়া দিয়ে নয়—প্রেম দিয়ে মানুষের চিত্ত জয়ের সাধনা করব—সর্বজীব হবে সে প্রেমের ভাগী।

মন্ত্রী—মহৎ সংকল্প সম্রাটের।

অশোক—দেশে দেশে পাঠাব—সৈন্য বা সেনাপতি নয়—শান্তির দূত। তারা প্রচার করে দিবে শাক্যসিংহের সেই অমর বাণী—অহিংসা পরম ধর্ম। পর্বতের গায়ে খোদিত করে দিব সেই অমৃতময়ী বাণী—গিরি-নির্ঝর তারই উপর চল্‌তে চল্‌তে ছলছলিয়ে উঠবে—অহিংসা পরম ধর্ম; গাছের ডালে পাখীরা সে কলতান শুনে আনন্দে গেয়ে উঠবে—অহিংসা পরম ধর্ম; ভ্রমরেরা সহসা মধু পান বন্ধ করে ফুলদের কানে কানে গুনগুনিয়ে উঠবে—অহিংসা পরম ধর্ম। উতলা আকাশ সে মহাবাণীর গীতি-তরঙ্গ বয়ে নিয়ে ছুটবে উর্ধ্বলোকে—সেখানে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-উপগ্রহের বুকে ঝলমলিয়ে উঠবে উন্মত্ত পুলক শিহরণ! ওঃ ধর্মজগতে সে যে কি অপূর্ব স্বর্ণ-যুগের আবির্ভাব হবে মন্ত্রী, তা ভেবে আনন্দে আমার গা শিউরে উঠছে। সার্থক আমার গুরুর কৃপা। সার্থক আমার দীক্ষা।

[গান]

মহাশান্তির জ্যোতিঃ এল নেমে ভুবন গগন ছাপিয়া।
নবনন্দন কাননের ছায়া মর্ত্যে উঠিছে কাঁপিয়া ॥
ধরণীতে আর রবে না বিলোপ,
গেল অশান্তি, গেল অভিশাপ,
এল জীবনের পরম কাম্য প্রশান্তি হিয়া ব্যাপিয়া ॥

পরম ধর্ম অহিংসা জাগে—হিংসার অবসান হে,
মানবমনের পশু গেল দূরে—মানবতা পেল ত্রাণ হে।
দিকে দিকে যাবে নব অভিযান
উঠিবে রণিয়া নির্বাণ গান,
নতুন রাজ্য জাগিবে ভুবনে শান্তি সলিলে নাহিয়া ॥

দরবেশের আস্তানায় সুলতান মাহ্‌মুদ

সমরকন্দের শহরতলীতে অবস্থিত খারকান। এই স্থানে বাস করিতেন বিখ্যাত দরবেশ শেখ আবুল হাসান।

একদা সুলতান মাহ্‌মুদ এই দরবেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার আস্তানার নিকট গিয়া সংবাদ পাঠাইলেন, যেন দরবেশ আস্তানা হইতে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন।

দূতমুখে সুলতানের ফরমান শুনিয়া দরবেশ বলিলেন, "আমি বিশ্ব-নিরঞ্জন মহান সুলতানের আদেশ পালনে এত ব্যস্ত যে দুনিয়ার ছোট ছোট সুলতানের আদেশ পালনের জন্য আমার সময় নাই।"

দূত ফিরিয়া আসিয়া সুলতানকে দরবেশের উত্তর জানাইল। সুলতান মুগ্ধ হইলেন, বলিলেন, "চল, আমরাই তাঁর কাছে যাই, তাঁকে যেমন মনে করে-ছিলাম, তিনি তেমন নহেন।"

সুলতান দরবেশের কুটিরে যাইয়া বলিলেন, "আস্‌সালামু আলাইকুম।" দরবেশ পরম সৌজন্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "ওয়া আলাইকুম আস্‌সালাম।" কিন্তু তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিলেন না।

সুলতান কিছু উপদেশ চাহিলেন। দরবেশ বলিলেন, "অনাড়ম্বর জীবন, সংযত মন, মসজিদে গিয়া জামায়াতে নামায, দানশীলতা এবং প্রজা-প্রেম—আপনার জন্য এই-ই আমার সর্ব উপদেশের সার।"

সুলতান আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন। দরবেশ বলিলেন, "পরিণামে আপনি যেন সত্যিকার মাহমুদ (প্রশংসিত) হন।"

সুলতান দরবেশের সামনে আশরফির একটি তোড়া নজর স্বরূপ রাখিলেন। দরবেশ একটি শুকনা শক্ত বার্লি রুটি বাহির করিয়া সুলতানকে বলিলেন, "ভক্ষণ করুন।" সুলতান খানিকটা ভাঙ্গিয়া চিবাইলেন কিন্তু গিলিতে পারিলেন না। দরবেশ বলিলেন, "আপনার কাছে ঐ শুষ্ক রুটিখণ্ড যেরূপ, আমার কাছে এই আশরফিও ঠিক সেইরূপ। অতএব, তোড়াটা লইয়া গিয়া দরিদ্রদের মধ্যে মোহর-গুলি বিতরণ করিয়া দিন।"

—আহমদ

মহত্ত্বে উথলি উঠে মহত্ত্ব জোয়ার

মিসরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া—সিরিয়ার পরাজিত খৃস্টান সৈন্যগণ মুসলিম বিজয়তরঙ্গ প্রতিরোধ করিতে এখানে তাঁহাদের সমস্ত ক্ষাত্রশক্তি কেন্দ্রী-ভূত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; কিন্তু 'আমর ইবনুল 'আসের দুর্জয় শক্তির সম্মুখে আলেকজান্দ্রিয়াকেও মস্তক নত করিতে হইয়াছে। বিজয়ী সেনাপতি মিসরের শাসনভার গ্রহণ করতঃ তথাকার খৃস্টান অধিবাসীগণকে সর্বপ্রকার ধর্মীয় স্বাধী-নতার অভয় বাণীতে আশ্বস্ত করিয়াছেন।

একদিন প্রভাতে খৃস্টান মহল্লায় বিপুল চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইল; বিক্ষুব্ধ অধিবাসিগণ দলে দলে শহরের চকবাজারে সমবেত হইল, উত্তেজনাময়ী বক্তৃতা করিল এবং একটি প্রতিনিধি দল গঠন করতঃ প্রধান বিশপের অধিনায়কত্বে 'আমরের গৃহে উপস্থিত হইল। 'আমর সসম্মানে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করি-লেন।

বিশপ 'আমরের নিকট খৃস্টান অধিবাসীদের বিক্ষোভের কারণ বিবৃত করিলেন। উপরোক্ত বাজারে যীশু খৃস্টের একটি প্রস্তর মূর্তি ছিল। খৃস্টানগণ পরম ভক্তির সহিত ঐ মূর্তির পূজা করিত। পূর্ব দিবাগত রাত্রিতে কে সেই মূর্তির নাসিকাভঙ্গ করিয়া লইয়া গিয়াছে। খৃস্টানগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে কোন মুসলমান ভিন্ন এ কাজ অন্য কেহ করে নাই।

'আমর ইবনুল 'আসও ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন এবং বিশপকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি পরম মর্মাহত ও লজ্জিত হলাম। ইসলাম প্রতিমা

নির্মাণ বা প্রতিমাপূজা সমর্থন করে না সত্য, কিন্তু অন্যের উপাস্য দেবদেবীর অবমাননাও সমর্থন করে না। আপনারা প্রতিমাটি মেরামত করে নিন, আমি সমস্ত খরচ দিয়ে দিচ্ছি।" বিশপ বলিলেন, "কিন্তু মেরামত করা অসম্ভব। কারণ মূর্তিটিতে নূতন নাসিকা বসান সাধ্যায়ত্ত নয়।" 'আমর পুনরায় বলিলেন, "বেশ, তবে আপনারা সমগ্র মূর্তিটির ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করুন; আপনারা যে ক্ষতি নির্দেশ করবেন আমি তাই দিব।" বিশপ ইহাতে সম্মত না হইয়া বলি-লেন, "দেখুন, আমরা যীশুকে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে বিশ্বাস করি, সুতরাং তাঁর মূর্তির অপমানের ক্ষতিপূরণ তুচ্ছ টাকা-পয়সায় হতে পারে না। এর একটা মাত্র ক্ষতিপূরণ সম্ভব; আমরা আপনাদের পয়গম্বরের প্রতিমূর্তি গঠন করে নিয়ে তার নাসিকা ভেঙ্গে ফেলব।"

আকস্মিক অগ্নিসংযোগে বারুদ স্তূপ যেমন জ্বলিয়া উঠে, 'আমরের মুখ-মণ্ডল সহসা তেমনই জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে যেন রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, হাত অজ্ঞাতসারে বার বার তলোয়ারের মুঠা চাপিয়া ধরিতে লাগিল, পরক্ষণেই আবার তিনি জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইতে লাগিলেন। 'আমর আসন ত্যাগ করিয়া কিছুক্ষণ দ্রুত পায়-চারি করিলেন, তৎপর ঠাণ্ডা পানি আনাইয়া চোখ-মুখ ধুইয়া ফেলিলেন। তিনি তখন শান্ত বিষণ্ণ স্বরে বিশপকে বলিলেন, "যে মহাপুরুষ আমরণ মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এক আল্লাহ্‌র উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁরই মূর্তি তাঁরই ভক্ত অনুচরদের সম্মুখে নির্মিত হবে, আর অপমানের সঙ্গে বিখণ্ডিত হবে, তার আগে আমাদের ধন-মান সন্তান-সন্ততি এমনকি আমাদের প্রাণ বিনাশ হয়ে যাওয়া শ্রেয়। বিশপ ······আপনি অন্য যে-কোন প্রস্তাব করুন, আমি গ্রহণ করতে রাজী, এমন কি প্রতিমার নাসিকার পরিবর্তে যদি আমাদের কারো নাসিকা কেটে দিতে হয়, তাতেও আমি অসম্মত নই।"

বিশপ শেষোক্ত প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করিলেন।

পরদিন পূর্বাহ্নে দলে দলে খৃস্টান ও মুসলমান ময়দানে যাইয়া সমবেত হইতে লাগিল, এই প্রকাশ্যস্থলে খৃস্টানগণ তাহাদের ধর্মের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে।

'আমর উপস্থিত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন তৎপর তিনি বিশপকে সম্মুখে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনি খৃস্টানগণের প্রতি-নিধি, আমিও মুসলিমগণের প্রতিনিধি। এদেশের শাসনভার আমার উপর, সে শাসনের ত্রুটিতে যদি আপনাদের ধর্মের কোন অবমাননা হয়ে থাকে, তবে তার

শাস্তি আমাকেই গ্রহণ করতে হবে। এই তলোয়ার নিন। আপনি অসঙ্কোচে আমার নাসিকা ছেদন করুন।" বলিতে বলিতে 'আমর বিশপের হাতে তলোয়ার তুলিয়া দিলেন।

বিশপ তলোয়ার হাতে লইয়া উহার ধার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন ; বিপুল জনসংখ্যা নিঃশ্বাস রোধ করিয়া নির্বাক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে দৌড়িয়া জনৈক মুসলিম সৈনিক চীৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইল—"থামুন, থামুন, বিশপ, এই আপনার মূর্তির নাক ; আর এই আসল অপরাধী ; এই মূর্তি আমিই ভেঙ্গেছি ; এ শাস্তি আমাকেই গ্রহণ করতে হবে, সেনাপতি সম্পূর্ণ নির্দোষ—" বলিতে বলিতে সে বিশপের সম্মুখে আসিয়া নাসিকা বাড়াইয়া ধরিল।

আবার সে বিশাল জনমণ্ডলী নীরব বিস্ময়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল।

কম্পিত কণ্ঠে বিশপ বলিতে লাগিলেন, "ধন্য সেনাপতি, ধন্য সৈন্য, ধন্য এ জাতি, আর ধন্য সেই নবী যাঁর আদর্শে এমন মানুষ গড়ে উঠে। প্রতিমা ভাঙ্গা অন্যায় হয়েছে, কিন্তু এমন মানুষের উপর এর প্রতিশোধ মহাপাপ হবে। আমাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করছি, আশীর্বাদ করছি, এদেশে আপনাদের রাজ্য চিরস্থায়ী হউক।"

—ওয়াকেদী

বিজিতের প্রতি বাইয়াজীদ

তুর্ক সুলতান বাইয়াজীদের ক্রমবর্ধমান শক্তি দর্শনে খৃস্টীয় য়ুরোপ শঙ্কিত। সময় থাকিতে এ দৈত্যের বিনাশ সাধন শ্রেয়, এই সিদ্ধান্তের ফলে য়ুরোপের দেশে দেশে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। ফ্রান্স, জার্মানী, হাঙ্গেরী প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ হইতে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক নাইকোপলীসের ময়দানে হাযির হইল। বাইয়াজীদও তাঁহার তুর্ক বাহিনীসহ অগ্রসর হইলেন। প্রতি-দ্বন্দ্বী যোদ্ধাদের রণ-হুঙ্কারে যুদ্ধভূমি কাঁপিয়া উঠিল।

খৃস্টান যোদ্ধারা ঘোষণা করিল: "সুলতান বাইয়াজীদ তুচ্ছ কথা ; আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও তাহাকে আমরা বর্শার ফলকে ঠেকাইয়া রাখিব।"

কিন্তু তুর্ক বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে সমবেত খৃস্টান বাহিনী প্রভঞ্জন মুখে তৃণখণ্ডের মত উড়িয়া গেল।

বিজয়ী বিজিতের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল: সন্ধির একটি শর্ত লেখা হইল এই যে, ফরাসী ও জার্মান বন্দীরা আর কখনও সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না।

বিদায়ের আগে ফ্রান্স ও জার্মানীর বন্দিগণকে সুলতানের সম্মুখে হাজির করা হইল: ইহারা সকলেই অভিজাতঘরের সন্তান ছিল।

সুলতান বলিলেন, "আমার বিরুদ্ধে আর কখনো অস্ত্রধারণ করবে না—এ শর্ত হতে আমি স্বেচ্ছায় আপনাদেরকে মুক্তি দিচ্ছি। আপনারা বয়সে তরুণ, সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, আপনাদের সম্মানবোধ ও দেশপ্রেম আছে, এ পরাজয়ের কলঙ্ককালিমা দূর করার একটি মহৎ আকাঙ্ক্ষা আপনাদের হওয়া বিচিত্র নয়। যদি কখনো তা হয়, তবে আবার আপনারা সমবেত হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন, আমি সানন্দে আপনাদের সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করব।"

—গীবন

উমর (রা.)-এর ওস্তাদ

৬৩৯ খৃস্টাব্দ। সিরিয়ায় ভীষণ মড়ক দেখা দিয়াছে, হাজার হাজার লোক পচিতেছে, গলিতেছে, মরিতেছে।

হযরত উমর (রা.) মদীনায় স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিজে প্রজাদের অবস্থা দেখিয়া মড়ক নিবারণের উপায় নির্ধারণ করিবার জন্য সিরিয়ায় রওয়ানা হইয়া গেলেন।

সিরিয়ায় রোগীর শুশ্রূষা ও মড়ক নিবারণের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া খলীফা মদীনায় ফিরিতেছেন।

পথে দেখিলেন, একটি ছোট কুটির; ভিতরে একটি বৃদ্ধা; দারিদ্র্যের শত চিহ্ন সর্বত্র পরিস্ফুট।

খলীফা উট হইতে নামিয়া কুটিরের দুয়ারে গেলেন এবং বুড়ীকে অভিবাদন করিয়া কথা শুরু করিলেন।

'খলীফা উমরের কথা কিছু জান, মা?'

'খলীফা নাকি শাম হতে মদীনায় ফিরে যাচ্ছেন।'

'আর কিছু জান?'

'ঐ অপদার্থটা সম্বন্ধে আর বেশী জানবার দরকার? ও গোল্লায় যাক।'

'কেন, মা, কি হয়েছে?

'কি হয়েছে? কি হয় নাই, তাই বল। এই যে আমরা না খেয়ে মরছি, সে আমাদেরকে কি দিয়েছে?'

'কিন্তু এই দূরদেশ--এখানকার এত খবর খলীফা রাখবে কি করে?'

'বাঃ, দূর বলে যদি খবর রাখতে না পারে; তবে বাছাধন এ খিলাফতের দায়িত্ব নিলেন কেন? ছেড়ে দিক তার পদ।'

'মা, সালাম, তুমি আমার ওস্তাদ—একটা ভাল শিক্ষা দিলে।'

উমর (রা.)-এর চোখের কোণ ভিজিয়া উঠিল, তিনি মুখ ফিরাইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, 'হায় উমর, এই জরাজীর্ণ গ্রাম্য নারীও তোমার চেয়ে বেশী বুদ্ধি রাখে।' বৃদ্ধার দিকে ফিরিয়ে তিনি বলিলেন, 'মা, উমরকে দিয়ে তোমার প্রতি যে যে অবিচার হয়েছে, আমি তা কিনে উমরকে দায়মুক্ত করতে চাই; তুমি কত মূল্যে তা আমায় বিক্রি করতে পার?'

বৃদ্ধা বলিল, 'তার আবার দাম কি, বাছা, আমি দোওয়া করব।'

রাজধানীতে ফিরিয়া উমর (রা.) রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাদের নিকট ফরমান পাঠাইলেন: 'অবিলম্বে রাজ্যস্থ অসহায় গরীব দুঃখীদের তালিকা তৈয়ারী কর এবং তাদের মধ্যে যারা খেটে খেতে পারে তাদের ছাড়া আর সবার জন্য সাদ্‌কা, যাকাত ও সাধারণ ধনভাণ্ডার হতে সাহায্যদানের ব্যবস্থা কর।'

—হায়াতুল হায়ওয়ান

শাসক-শাসিতে নৈকট্য

আরবেরা মাদায়েন দখল করার পর কয়েক মাস তাহারা সেখানেই রহিল। তৎপর কোনও জরুরী কাজ উপলক্ষে তাহাদের একদল প্রতিনিধি মদীনায় হযরত উমর (রা.)-এর নিকট ডেপুটেশনে গেল।

খলীফা তাহাদের স্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, 'আমিরুল মুমিনীন, জায়গাটার আবহাওয়া মোটেই আমাদের সইছে না।' খলীফা বলিলেন, 'যোদ্ধাদের প্রকৃত স্থান তাঁবু, তবে যদি তোমরা স্থায়ী ঘরে আদৌ থাকতে চাও তবে মরুর হাওয়া সব সময় পাওয়া যায়, এমন একটা ভাল জায়গা খুঁজে বের করে আমাকে জানাও।'

ফোরাত নদীর পশ্চিম পাড়স্থ কুফা নামক স্থান বাছাই করিয়া খলীফাকে লেখা হইল। খলীফা অনুমোদন করিলেন।

সুবিখ্যাত সেনাপতি সা'আদ এই সময় মাদায়েনের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার নিজ তত্ত্বাবধানে কুফা নগর নির্মিত হইল।

কুফা নগরে সা'আদ নিজের জন্য একটি প্রাসাদ তৈয়ার করিলেন ; তাহার সামনে রহিল একটি উঁচু সুন্দর তোরণ।

সা'আদের প্রাসাদের কথা কল্পকাহিনীর মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। মদীনায় হযরত উমর (রা.)-এর কানেও একথা গেল। তিনি বিচলিত হইলেন, ভাবিলেন, 'তাইতো, শাসক আর শাসিতের মধ্যে যদি এমন দূরত্বের প্রাচীর জেগে উঠে, তবে কি আর শাসিতের আসল অবস্থা দেখবার সুযোগ ঘটবে শাসকের?' খলীফা পরদিনই সা'আদের নিকট দূত পাঠাইলেন :

মদীনার দূত আনি, দিল হাতে
উমরের ফরমান,
"সেনাপতি, তব প্রাসাদ তোরণে
করহ অগ্নিদান।

রচেছ প্রাসাদ ইরানী ধরনে
বিলাস-লুব্ধ মন,
তব আদর্শ আখেরের নবী,—
খসরু কভুতো নন!
খলীফার তুমি প্রতিনিধি সেথা
করিতে প্রজার সেবা,
তুমি যদি থাক তোরণ আড়ালে
তাদেরে দেখিবে কেবা?
জ্বালাও প্রাসাদ"; সেনাপতি সা'আদ
নিল সে আদেশ শিরে,
অগ্নির শিখা নিমিষে জ্বলিয়া
উঠিল তোরণ ঘিরে।

মহানবী খাজনা আদায়ের জন্য আসেন নাই

আগেকার দিনে রাজ্যের ভিতরে বাহিরে যুদ্ধ প্রায় লাগিয়াই থাকিত। মুসলমান রাজ্যের প্রত্যেক সমর্থদেহ মুসলমান প্রজা বৈদেশিক আক্রমণ বা বিদ্রোহী-দের হাত হইতে দেশ রক্ষার জন্য তলোয়ার ধরিতে বাধ্য ছিল; অমুসলমান প্রজারা এরূপ ক্ষেত্রে যুদ্ধে যাইতে বাধ্য ছিল না। এই যুদ্ধ-মুক্তির মূল্য হিসাবে সমর্থদেহ যুদ্ধক্ষম অমুসলমান প্রজাগণকে একটা খাজনা দিতে হইত—ইহার নাম জিজিয়া। জিজিয়া গ্রহণ করিয়া প্রতিদানে রাজশক্তি ইহাদিগকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিত। কেহ ইসলাম গ্রহণ করিলে সে অমনই জিজিয়া হইতে মুক্ত হইত, কিন্তু যুদ্ধে প্রাণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বাধ্য হইত।

মহানবী (স.)-এর মৃত্যুর অল্পকাল মধ্যেই দেশে-বিদেশে ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল। তখন অমুসলমান প্রজা সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল এবং জিজিয়া হইতে রাজকোষে যথেষ্ট ধনাগম হইত। ক্রমে বিজিত দেশের প্রজারা ইসলামের

সত্যিকার পরিচয় পাইতে লাগিল আর দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল। জিজিয়ার আয় সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যাইতে লাগিল।

মিসরের সুবাদার হাইয়ান ইবনে শরীহ্ খলীফা দ্বিতীয় উমরকে পত্র লিখিলেন, "আমিরুল মুমিনীন, রাজ্যের সম্মুখে বিষম বিপদ উপস্থিত: দলে দলে অমুসলমানেরা মুসলমান হইতেছে, জিজিয়ার আয় কমিয়া যাইতেছে, রাজকোষ খালি হইয়া পড়িতেছে।"

খলীফা ক্রুদ্ধ হইয়া লিখিলেন: "জিজিয়ার খাজনা কমিয়া যাইতেছে বলিয়া ইসলামের খলীফার সুবাদারের পক্ষে দুঃখ প্রকাশ নিতান্ত লজ্জার কথা। তাঁহার মনে রাখা উচিত, আমাদের মহানবী (স.) মানুষকে শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন, মানুষের নিকট হইতে খাজনা আদায় করিতে আসেন নাই।"

—ছয়্‌তী ইনান ঃ ইদ্রিস আহ্‌মদ
(Decisive moments in the History of Islam—**Enan.**)

কারবালার বীর শহীদ

৬০০ সালের এপ্রিল। দামেস্কে আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর অন্তর্ধান ঘটিয়াছে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দরবারের আমীর রইসগণকে ডাকাইয়া তাহাদের সাক্ষাতে নিজ পুত্র ইয়াজীদকে খলীফা নির্বাচন করিয়াছেন। দুইজন ছাড়া আর সকলেই ইয়াজীদের নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

এই দুইজনের একজন আবদুল্লা ইবনে জোবায়ের (রা.) আর একজন হযরত হোসায়েন (রা.)।

মুয়াবিয়া (রা.)-এর খলীফা মনোনয়ন সমস্ত দিক দিয়াই আপত্তিকর ছিল। প্রথমত, ইসলামের প্রচারিত ও অনুসৃত নীতি ত্যাগ করিয়া তিনি প্রাক-ইসলামীয় যুগের সামন্ততন্ত্র যুগের পুনঃপ্রবর্তন করিলেন। দ্বিতীয়ত, নানা প্রকার জঘন্য দুর্নীতি ও পাপে অনুক্ষণ মগ্ন থাকায় ইয়াজীদ খলীফা পদের যোগ্য ছিলেন না। তৃতীয়ত, হযরত হাসান (রা.)-এর সঙ্গে ইতোপূর্বে মুয়াবিয়া (রা.)-এর যে সন্ধি হইয়াছিল, তদনুসারে খেলাফত হযরত হোসায়েন (রা.)-এর প্রাপ্য ছিল। হযরত হোসায়েন (রা.) আলী (রা.)-এর পুত্র ও স্বয়ং রসুলুল্লাহ্ (স.)-এর দৌহিত্র, এ দুই অবস্থাও তাঁহার খেলাফত দাবীর অনুকূল ছিল।

সুতরাং ইয়াজীদের জুলুম হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যখন কুফার অধিবাসীরা হযরত হোসায়েন (রা.)-এর নিকট সাহায্য ভিক্ষা চাহিয়া পাঠাইল, তখন তিনি সে আহ্বানে সাড়া দেওয়া নিজ কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন। তাঁহাকে আশ্বাস দেওয়া হইল যে তিনি কুফায় পৌঁছা মাত্র সমস্ত ইরাক তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইবে।

সুতরাং হযরত হোসায়েন (রা.) তাঁহার পরিবারবর্গ ও কয়েকজন মাত্র সঙ্গী লইয়া কুফা যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি ইরাক সীমান্তে পৌঁছিয়াই দেখিলেন অধিবাসীরা অত্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন। তাঁহার মনে হইল, এ আবার উমাইয়াদের আর এক দফা বিশ্বাসঘাতকতা।

ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরের নিকটে কারবালা নামক স্থানে হযরত হোসায়েন (রা.) শিবির স্থাপন করিলেন। ইয়াজীদের সেনাপতি ওবায়েদুল্লাহ্ ইবনে যিয়াদ একদল সৈন্যসহ এই স্থানে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

হোসায়েন (রা.) ওবায়েদুল্লাকে তিনটি শর্ত দিলেন: "আমাকে মদীনায় ফিরিয়া যাইতে দাও, না হয়, আমাকে তুর্কদের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য কোন সীমান্তের দিকে যাইতে দাও অথবা আমাকে নিরাপদে ইয়াজীদের সম্মুখে লইয়া যাও।"

ওবায়েদুল্লাহ্ উত্তরে বলিল, "আমি এসব শর্তে রাজী নই। আমার সোজা কথা—সাধারণ বিদ্রোহী অপরাধীর মত আত্মসমর্পণ কর, তাহার পর যাহা করিতে হয়, আমার ইচ্ছামত করিব।"

হযরত হোসায়েন (রা.) আবার বলিলেন, "বেশ, তোমরা যুদ্ধ করিবে, কর; কিন্তু আমার সঙ্গে এই যে সব শিশু, বালকবালিকা ও মহিলারা আছেন ইঁহাদের কোন অপরাধ নাই। ইঁহাদের উপর তলোয়ার চালাইও না।"

কিন্তু নিষ্ঠুর শত্রুরা জবাব দিল, "আমরা রক্ত চাই, মস্তক্ চাই; সে রক্ত শিশুর না নারীর তাহা আমরা জানি না।"

দিনের পর দিন শত্রুরা হোসায়েন (রা.)-এর শিবির ঘিরিয়া রাখিল। উহাদের কেহই তাঁহার তীর-তলোয়ারের পাল্লায় আসিতে সাহস পাইল না। হোসায়েন (রা.) পরিবার ফোরাতের পানি হইতে সম্পূর্ন বঞ্চিত হইল। ইরাকের নির্মল নীল আকাশ হইতে আগুন ঝরে, বাতাস বহিয়া আনে বিষ। বালুর পাহাড় স্ফুলিঙ্গের দরিয়ায় পরিণত হয়। হোসায়েন (রা.)-এর শিবিরে হাহাকার পড়িয়া গেল—নিদারুণ উত্তাপে মায়ের বুকের দুধ শুকাইয়া গেল, এখন শিশুরা ছাতি ফাটিয়া মরে!

কিন্তু দুশমনের মন টলিল না। হোসায়েন (রা.) সঙ্গীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা আমার সঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া যাও—আমার সঙ্গে থাকিলে সকলেই মারা

পড়িবে।" কিন্তু কেহই তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে রাজী হইল না। তাঁহারা ফোরাত কূলে পৌঁছিবার জন্য একে একে শত্রুসৈন্য দলে ঝাঁপাইয়া পড়িল—লড়িল—মরিল।

অবশেষে হযরত হোসায়েন (রা.) স্বয়ং বহির্গত হইলেন। তাঁহার তলোয়ারের মুখে তিষ্টিতে না পারিয়া শত্রুরা দূর হইতে তীর বর্ষণ করিতে লাগিল; তবু তিনি নদীর পাড়ে গিয়া পৌঁছিলেন। বুকে তাঁহার নিদারুণ পিপাসা—একবার মনে হইল, এক চুমুকে ফোরাতের পানি নিঃশেষ করিয়া লেন; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল তাঁহার প্রিয় সঙ্গীদের কথা—এক ফোটা পানির জন্য তাহারা ছটফট করিয়া মরিতেছে। আর মনে পড়িল তাহার শিশুপুত্র আসগরের কথা। সেই দুধের শিশুকে কোলে লইয়া উহার জন্য বিপক্ষ দলের কাছে এক গ্লাস পানি চাহিয়াছিলেন; 'এই দিতেছি' বলিয়া এক দুশমন তীর ছুঁড়িয়া শিশুর বুক পার করিয়া দিয়াছিল!

হোসায়েন (রা.)-এর পিপাসা মিটিয়া গেল। তিনি শিবিরের দিকে ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু অজস্র রক্তপাতে তাঁহার দেহ আর চলে না—তিনি পড়িয়া গেলেন। দুর্বৃত্তরা আসিয়া তাঁহার মাথা কাটিয়া লইল। তাঁহার লাশের উপরও অত্যাচার হইল!

তাহারা তাঁহার ছিন্নমুণ্ড লইয়া গিয়া ওবায়েদুল্লার সম্মুখে হাযির করিল। নিষ্ঠুর ওবায়েদুল্লা মৃতের ঠোঁটের উপর বেত্রাঘাত করিল। উপস্থিতদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ছিল; সে বলিল, "আহা! ঐ দুটি কোমল ঠোঁটের উপর আমি রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর পবিত্র ঠোঁট সংস্থাপিত হইতে দেখিয়াছি!"

মাতৃভূমি হইতে বহু দূরে দুর্গম মরু-প্রান্তরে এক অসহায় বীর এক পরাক্রান্ত সম্রাটের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে দাঁড়াইয়াছিলেন। সত্যের মর্যাদা রক্ষার জন্য এবং সেই সাধনার আগুনে পরিজনসহ আত্মাহুতি দিয়াছিলেন: সে আজ তের শত বৎসরেরও কথা। কিন্তু আজিও প্রতি বৎসর মুহর্‌রম মাসে ভক্তদের বুকফাটা আর্তনাদ "হায় হোসায়েন" "হায় হোসায়েন" রবে কারবালার বীর শহীদের সেই স্মৃতি মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠে।

—আমির আলী

Spirit of Islam—**Amir Ali**

বাংলার শেষ পাঠান বীর

মোগল সম্রাট আকবরের প্রতাপের সম্মুখে ভারতের রাজন্যবর্গ একে একে মস্তক নত করিতে লাগিলেন। কেবল কতিপয় নির্ভীক যোদ্ধা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ পণ করিয়া তলোয়ার হাতে দাঁড়াইলেন। বাংলার শেষ পাঠান বীর ওসমান খাঁ ইঁহাদেরই একজন।

ওসমান খাঁর আহ্বানে বাংলার পাঠান ও জমিদারগণ তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইল। ১৬১২ খৃস্টাব্দে ওসমান খাঁ বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন।

পঙ্গপালের মত অগণ্য মোগল সৈন্য বাংলার পল্লী প্রান্তর ছাইয়া ফেলিল। পাঠানগণও মরণ পণ করিয়া হুহুঙ্কারে দাঁড়াইলেন। ভীষণ সংগ্রাম শুরু হইল।

ওসমান খাঁ সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বিরাট বপুভার রাজ আস্তাবলের কোন ঘোড়াই বহন করিতে পারিত না। কাজেই,. তিনি হাতীতে চড়িয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

মোগল সৈন্যের সংখ্যা অফুরন্ত, পাঠান সৈন্যের বিক্রম অতুলনীয়; কাজেই :

'কেহ কারে নাহি পারে
সমানে সমান।'

কিন্তু এভাবও অধিকক্ষণ ঠিক রহিল না। পাঠানের শৌর্য মোগলের সংখ্যাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল: মোগল বাহিনীতে ভীতি-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল; আর বুঝি পাঠানের সম্মুখে টিকিতে পারে না!

এমন সময় পাঠানের কপাল ভাঙ্গিল; ওসমান খাঁ আহত হইলেন; বাংলার পাঠানের ভাগ্যের দরিয়ায় সহসা ভাটা শুরু হইল।

ওসমান খাঁর সম্মুখে আর কোন মোগল সৈন্য যাইতে সাহস পাইতেছিল না। তাই মোগল তীরন্দাজ বাহিনী দূর হইতে ওসমান খাঁর অনুগমন করিতেছিল। ইহাদেরই একজনের তীর সহসা ওসমান খাঁর দক্ষিণ চক্ষু সম্পূর্ণরূপে বিদ্ধ করিল। এ ঘটনা যাহাতে পাঠান সৈন্যদের নজরে না পড়ে সেজন্য ওসমান খাঁ তৎক্ষণাৎ সজোরে টানিয়া তীর বাহির করিয়া ফেলিলেন। তীরের ফলার সঙ্গে চক্ষুর তারকা বাহির হইয়া আসিল। দুঃসহ ব্যথা! অজস্র রক্তপাত!!

কিন্তু ওসমান খাঁ তবু রণে ক্ষান্ত দিলেন না। তিনি রুমাল দিয়া আহত চক্ষু চাপিয়া ধরিলেন এবং যেন কিছুই হয় নাই এমনই ভাবে পূর্বের মত সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া চলিলেন। যেখানেই পাঠান লাইন দুলিয়া উঠে, সেখানেই ওসমান খাঁ যাইয়া হাযির হন; পাঠান সৈন্যরা হুহুঙ্কারে মোগলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে—মোগলেরা হটিয়া যায়। ওসমান খাঁ আবার ময়দানের অন্যদিকে হাতী হাঁকাইয়া চলেন।

কিন্তু অবিরাম রক্তপাতে ওসমান খাঁ ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়িলেন। যে চক্ষুটি ভাল ছিল, তাহাতেও অন্ধকারের ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল। অবশেষে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "পরিচারক! আমাকে পিছন থেকে ধরে হাতীর উপর সোজা রাখ, যেন অচেতন হয়ে ঢলে না পড়ি; আর মাহুত! যুদ্ধ যেখানেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে, আমাকে সেই সেই খানে নিয়ে যেতে থাক, আমার প্রিয় সৈন্যরা আমাকে দেখে যেন হৃদয়ে বল পায়।"

এমনি করিয়া প্রায় ছয় ঘন্টাকাল মুমূর্ষু পাঠানবীর যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বাংশে ঘুরিয়া পাঠান স্বাধীনতার শেষ লড়াই লড়িলেন।

অবশেষে ওসমান খাঁর কণ্ঠ ক্ষীণ হইয়া আসিল। তাঁহার সৈন্যরা বুঝিল, সেনাপতির প্রাণহীন দেহ লইয়া তাঁহার প্রিয় হস্তী পাগল হইয়া ছুটিতেছে। তাহারা ভয় পাইল, তাহাদের লাইন টলিয়া উঠিল—তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল। ওসমান খাঁর বজ্রকণ্ঠ তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য আর হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিল না।

—জাফর

দীক্ষা

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষভাগে তুরস্ক পরাজিত হইয়াছে। সমগ্র দেশ অব্যক্ত বিষাদের কৃষ্ণছায়ায় ঢাকিয়া গিয়াছে।

সুলতান বৃদ্ধ, দুর্বল, আত্মসর্বস্ব, তাঁহার পরামর্শদাতারা হীনচরিত্র, হীন-আদর্শ, হীনবল। তাই তাহারা তুরস্কের জাতীয় জীবনের পক্ষে অপমানজনক এক সন্ধি করিয়া বসিল।

দেশের জনগণের যাহারা নেতা, মাতৃভূমিকে যাহারা যথার্থ ভালবাসে, তুরস্কের সেই বীরসন্তানেরা এই সন্ধি মাথা পাতিয়া লইতে রাজী হইল না। মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে তাহারা কোমর বাঁধিল।

নব্যতুর্কের এ দাবীর জবাবে ইংল্যাণ্ড ইস্তাম্বুল দখল করিয়া বসিল; অনেক নেতাকে দূর দেশে নির্বাসনে পাঠাইল, বাকী সকলের উপর কড়া নজর রাখিবার ব্যবস্থা করিল।

কিন্তু ইংরেজের চোখ রাঙানীতে তরুণ তুর্ক শঙ্কিত হইল না; বরং তাহারা উল্টা চোখ রাঙাইয়া বলিল, আমরা আমাদের আছি এবং থাকতে চাই মানুষের মত মাথা উঁচু করে।

তরুণ তুর্করা তৈয়ার হইতে শুরু করিল। মুস্তাফা কামাল পাশা আগেই আঙ্গোরায় চলিয়া গিয়াছিলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের আয়োজনে পরিব্যস্ত ছিলেন। এক্ষণে তুরস্কের স্বাধীনতাকামী নরনারীরা দলে দলে বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইতে লাগিল।

নব্যতুর্কদের এই নূতন আয়োজন ইংরেজদের শ্যেনদৃষ্টি এড়াইল না। তাহারা ইস্তাম্বুলে থানা গাড়িয়া বসিয়া চারিদিকে গোয়েন্দা মোতায়েন করিল: প্রত্যেক খেয়া নৌকার যাত্রী, গাড়ীর আরোহী, পথচারীর দেহ তল্লাশ শুরু হইল।

এইরূপ অবস্থার মধ্যে বিপদের ঘনঘটা মাথায় লইয়া ইস্তাম্বুল হইতে একদল পলাতক আঙ্গোরায় যাইতেছিল। ইহাদের মধ্যে ছিলেন খালেদা খানম—একাধারে বক্তা, লেখিকা, সংবাদপত্রসেবী, শিক্ষাবিদ এবং সৈনিক; কিন্তু সর্বোপরি তুরস্কের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশভক্ত সন্তান।

রাত্রি গভীর ও অন্ধকার, পথ সরু, খাড়া—অসমান, বাতাস প্রবল, ঠাণ্ডা—হাড় কাঁপাইয়া যায়। মাঝে মাঝে দুই-এক পশলা বৃষ্টি হইয়া রাস্তাটিকে ভয়ানক পিচ্ছল করিয়া দিল।

তথাপি সেই সঙ্কটময় পথ বাহিয়া পলাতক দেশভক্তদের কাফেলা চলিল। প্রভাতের আগে তাহাদিগকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে হইবে; নহিলে দিনের আলোতে ধরা পড়া অবশ্যম্ভাবী এবং ধরা পড়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হবে হয় চির নির্বাসন, না হয় দুনিয়া হইতে চিরবিদায়।

রাত্রির অন্ধকারও যেন গোপন পথচারীদের জন্য যথেষ্ট ছিল না, কারণ ইংরেজদের শক্তিশালী সন্ধানী আলো মাঝে মাঝে তাহাদের পথের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিতেছিল।

কিন্তু আর তো শরীর চলে না : ক্ষুধায়, শীতে, ক্লান্তিতে যাত্রীদল অস্থির অবশ হইয়া তাহারা একস্থানে বসিয়া পড়িল ; বলিল : আর পারি না, মরিতে হয় পথে চলিতে চলিতে টাল খাইয়া পড়িয়া মরার চেয়ে এইখানে শুইয়া মরিব।

ঐ কাফেলায় খালেদাও ছিলেন। কাফেলার সর্দার গিয়া তাঁহার কানে কানে বলিল : কি করা যায়, খানম? এইখানে থামিলে কিন্তু সকালেই নির্ঘাত মৃত্যু।

খালেদা খানমের শরীরও অবশ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তিনি আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় সমস্ত শক্তি পুঞ্জীভূত করিয়া একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার মনস্থ করিলেন। তিনি ঘোড়া হাঁকাইয়া কাফেলার পুরোভাগে গিয়া বলিলেন, 'বন্ধুগণ, যদি মরতে হয় আমরা দুশমনের সঙ্গে দেশের বীরসন্তানের মত যুদ্ধ করে মরব, পথে পড়ে এভাবে মরব না। এই আমি চল্লাম যাদের ইচ্ছা আমার পেছনে চলে এস।'

শত্রুর ভয়ে কেহ উল্লাসে চীৎকার করিল না, কিন্তু মনে মনে উল্লসিত হইল, তাহাদের বুকে নবশক্তির সঞ্চার হইল। আবার তাহারা চলিল।

অবশেষে কাফেলা একটি সরাইখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সরাই-খানায় ইতোপূর্বেই আনাতোলিয়ার বহু স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য এক রাত্রি থাকিয়া লড়াইয়ের ময়দানে গিয়াছে। তাহাদের পরিত্যক্ত শূন্যস্থানে এই নূতন কাফেলা আশ্রয় লইল।

সরাইয়ের চুলায় নূতন লাকড়ী দেওয়া হইল; আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; ক্লান্ত, হিমপীড়িত পথিকেরা চারিপাশে বসিয়া আগুন পোহাইয়া লইল। অতঃপর কিছু খাইয়া শুইয়া পড়িল।

খালেদা খানমকে একটি পৃথক কামরা দেওয়া হইল। কামরার মেঝেতে ছিল একটি মোটা শক্ত মাদুর আর মাদুরের উপর ছিল একটি বালিশ আসলে একটা ময়লা ব্যাগ।

অতঃপর বাকী কথা খালেদা খানম নিজে তাঁহার নিজ ভাষায় বলিতেছেন :

"আমি শুইয়া বার বার আমার মাথাটা বালিশের উপর রাখিবার চেষ্টা করি-লাম, কিন্তু পারিলাম না। মনে হইল, কতকগুলি চোখা চোখা পাথরের টুকরা দিয়া বালিশটি ভরা হইয়াছে। আমি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম, পাথর ত নয়, স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য কালো রুটি যে রুটি দুনিয়ার জঘন্যতম খাদ্যের অন্যতম।

ইহার পরই একটা ভীষণ বিকট গন্ধ আমার নাকে আসিয়া আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। এ ছিল স্বেচ্ছাসেবকদের গায়ের ঘামের গন্ধ। কে জানে জনগণের কত দুর্দম্য সন্তান তাহাদের কঠিন দেহের ঘামে এই বিছানা ভিজাইয়া রাখিয়া গিয়াছে।

এই ঘামের গন্ধ আমার মনের চোখ খুলিয়া দিল। আমি চাহিয়া দেখিলাম, আমার দেশের দুঃস্থ জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এমনই ভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া আমাদের খাদ্যের জন্য ক্ষেত চষিয়াছে, আমাদের ইজ্জতের জন্য লড়িয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া এমনই ভাবে সর্বস্ব দিয়াও ইহারা কোন দিন বাহবা চায় নাই, কোন বাহবা পায় নাই। লড়াইকালে কেহ ময়দানে চিরনিদ্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছে, কেহ একটা হাত, পা বা চোখ যুদ্ধক্ষেত্রে রাখিয়া বাকী জীবন ভুগিয়াছে; অবশিষ্টরা ফিরিয়া গিয়া পুনরায় লাঙ্গল লইয়া চাষের কাজে লাগিয়া গিয়াছে।

এই ঘামের গন্ধ মুখর হইয়া এমনই কত কথা আমাকে বলিল, কত ছবি আমার মনে জাগাইল।

গণজীবনের ব্যথা-বেদনায় এমনই করিয়া আমার দীক্ষা হইল। এতদিন কেবল কাগজে পড়িয়াছিলাম, বিশ্বাসও যে করি নাই, এমন নয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভূতি দিয়া আগে কখনো তা বুঝি নাই। আমি এত দুঃখের মধ্যেও মনে মনে হাসিলাম। হাসিলাম এই ভাবিয়া যে আমাদের তরুণ লেখকদের মধ্যে যাহারা গণজীবনের ব্যথার চিত্র আঁকিতে চায় তাহারা শুধু কল্পনার সাহায্যে কি ব্যর্থ চেষ্টাই না করিয়া থাকে। তাহাদের এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য মুখ খুলিবার পূর্বে একবার এই সরাইখানায় আসিয়া এই গন্ধ নিজ নাকে অনুভব করিয়া যাওয়া উচিত।"

—খালেদা খানম
(The Turkish Ordeal)

আজরাঈল সাক্ষী

মোমেনজনের স্বরূপ তবে শোনো
ঠোঁটখানি তার তৃপ্তি সুখে হাসে মৃত্যু যবে আসে তাহার পাশে
ভয় ডর সে বোধ করে না কোনো।

—ইক্‌বাল

ইয়ারমুকের যুদ্ধ। রোমক সৈন্য প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ চালাইয়াছে। মুসলিম সৈন্যবাহিনী টলমল।

ইক্‌রামা মুসলমানদের এ বিপদ লক্ষ্য করিলেন। আবুযেহেল—ইসলামের নির্মম দুশমন আবুযেহেল—তাহারই পুত্র ইক্‌রামা। ইক্‌রামাও কম নহেন। তিনি বদরের ময়দানে মুসলমানের বিরুদ্ধে অসিচালনা করিয়াছেন, ওহুদের যুদ্ধে প্রাণ পণ সংগ্রাম করিয়াছেন, খন্দকের লড়াইয়ে বিরোধী দলের অন্যতম অগ্রণী ছিলেন, এমন কি মক্কা বিজয়ের দিনেও বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সেই ইক্‌রামা আজ রোমক সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়িতে আসিয়াছেন—ইসলামের ইজ্জত রক্ষার জন্য।

ইসলামের এই সঙ্কট মুহূর্তে ইক্‌রামার মহত্ত্ব চরম বিকাশ লাভ করিল। তিনি যুদ্ধের মাঝখানেই তাঁহার সৈন্যদলকে ডাকিয়া বলিলেন, "জীবন পণ করিয়া যাহারা ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর তাহারা আমার সহিত অগ্রসর হও।"

আল্লাহু আক্‌বর বলিয়া তাহারা শত্রুর সৈন্য সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িল—লড়িল—মরিল। ইক্‌রামাও সমরশয্যা গ্রহণ করিলেন। মহাবীর খালেদ তাঁহার মুখে পানি দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে, ভাই, সত্যি চল্লে?" স্থির কণ্ঠে উত্তর হইল, "সত্যই চল্লাম, কিন্তু ময়দানে রেখে গেলাম একজনকে।"

"কে সে একজন?"

"আজরাঈল। খলীফা উমর (রা.)-কে বলো, আজরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানতে পারবেন যে আমি বন্ধুভাবেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছি, শত্রু ভেবে তাকে দেখে পালাই নাই।"

—নজীর আহ্‌মদ চৌধুরী

টিপুর মহাযাত্রা

ভারতের ত্রিসীমার কোথাও ইংরেজের চিহ্ন মাত্র রাখিবেন না, ইহাই হইয়া দাঁড়াইল টিপু সুলতানের দিবসের ধ্যান, রাত্রির স্বপন। আর তাঁর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পৃথিবীর কত রাজশক্তির দুয়ারেই না তিনি সহযোগিতা,

যাচঞা করিয়া দূত পাঠাইয়াছেন সিন্ধিয়ার মহারাজা, হায়দারাবাদের নিজাম, কাবুলের আমীর, তুরস্কের সুলতান, ফ্রান্সের নেপোলিয়ন—ইঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু সন্তোষজনক সাড়া তিনি কোথাও পাইলেন না। তিনি সংকল্প করিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি মূল্যবান বাসনে খাইবেন না, নরম বিছানায় শুইবেন না। নিজাম ও মহারাষ্ট্রশক্তি ইংরেজের সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। "কুছ পরোয়া নেহি" বলিয়া তিনি নির্ভীকভাবে সম্মিলিত শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। তিনি বলিতেন, "এ জগতে দুইশ' বছর ভেড়ার মত বাঁচার চেয়ে দুই দিন বাঘের মত বাঁচাকে আমি শ্রেয়ঃ মনে করি।"

১৭৯৯ সালের ৪ঠা মে। রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টমের দুর্গ দুয়ারে ইংরেজ নিজাম ও মহারাষ্ট্রের মিলিত বাহিনী দুর্জয় শক্তিতে হানা দিতেছে।

টিপু সুলতান মধ্যাহ্নভোজনে বসিয়াছেন। এমন সময় বাহিরে প্রবল শব্দ শোনা গেল। অর্ধসমাপ্ত খানা রাখিয়া সুলতান উঠিলেন এবং তাড়াতাড়ি হাত ধুইতে ধুইতে তলোয়ার ও বন্দুক আনিতে বলিলেন। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইতেছেন, এমন সময় সংবাদ আসিল যে তাঁহার সেনাপতি সৈয়দ গফ্ফার নিহত হইয়াছেন। সুলতান বলিয়া উঠিলেন, "সৈয়দ গফ্ফার কখনো মরণকে ডরায় নাই। মুহম্মদ কাসিম তার স্থানে কাজ করুক।"

অতঃপর সুলতান দুর্গের উপরভাগে গেলেন। সেখানে যে কয়জন ইংরেজ অফিসারকে পাল্লার মধ্যে পাইলেন, তাহাদিগকে একে একে বন্দুকের গুলীতে ওপারে পাঠাইয়া দিলেন। ফলে সেখানে আক্রমণ মন্দীভূত হইয়া আসিল।

ইতোমধ্যে দুর্গের ফটকের নিকট শত্রুর আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হইল। সুলতান সেই দিকে চলিলেন। তিনি নিজে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, তাঁহার আদর্শে তাঁহার সৈন্যদল নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিল।

কিন্তু আক্রমণের তীব্রতা কমিল না। তাঁহার সঙ্গীগণ একে একে নিহত হইতে লাগিলেন। একটা গুলী তাঁহার বুকের বাম অংশে ভেদ করিয়া গেল, তাঁহার ঘোড়া আহত হইল, কিন্তু তিনি যুদ্ধের স্থান পরিত্যাগ করিলেন না।

ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। নিহত ও আহতের সংখ্যায় দুর্গদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল; তাহাদের দেহের উপর দিয়া ছাড়া চলাচলের পথ রহিল না।

অন্য একটা গুলী আসিয়া সুলতানের বুকের ডান পার্শ্ব বিদ্ধ করিয়া গেল। তাঁহার ঘোড়া মাটিতে পড়িয়া গেল। অজস্র রক্তপাতে দুর্বল হইয়া সুলতান অবশেষে পড়িয়া গেলেন। একটি শত্রুসৈন্য তাঁহার স্বর্ণখচিত কোমরবন্ধ ধরিয়া

টানিতে লাগিল, সুলতান বাম কনুইয়ের উপর ভর করিয়া তলোয়ার দিয়া তাহার উপর ওয়ার করিলেন; সে আহত হইয়া চলিয়া গেল। অমনইভাবে তিনি আরও একজনকে আহত করিলেন। এমন সময় আর একটি গুলী আসিয়া তাঁহার কপাল ভেদ করিয়া গেল।

মাতৃভূমির মুক্তিপিয়াসী দুর্দম সন্তান এমনই করিয়া রক্ত-আহবে তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুলতানের মৃতদেহ খুঁজিয়া বাহির করা হইল—শরীর তখনও গরম, বদনমণ্ডলে এক অনির্বাচনীয়, দৃঢ়সংকল্পের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেদীপ্যমান।

যাঁহার প্রতাপের ডঙ্কা এতকাল পর্যন্ত সমগ্র দাক্ষিণাত্যের কেন্দ্রে কেন্দ্রে রণিত হইয়াছে, আজ তিনি শুধু একটি মৃৎপিণ্ড। সমগ্র পৃথিবী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে, তাঁহার রাজ্য বিপন্ন, তাঁহার রাজধানী শত্রু কবলিত। পনর বৎসর পূর্বে যে কামরা হইতে তিনি মেজর বেয়ার্ডকে মুক্তি দিয়াছিলেন, আজ তাহারই তিন শত হাত দূরে তাঁহার দেহ ধূলায় অবলুণ্ঠিত, আর সেই বেয়ার্ড এক্ষণে তাঁহার প্রাসাদের অধিকারী।

এমনই ভাবে ভারতের রাজনৈতিক গগন হইতে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল।

টিপু সুলতানের জীবনের শেষ মুহূর্তে কি চিন্তা তাঁহার চিত্তকে দোলা দিয়াছিল আমরা জানি না। তাঁহার মাতৃভূমির ঘনায়মান অন্ধকার ভবিষ্যৎ কি তাঁহার অন্তর্লোকে বিষাদের ছায়াপাত করিয়াছিল? না, তাঁহার স্বরচিত সেই পারস্য কবিতা তাঁহার বিদায় মুহূর্তে আশান্বিত করিয়াছিল।

জানি, প্রভু, এ জীবন জানি পাপময়,
তুমি যে করুণাসিন্ধু, কিবা মোর ভয়?

—বীটসন

সাধনার পথে

১৮৫৩ সাল। আমেরিকার একটি ছোট্ট শহর। এই ছোট্ট শহরের একটি বালক সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া টেলিগ্রাফ বিতরণ করে। এই তারবিতরণ উপলক্ষে সে হরেক রকম বড় বড় ব্যবসায়ীর কাছে যায়; তার

মারফত তাহারা ব্যবসায়ের নূতন খবর পাইয়া যে আলোচনা করে সে তাহা কান পাতিয়া শোনে, তাহার অবস্থার সঙ্গে ব্যবসায়ীদের অবস্থা তুলনা করে ; বিরাট বৈষম্যের ভারে তাহার মন পিষ্ট হইতে থাকে। হঠাৎ তাহার বুকের তলে জ্বলে ওঠে আশার আলো। অতি ক্ষীণ সে দীপশিখা ; তবু তাহারই দিকে চাহিয়া বালকের মন উজ্জীবিত হইয়া উঠে। সে আবার তার লইয়া অন্য সওদাগরের দফতরের দিকে ছোটে।

একদিন বালক তাহার সাপ্তাহিক বেতন লইতে সদর অফিসে আসিয়াছে, এমন সময় ম্যানেজার বলিলেন, 'অ্যানড্রু, তুমি ঐখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। তুমি এখন মাইনে পাবে না ; অন্য ছোকরারা সবাই মাইনে নিয়ে গেলে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

অ্যানড্রু ঘরের এক কোণে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল, চিন্তার তুফানে তাহার ক্ষুদ্র মন মথিত হইতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, 'আমি না জানি কি মস্ত অপরাধ করে ফেলেছি! আচ্ছা, এ অপরাধের জন্য যদি আমার চাকরি যায়, তবে আমার মা-বাপের অবস্থা কি হবে? তাঁরা যে এর উপর অনেকখানি নির্ভর করেন। আমার মাহিনা না পেলে যে এ মাসে তাঁদের এক হফ্‌তা সেরেফ উপোস করতে হবে!'

ভাবিতে ভাবিতে বালকের বুক ফাটিয়া কান্না পাইতেছিল। সে বহু কষ্টে সে কান্না রোধ করিয়া শঙ্কাকুল চিত্তে ম্যানেজারের চরম আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অন্যান্য বালকেরা তাহাদের বেতন লইয়া চলিয়া গেল। তখন ম্যানেজার বালককে কাছে ডাকিয়া শান্তকণ্ঠে বলিলেন, 'অ্যানড্রু, তুমি কাজের ছেলে, তোমার একার দাম অন্য সব ছোকরাদের মিলিত দামের সমান। তাই তোমাকে আমি সাড়ে ছয় টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছি। এখন মাইনে নিয়ে ঘরে যাও।'

এ সংবাদে বালকের মনে আবার তুফান ছুটিল—এ অপার আনন্দের তুফান। বাড়ী আসিবার পথে তাহার এক একবার মনে হইতে লাগিল, সে যেন হাওয়ার উপর পা ফেলিয়া চলিতেছে।

বাড়ী আসিয়া আনন্দের আতিশয্যে বালক তাহার এই অভাবিত সৌভাগ্যের কথা তাহার মাতাপিতাকে বলিতেই পারিল না ; তাহার নিয়মিত বেতন তাঁহাদের হাতে দিয়া বাকীটা নিজের কাছেই রাখিয়া দিল।

রাত্রিতে শুইয়া বালক তাহার ভাই টমের কানে কানে তাহার বেতন বৃদ্ধির সংবাদ জানাইল। টম শুনিয়া তখনই লাফাইয়া উঠিয়া মায়ের কাছে যায় আর কি! অ্যানড্রু বহু কষ্টে তাহাকে নিবারণ করিল।

পরদিন সকাল বেলা। পরিবারের সকলে নাশ্‌তা খাইবার জন্য টেবিলের পাশে বসিয়াছে, এমন সময় টম সংবাদটি সকলের কাছে প্রকাশ করিল। সকলে চমকিয়া উঠিল। তাহার পর ছুটিল তাহাদের মধ্যে আনন্দের ঝড়।

অ্যানড্রু কহিল, 'মা, আমার বেতন তো দেখছি বেড়ে চল্ল; এরপর আমি টাকা দিয়ে কি করব জান? আমি তোমার জন্য একটা জুড়ী গাড়ী কিনে দিব।'

মা চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া ছেলেকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, এবং তাহার মাথায় অজস্র চুমা দিতে দিতে বলিলেন, 'তাই দিস, বাবা, তাই দিস। তুই লক্ষপতি হ—কোটি পতি হ।'

অ্যানড্রুর পিতা অ্যানড্রুর মাতাকে বলিলেন, 'তুমি পাগল হলে না কি? লক্ষপতি, কোটিপতি, এসব কি বলছ তুমি।'

অ্যানড্রুর মাতা কহিলেন—'বা: রে, যিনি দেওয়ার মালিক, তাঁর কাছে লাখ টাকাই কি, কোটি টাকাই কি? আচ্ছা, বল তো, এই যে হপ্তায় ওর সাড়ে ছয় টাকা মাইনে বেড়ে গেল, এ কি কম কথা? কে এমন বৃদ্ধির কথা ভেবেছিল?'

মায়ের আশীর্বচনে পুত্রের কিশোর চিত্তে লক্ষ স্বপন জাগিয়া উঠিল। সেদিন হইতে পুত্র সেই স্বপ্ন-সাধনায় মত্ত হইল।

বেতন বৃদ্ধির উৎসাহ আর মায়ের আশীর্বাদের পুণ্য মিলিয়া তাহার বুকে যে অভূতপূর্ব শক্তি সঞ্চার করিল, তাহার সম্মুখে দুর্নিবার কোন বাধা-বিঘ্নই দাঁড়াইতে পারিল না।

ডাক-পিয়নের কাজ ছাড়িয়া কারনেজী অ্যানড্রু সামান্য ব্যবসায় শুরু করিলেন। তীক্ষ্ণ মেধা, অক্লান্ত শ্রম ও অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়বলে তিনি উন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

প্রথমে কারনেজী রেল-লাইনের জন্য নূতন ও উন্নত ধরনের গাড়ী তৈরীর কাজে লাগিয়া গেলেন। টাকা তাঁহার অল্পই ছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার নির্মল চরিত্রগুণে পরিচিত সকলের আস্থা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি পরিচিত জনগণের এই বিশ্বাস ও সহানুভূতিই হইল তাঁহার প্রকৃত মূলধন। তিনি একটি কোম্পানী গঠন করিলেন। তাঁহার চরিত্রগুণে ভাল ভাল লোক তাহার অংশীদার হইল। তাহার পর তিনি টাকা কর্জ করার জন্য ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হইলেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কহিলেন, 'তোমার মত বিশ্বাসী ও কর্মঠ যুবককে টাকা ধার দিতে ব্যাঙ্কের আপত্তি নাই।'

কারনেজী ব্যবসায়ক্ষেত্রে অগ্রসর—আরও অগ্রসর হইয়া চলিলেন। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনোবল ও শ্রমশক্তি ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

অতঃপর কারনেজী ইস্পাতের কারবার শুরু করিলেন। তাঁহার প্রতিভা ও পরিচালন-নৈপুণ্যে ইস্পাতের দাম অনেক কমিয়া গেল; অথচ তাঁহার নিজ ধনভাণ্ডার স্ফীত হইয়া উঠিল।

১৮৬২ সালে কারনেজী তেলের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিলেন। এ ব্যবসায়েও তাঁহার অসাধারণ সাফল্যে সকলে বিস্মিত হইল।

১৯০১ সালে কারনেজীর মনে এক নূতন চিন্তার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন—এই যে কোটি কোটি টাকা রোযগার করিলাম, ইহার পরিণাম কি? আমি কি ধনের গোলাম হইয়া গেলাম? না—আর রোযগার নয়; যে টাকা অর্জন করিয়াছি, ইহা দ্বারা আমার দুঃস্থ মানুষ ভাইয়ের উপকার করাই আমার কর্তব্য।

এই সময় হইতে দান ও পরোপকারই হইল তাঁহার জীবনের বৃহত্তম ব্রত।

১৯১৯ সালে তাঁহার মৃত্যু হইল। তখন ব্যাঙ্কে তাঁহার হিসাবে দেখা গেল তিনি দেড় শত কোটির উপর টাকা লোকহিতে দান করিয়াছেন।

কর্তব্যের খাতিরে

ইংরেজশাসিত ভারতের প্রথম ব্যাপক স্বাধীনতা সংগ্রাম বিদেশী শাসকের ভাষায় 'সিপাহী বিদ্রোহ' তুমুল বেগে চলিতেছে।

লক্ষ্ণৌয়ের রসদভাণ্ডার সিপাহীরা এমনভাবে লুণ্ঠন করিয়াছে যে সেখানে এক কৌটা বিস্কুটও অবশিষ্ট নাই। ইংরেজ সৈন্যরা ক্ষুধায় উন্মত্ত।

ডাক্তারী ভাণ্ডারে কিছু খাদ্য ছিল। ডাক্তার সর্বাধিকারী এই ভাণ্ডারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

জেনারেল হ্যাভ্‌লক একজন অ্যাডজুটেন্টকে ডাক্তার সর্বাধিকারীর নিকট পাঠাইয়া হুকুম দিলেন—ডাক্তারী ভাণ্ডারের খাদ্য রসদভাণ্ডারে এক্ষুণি দিয়ে দাও।

ডাক্তার সর্বাধিকারী উত্তর দিলেন—সেনাপতির লিখিত হুকুম ছাড়া আমি এক টুকরো খাদ্যও ছাড়ব না।

অ্যাডজুটেন্ট এই উত্তর লইয়া হ্যাভ্‌লকের কাছে ফিরিয়া গেল।

শুনিয়া হ্যাভলক তো আগুন: "কি! এত বড় বুকের পাটা ঐ ভেতো বাঙ্গালীর যে সে বৃটিশ সেনাপতির আদেশ অমান্য করে।?"

ক্রোধোন্মত্ত সেনাপতি মুক্ত তলোয়ার হাতে ছুটিলেন ডাক্তার সর্বাধিকারীর অফিসে এবং তাঁহাকে হাসপাতালে পাইয়াই গর্জিয়া উঠিলেন: "সামরিক হাপাতালের ডাক্তার, আপনি আপনার সেনাপতির আদেশ অমান্য করেছেন। আপনার শাস্তি কি, তা জানেন?" সর্বাধিকারী উত্তর দিলেন "জানি, সেনাপতি, আপনার আদেশ অমান্যের শাস্তি মৃত্যু।"

"উত্তম, তবে এখনই এবং এইখানেই আপনার সামরিক বিচার শুরু হবে।"

এই বলিয়া সেনাপতি সেখানে বসিয়া পড়িলেন এবং অ্যাড্‌জুটেন্টকে অভিযোগ উপস্থাপিত করিতে আদেশ দিলেন।

অ্যাড্‌জুটেন্ট ডাক্তার সর্বাধিকারীর অবাধ্যতার কথা উল্লেখ করিয়া চার্জ করিল।

সেনাপতি ডাক্তার সর্বাধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কৈফিয়ৎ কিছু আছে?"

সর্বাধিকারী বলিলেন, "আমার সামান্য এক টুকরো কাগজ আছে—তাই পড়তে চাই।"

হ্যাভ্‌লক—"উত্তম, পড়তে পারেন।"

ডাক্তার সর্বাধিকারী পকেট হইতে এক টুকরো কাগজ বাহির করিয়া পড়িলেন—কাগজটির নীচে হ্যাভ্‌লকের দস্তখত—"সেনাপতির লিখিত আদেশ ছাড়া ডাক্তারী ভাণ্ডার হইতে কোন কিছু অন্যত্র সরান যাইবে না।"

তাহার পর কাগজ টুকরা সেনাপতির হাতে দিয়া সর্বাধিকারী বলিলেন: "সেনাপতি, ডাক্তারী ভাণ্ডার হতে কোন কিছু সরাতে না দিয়ে আমি আপনার আদেশই পালন করেছি, এই কিন্তু আমার বিশ্বাস।"

হ্যাভ্‌লক উচ্চহাস্যে হাসপাতাল কাঁপাইয়া আদেশ দিলেন, "সামরিক বিচারালয় ভেঙ্গে দাও।"

শেষদান

ইসলামের মস্তকের উপর আবার বিপদের মেঘ ঘনাইয়া আসিল; ইয়ারমুকের ময়দানে ৪০ হাজার মুসলিম সৈন্যকে পিষিয়া মারিতে ২ লক্ষ ৪০ হাজার রোমক সৈন্য কাতার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

লড়াই শুরু হইল। রোমক সৈন্যগণ ভীমবিক্রমে মুসলিম বাহিনীর দক্ষিণ বাহু আক্রমণ করিল। দক্ষিণ বাহুর সেনাপতি সালামা মরণ-পণ করিয়া রোমক সৈন্যের গতিরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। শত্রুসৈন্যের আঘাতে সালামার শরীর জর্জরিত হইতে লাগিল।

সহসা দেখিলাম, তাঁহার তাজী শূন্যপৃষ্ঠে ময়দানে দৌড়িয়া ফিরিতেছে। আমি তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখিলাম, ক্রমাগত রক্তপাতে অবসন্ন হইয়া তিনি ময়দানে গড়াইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার চারিপাশে বহু হতাহত সৈন্য ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

আমি তাঁহার নিকটে গেলাম। তিনি প্রথমেই যুদ্ধের অবস্থা জিজ্ঞাসা করি-লেন। আমি বলিলাম, রোমক আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে, মুসলিম সৈন্যগণ পাল্টা আক্রমণ শুরু করিয়াছে, রোমক সৈন্যগণের ব্যূহে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে।

সহসা তাঁহার সেই মৃত্যুমলিন মুখ উৎসাহ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি তাঁহার শেষ শক্তিটুকু কেন্দ্রীভূত করিয়া দক্ষিণ কনুইয়ে ভর দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অগ্রসর বন্ধুগণ—অগ্রসর, আর দেরী নেই। বিজয়—বিজয়—আমি বিজয় দেখে...!" তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া গেলেন; অতি কষ্টে ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "পানি, ভাই, হোজায়ফা; পানি; ছাতি ফেটে গেল।"

আমি পানির খোঁজে ছুটিলাম এবং বহু কষ্টে সামান্য পানি সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। সালামা পানির পাত্র হাতে লইলেন। এমন সময় হিশাম ইবনুল আস নামক একটি আহত সৈন্য 'পানি' 'পানি' বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

সালামা পানির পাত্র অমনই নামাইয়া আমার হাতে দিলেন ও উক্ত আহত সৈন্যটির দিকে ইশারা করিয়া আমাকে বলিলেন, "ঐ ওকে দাও।"

আমি সরিয়া গিয়া হিশামের হাতে পানির পাত্র দিলাম। পানির পাত্র দেখিয়া হিশাম বড় খুশী হইল এবং মাথা উঁচু করিয়া পানি পান করিতে উদ্যত হইল।

এমন সময় দূর হইতে চীৎকার আসিল--"পানি—হায়, এক ফোঁটা পানি।" হিশাম পাত্র নামাইয়া ঐ চীৎকারের দিকে ইশারা করিয়া আমাকে বলিল, "ঐ ওকে দাও, ওর কষ্ট বেশী।"

পানি লইয়া দ্রুত আবার সেই তৃতীয় আহতটির নিকট গেলাম ; তাহাকে পানি দিতে গিয়া দেখিলাম, ইহজীবনের পিপাসার সীমা অতিক্রম করিয়া সে চলিয়া গিয়াছে।

পানি লইয়া হিশামের নিকট ফিরিয়া আসিলাম, দেখিলাম, সেও মহাপ্রয়াণ করিয়াছে।

কাঁপিতে কাঁপিতে পানি লইয়া সালামার দিকে অগ্রসর হইলাম ; হায়! সালামাও আর ইহজগতে নাই।

এ যুদ্ধে বহু মুসলিম যোদ্ধা প্রাণদান করিয়া ইসলামের ইজ্জত রক্ষা করিল ; ইয়ারমুক বিজয়ের ভাস্বর প্রভায় দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সালামা ও হিশামের এই শেষদানের মহিমারশ্মির সম্মুখে ইয়ারমুক বিজয়ের বিরাট কীর্তি-গরিমা ম্লান হইয়া গেল।

—হীরকহার

শাসন ও পোষণ

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা)—তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠ কঠোর শাসনে রাজ্যে দুর্বৃত্তদল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার সুবিচারের ছায়াতলে উৎপীড়িত, দুর্বলেরা আশ্রয় পাইয়াছে।

একদা রাত্রিতে খলীফা উমর (রা.) সহচর ইব্‌নে আব্বাস (রা.)-কে সঙ্গে লইয়া প্রজাদের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য ছদ্মবেশে বাহির হইলেন। কয়েকটি মহল্লা পরিভ্রমণের পর একস্থানে ছোট ছোট বালক বালিকাদের ক্রন্দন কোলাহল শোনা গেল।

উমর (রা.) সেদিকে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, একটি জীর্ণ কুটিরে এক বৃদ্ধা চুলায় ডেগ চড়াইয়া জ্বাল দিতেছে, আর কয়েকটি শিশু তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া ক্ষুধায় ক্রন্দন করিতেছে। বৃদ্ধা বলিতেছে, ''একটু সবুর, বাছারা, এই পাক হয়ে গেলেই তোদের খেতে দেব।''

হযরত উমর (রা.) অনেকক্ষণ এই অবস্থা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধার নিকট গেলেন এবং তাহাকে বলিলেন, ''তোমার কি হয়েছে, শিশুগুলিকে ডেগ হতে খেতে দিচ্ছ না কেন?''

বৃদ্ধা উমর (রা.)-এর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া করুণস্বরে কহিল, ''ডেগে কি কিছু আছে, বাবা, যে খেতে দেব?''

উমর—তবে এতক্ষণ ডেগে পাক করলে কি?

বৃদ্ধা—পানি আর পাথর।

উমর—তার মানে?

বৃদ্ধা—ঘরে খাবার কিছুই নাই, তাই ডেগে খাবার পাক করছি ভান করে ওদের ভুলিয়ে রেখেছি, যাতে ওরা অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, আমিও রেহাই পাই।

উমর—বেশ। কিন্তু, মা আমার ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি ওদের অমনি ভুলিয়ে রাখ, দেখো যেন ঘুমিয়ে না পড়ে।

ইবনে আব্বাস (রা.)-কে লইয়া উমর (রা.) অতি দ্রুত মালগুদামে গেলেন। গুদামের দরজা খুলিয়া তিনি নিজে এক বস্তা ময়দা, লাকড়ী ও মসলা লইলেন এবং ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাতে ঘৃতের একটা হাঁড়ি দিয়া বলিলেন, ''তাড়াতাড়ি কর, শিশুরা ঘুমিয়ে না পড়ে।''

হযরত উমর (রা.)-এর ললাট বাহিয়া ময়দা ঝরিতেছিল এবং বোঝার চাপে তাঁহার পিঠ বাঁকা হইয়া যাইতেছিল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ইবনে আব্বাস (রা.) বোঝা বদল করিতে চাহিলেন। উমর (রা.) বলিলেন, ''হাশরের ময়দানে তুমি কি আমার পাপের বোঝাটি বহন করে নেবে?''

উমর (রা.) অনতিবিলম্বে বৃদ্ধার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং বোঝা নামাইয়া চুলায় লাকড়ী দিয়া উপুড় হইয়া ফুঁ দিতে লাগিলেন। তাঁহার দাড়ির ফাঁক দিয়া ধূয়া নির্গত হইতেছিল। তৎপর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ঘৃত ময়দা ইত্যাদি ডেগে দিয়া উমর (রা.) নাড়িতে লাগিলেন। বৃদ্ধা শিশুদের সঙ্গে গল্প করিয়া যাইতেছিল।

খাবার তৈয়ার হইয়া গেল। উমর (রা.) নিজ হাতে পরিবেশন করিয়া শিশু-দিগকে পরম পরিতোষের সঙ্গে খাওয়াইলেন। শিশুরা পরিতৃপ্ত হইয়া হাসি-খেলা করিতে লাগিল। উমর (রা.)-ও হাসিলেন এবং তাহাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিলেন।

অবশেষে শিশুরা ঘুমাইয়া পড়িল। তখন উমর (রা.) বৃদ্ধাকে বলিলেন, ''তোমার কি আর কেউ নাই, মা?'' বৃদ্ধা বলিল, ''আমার আর কেউ নাই। কয়েক মাস আগে এদের বাপ মারা গিয়াছে। বিষয়-আশয় কিছু নাই—যা সামান্য ছিল এখন নিঃশেষ; এদেরকে রেখে কোথাও যাওয়ার উপায় নাই; এক মুহূর্তও এরা আমায় ছাড়া থাকতে পারে না। এমন কি খলীফার কাছে আমার অবস্থা-টুকু জানাবার একটা লোকও আমার নাই।''

উমর (রা.) বলিলেন, ''দেখ, আমি খলীফাকে তোমার অবস্থা জানিয়ে তোমার ও তোমার শিশুদের জন্য ভাতা মঞ্জুর করিয়ে দিব; তুমি ঘরে বসেই তা পাবে।''

অতঃপর খলীফা গৃহে ফিরিলেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে।

পরদিন ভোরে উমর (রা.) ভাতা মঞ্জুর করতঃ তাহা যথানিয়মে বৃদ্ধার বাড়ী পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

—ছালাছীল

ঈমানের সহিত মৃত্যু

একজন আরব সর্দার রসূলুল্লাহ্ (স.)-কে সংবাদ পাঠাইল, ''হুজুর, আমার কওমের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করিতে উৎসুক, কিন্তু উপযুক্ত প্রচারক নাই; দয়া করিয়া কয়েকজন প্রচারক পাঠাইবেন।''

মহানবী (স.) কয়েকজন প্রচারককে পাঠাইলেন। কিন্তু ইঁহারা সর্দারের এলাকার মধ্যে প্রবেশ করিতেই সর্দার লোকজন দিয়া ইঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল ও বলিল, ''হয় আত্মসমর্পণ কর, নয় মৃত্যুর জন্য তৈয়ার হও।'' খোবায়েব-ইবনে-আদী ও জায়েদ-ইবনে-আশনা ইহাদের আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাদের সাথীরা সর্দারের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না, তাঁহারা যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুর পেয়ালা পান করিলেন।

সর্দার খোবায়েব ও জায়েদকে বন্দী করিয়া মক্কায় পাঠাইল। বদরের লড়াইয়ে খোবায়েব মক্কার এক সর্দারকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহার ছেলেরা এবার কোমর বাঁধিয়া বলিল, "এইবার বাগে পাইয়াছি। পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ লইতে হইবে।" তাহারা খোবায়েবকে কিনিয়া লইয়া তাঁহার হাত-পা শিকলে বাঁধিয়া এক অন্ধকার কারাগারে ফেলিয়া রাখিল। খোবায়েবের করুণ আর্তনাদে সর্দারের অন্দরের এক মহিলার মনে দয়া হইল। সে চুপে চুপে কারাদ্বারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বন্দী তোমার কিছু খাইতে ইচ্ছা হয়?"

দুই চোখে কৃতজ্ঞতার অশ্রু ভরিয়া খোবায়েব বলিলেন, "না, মা, আমার আর কোনই ইচ্ছা নাই; কেবল আমাকে দয়া করিয়া বলিয়া দাও, কখন আমাকে মরিতে হইবে; আর যদি পার, তার আগে আমাকে একখানা ক্ষুর পাঠাইয়া দাও।" মহিলাটি চলিয়া গেল ও অল্পক্ষণ পরেই তাহার ছেলেকে দিয়া একটি অতি তীক্ষ্ণ ধার ক্ষুর পাঠাইয়া দিল। নধরকান্তি সুন্দর সৌম্য শিশু—খোবায়েব তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিতে করিতে বলিলেন, "কী বোকা মা তোমার, বাছা! নইলে কেহ কি আপন পুত্রকে এভাবে দুশমনের কাছে পাঠায়?"

মহিলাটির মনেও বোধ হয় অমন আশঙ্কাই জাগিয়াছিল, কারণ অল্পক্ষণ মধ্যেই সে পাগলিনীর মত ছুটিয়া আসিল।

খোবায়েব মায়ের কোলে শিশু পুত্রকে তুলিয়া দিতে দিতে কহিলেন, "ভয় নাই, মা, ইসলামে বিশ্বাসঘাতকতা নাই।"

খোবায়েবের মৃত্যুমুহূর্ত ঘনাইয়া আসিল। তাঁহাকে মুক্ত ময়দানে লইয়া যাওয়া হইল। তিনি সেখানে শেষ নামায আদায় করিলেন। ফাঁসিতে ঝুলিবার সময় আবার খোবায়েবকে বলা হইল "এখনো সময় আছে, খোবায়েব ইসলাম ত্যাগ কর, নতুন জীবন লাভ কর।"

অবিচলিত কণ্ঠে খোবায়েব বলিলেন, "ইসলামহীন জীবনে বাঁচিয়া থাকার চেয়ে ঈমানের সহিত মৃত্যু সহস্র গুণে শ্রেয়।"

উচ্চ ফাঁসির মঞ্চে সহস্র নির্মম তীরে জর্জরিত হইয়া বীর শহীদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

—হৃদয়রীয়াতে ইসলাম

পরিখার পারে মুস্তফা কামাল

[১]

প্রথম মহাযুদ্ধ। গ্যালিপলী। বৃটিশ ও ফরাসী রণতরী বহর হইতে ক্রম ক্রম কামান গর্জিতেছে ; তুরস্কের আত্মরক্ষামূলক আয়োজন সে প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে ক্রমে ধসিয়া পড়িতেছে ; তুরস্কের সর্বত্র আসন্ন পরাজয়ের বিষাদ ছায়া ছাইয়া ফেলিয়াছে।

[২]

তুর্ক সৈন্য পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন ফন স্যাণ্ডার্স। স্যাণ্ডার্স মুস্তফা কামালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

স্যাণ্ডার্স—অবস্থা ভীষণ সঙ্গীন।

কামাল—তাই, সেনাপতি।

স্যাণ্ডার্স—আর বুঝি গ্যালিপলী রক্ষা করা সম্ভব নয়।

কামাল—(শুধু নীরবে সেনাপতির দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন)

স্যাণ্ডার্স—চুপ রইলে যে মুস্তফা কামাল ?

কামাল—আমি এ সম্বন্ধে সেনাপতির সঙ্গে একমত নই।

স্যাণ্ডার্স—কিন্তু আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, গ্যালিপলী রক্ষা অসম্ভব।

কামাল—'অসম্ভব' বলে আমি কিছু বিশ্বাস করি না।

স্যাণ্ডার্স—তারপর ?

কামাল—আমি বিশ্বাস করি, গ্যালিপলীকে এখনো রক্ষা করা সম্ভব।

স্যাণ্ডার্স—সত্যি বিশ্বাস কর ?

কামাল—সত্যি করি ; আর সেই ঈমান বুকে নিয়ে লড়তে লড়তে আমি মরতে রাজী।

স্যাণ্ডার্স—তাহলে গ্যালিপলী রক্ষার ভার গ্রহণ করতে পার ?

কামাল—যদি হুকুম করেন, পারি।

স্যাণ্ডার্স—আমি হুকুম করছি।

কামাল—আমি গ্রহণ করলাম।

শত্রুপক্ষের একটি কামান মুহুর্মুহু গর্জিতেছিল। এ পক্ষের সর্ব-সম্মুখস্থ যে পরিখা, তাহারই পারে বসিয়া সেনাপতি মুস্তফা কামাল দূরবীন চোখে শত্রু সৈন্য পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। তুর্ক সৈন্যরা ভাবিয়া হয়রান।—তাহাদের সেনাপতি যে একদম দুশমনের তোপের মুখে!

একটা গোলা আসিয়া পরিখার একটু দূরে ভীষণ শব্দে ফাটিয়া গেল। সৈন্যদের চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল: চলে আসুন, সেনাপতি—চলে আসুন। কিন্তু তাহাদের আওয়াজ গলায় আটকাইয়া গেল। আবার একটি গোলা সোঁ—সোঁ শব্দে আসিয়া পরিখার আরও নিকটে পড়িয়া ফাটিল। তুর্ক সৈন্যরা সভয়ে দেখিল, পরিখার উপর কেবল ধূমের রাশি—তাহাদের সেনাপতির চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। একটু পরে ধূম উড়িয়া গেল: দেখা গেল, মুস্তফা কামাল সেখানেই বসিয়া শত্রুর গতিবিধি পরীক্ষা করিতেছেন। সৈন্যরা নীরবে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিল, তাহার পর ফিসফিস করিয়া বলিল, "আরে, আমাদের সেনাপতি কি মানুষ, জীন, না ফিরিশতা?" কিন্তু আবার শত্রুর গোলা—আবার ভীষণ শব্দ—আবার ধূমের কুণ্ডলী—আবার সৈন্যদের ত্রাস। এবার আর তাহারা চুপ থাকিতে পারিল না; চীৎকার করিয়া বলিল, "পরিখায় নেমে পড়ুন, হুজুর, নিজেকে রক্ষা করুন।"

কিন্তু ভয়-বিমূঢ় সৈন্যরা দেখিল, তাহাদের সেনাপতি আস্তে মুখ ফিরাইলেন, তাঁহার দুই হাতের তালু একত্র করিয়া তাহার ফাঁকে ডাকিয়া বলিলেন:

"না, বন্ধুগণ, বড্ড দেরী হয়ে গেছে—এখন পালিয়ে একটা কুআদর্শ দেখাতে পারি না।"

তাহার পর পকেটে হাত দিয়া সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া ধীরে একটি সিগারেট ধরাইলেন।

এইবার চতুর্থ গোলা আকাশের বুক বিদীর্ণ করিয়া আসিয়া ফাটিয়া পড়িল—ঠিক যেন মুস্তফার মাথার উপর! গোলার আগুনের তীব্র শিখার ঝলকে সৈন্যদের চোখ ঝলসিয়া গেল; তাহারা চোখ বুঁজিল। দুই হাতে কান চাপিয়া ধরিল। তাহার পর সভয়ে চাহিল সেই স্থানের দিকে যেখানে তাদের প্রিয় সেনাপতি আসীন ছিলেন। দেখিল, মুস্তফা কামাল সেখানেই বসিয়া আরামের সঙ্গে মুখ হইতে সিগারেটের ধূম ছাড়িতেছেন!

অবশেষে মুস্তফা কামালের কথাই টিকিল—গ্যালিপলী রক্ষা সম্ভব হইল—তুর্কের হাতে মার খাইয়া বৃটিশ সৈন্য চার হাজার লাশ ফেলিয়া পলায়ন করিল।

—কার্কনেস

Kamal Ataturk—**K. Kirkness**

রাজ্যবিনিময়ে গ্রন্থ

পূর্বে রোমক সাম্রাজ্যের অধিপতিগণ বাগদাদে খলীফাগণকে বার্ষিক যে কর দিতেন, নয়েসফোরাস (Nicephorus) সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং খলীফা হারুন-অর-রশীদকে লিখিয়া পাঠাইলেন :

"রোমক সম্রাট নয়েসফোরাসের নিকট হইতে আরব অধিপতি হারুনের প্রতি : আমার পূর্বে যে সম্রাজ্ঞী সিংহাসনে আসীন ছিলেন, তিনি তোমাকে শিকারীর পদ দিয়া নিজে শিকারের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তোমাকে বিপুল ধনরাশি প্রদান করিয়াছিলেন ; আর এ সমস্তের কারণ তাঁহার নারীসুলভ দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতা। এখন লিখি, আমার এই পত্র পাঠমাত্র তুমি সে সব ধনরাশি ফেরত পাঠাইবে, অন্যথায় তলোয়ার তোমার আমার মধ্যে মীমাংসা করিবে।"

পত্র পাঠ করিয়া হারুন-অর-রশীদের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি ঐ পত্রেরই অপর পৃষ্ঠায় লিখিয়া দিলেন :

"আমি তোমার পত্র পড়িয়াছি ; ইহার উত্তর তুমি কানে শুনিবে না, চোখে দেখিবে।"

খলীফা সেই দিনই সৈন্যসামন্তসহ রোমক সম্রাটের পত্রের উত্তর দিতে যাত্রা করিলেন।

হিরকলা (Heracleus) নামক রোমক শহরের উপকণ্ঠে নয়েসফোরাসের সঙ্গে হারুন-অর-রশীদের সাক্ষাৎ হইল। মুসলিম-খৃস্টানের অস্ত্র-সংঘাতে লড়াইর ময়দান মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু আরব শৌর্যের সম্মুখে খৃস্টানগর্ব অধিকক্ষণ

টিকিতে পারিল না; নয়েসফোরাস পরাজিত হইলেন এবং পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ করদানে সম্মত হইয়া সন্ধিভিক্ষা করিলেন। খলীফা সন্ধিপত্রে শর্ত দিলেন, তৎকর্তৃক বিজিত নয়েসফোরাসের রাজ্যাংশের বিনিময়ে নয়েসফোরাসের সাম্রাজ্যের যেখানে দর্শনবিজ্ঞানঘটিত যত গ্রন্থ আছে, তাহার এক এক প্রস্থ নকল হারুন-অর-রশীদকে পাঠাইতে হইবে। নয়েসফোরাস সম্মত হইলেন, সন্ধি হইয়া গেল।

হারুন-অর-রশীদের প্রেরিত কয়েকজন পণ্ডিত এশিয়া মাইনরের যাবতীয় পুস্তকাগার তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাস করতঃ বহু অমূল্য গ্রন্থ তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এই গ্রন্থরাজির সঙ্গে একটি ফিরিস্তী পাওয়া গেল। ফিরিস্তীর সঙ্গে সংগৃহীত গ্রন্থরাজি মিলাইয়া দেখা গেল, ফিরিস্তীতে উল্লিখিত আরস্তু (Aristotle), আলাতুন (Plato), জালিনুস (Galen), সোকরাত (Socrates) প্রভৃতি মনীষীদের লিখিত বহু পুস্তক তখনও সংগৃহীত হয় নাই। হারুন-অর-রশীদ এই সব গ্রন্থ সংগ্রহের আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার ডাক পড়িল; তিনি মহাপ্রয়াণ করিলেন।

হারুন-অর-রশীদের সুযোগ্য পুত্র মামুন পিতার অসমাপ্ত কাজে হাত দিলেন এবং রোমক সম্রাটকে লিখিলেন:

"কনস্টান্টিনোপল, মকদুনিয়া ও এথেন্স প্রভৃতি স্থানের পুস্তকাগার সমূহে এখনও বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে। গ্রন্থগুলি দয়া করিয়া পাঠাইলে বিশেষ বাধিত হইব।"

তখন এথেন্স নগরে একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল এবং ঐ গ্রন্থাগার অখৃস্টান গ্রীক ও রোমক পণ্ডিতদের অমূল্য গ্রন্থরাশিতে পূর্ণ ছিল। এই সকল গ্রন্থপাঠ খৃস্টানধর্মের হানিকর, এই বিশ্বাসে সম্রাট কনস্ট্যান্টাইন্ উক্ত লাইব্রেরীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া তালাবদ্ধ করিয়া দেন এবং মৃত্যুকালে তিনি একটি ওসিয়ৎ করিয়া যান যে, তাঁহার পর যাঁহারা সম্রাট হইবেন তাঁহারা প্রত্যেকে যেন ঐ লাইব্রেরীটির দরজায় একটি তালা লাগাইয়া দেন। এইরূপে পুস্তকাগারটি সপ্ততালাবদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছিল।

রোমক সম্রাট মামুনের পত্র পাইয়া বিচলিত হইলেন; কারণ নিষিদ্ধ হইলেও গ্রন্থাগারটির প্রতি তাঁহার বিশেষ মমতা ছিল। তিনি মন্ত্রিগণকে ডাকাইলেন।

মন্ত্রিগণ বলিলেন, "এ আপদ পাঠাইয়া দেওয়াই উচিত; কারণ এসব গ্রন্থ মুসলমান দেশে প্রচারিত হইলে তাহাদের ধর্মের সর্বনাশ ঘটিবে।"

এ মন্ত্রণা সমীচীন বোধ হইল। সম্রাট এই লাইব্রেরীর যাবতীয় গ্রন্থাদি বাগদাদে পাঠাইয়া দিলেন।

মামুন পরম আগ্রহে সেই গ্রন্থগুলি রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষা করতঃ অল্পকাল মধ্যেই সে সবের আরবী অনুবাদের ব্যবস্থা করিলেন।

মুসলিম জগতের জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূত্রপাত হইল।

—মকালাতে শিবলী

রাবেয়া (র.)-এর প্রার্থনা

অবশেষে মৃত্যু যবে আসি মম পাশে
কহিবে, হে বন্ধু চল, শুধু স্বর্গ আশে
তখন তাকাই যদি, হে প্রিয় মহান,
নরকের গর্ভে যেন হয় মোর স্থান।
তুমি-হীন স্বর্গে যদি কেহ মোরে ডাকে,
স্বর্গ ও নরকে তবে কি তফাৎ থাকে?

হে বিশ্ববিধাতা, মানুষের রক্তে অবগাহন করে যে তলোয়ার ভীম কীর্তি অর্জন করে, আমাকে বিজয়ীবীরের হাতের সেই শাণিত তলোয়ার করো না, আমাকে করো তুমি সেই উপেক্ষিত ক্ষীণ-যষ্ঠি, অন্ধ যার সাহায্যে পথ চলতে পারে। আমাকে সে বিরাট বজ্র-বক্ষ মহীরুহ করো না যার পল্লবে নির্মিত হয় যোদ্ধার হাতের গুর্জ, আমাকে করো তুমি পথের ধারের পাতাবহুল সেই ছোট গাছ, ক্লান্ত পথিক যার ছায়াতলে বসে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করতে পারে।

হে আমার প্রভো, তুমি আমার জন্য এ দুনিয়ার হিস্সা যা রেখেছ, তা তোমার দুশমনদেরকে দাও, পরলোকের যে হিস্সা আমার জন্য রেখেছ, তা দাও তোমার দোস্তদেরকে ; আমার জন্য তুমিই যথেষ্ট।

হে পরমদাতা, তোমার জন্য এই যে আমার অন্তরে অনুক্ষণ আশার দীপ জ্বলছে, আমার প্রতি এই ত তোমার সবচেয়ে বড় দান। আমার রসনায় তোমার মহিমা-স্তুতিই মধুরতম শব্দ, আর তোমার সঙ্গে আমার যে গোপন সাক্ষাৎ, আমার পক্ষে ঐ মিলন-মুহূর্তই তো সবচেয়ে মূল্যবান সময়।

হে দয়াল আল্লাহ্, ইহ দুনিয়ায় তোমাকে স্মরণ না করে আমি থাকতে পারি না, পরকালে তোমার সাক্ষাৎ না পেলে, সে ব্যথা আমি কি করে সইব ?

হে আমার প্রিয়, ইহ দুনিয়ায় আমার সর্বোত্তম আকাঙ্খা এই যে তোমায় যেন আমি হামেশা স্মরণ করতে পারি, পরকালে আমার সর্বোত্তম আকাঙ্খা এই যে কেবল তোমায় যেন আমি দেখতে পাই।

হে দরদী বন্ধু, এই যে আমি তোমার উপাসনা করি; এ কি দোযখের ভয়ে? তা যদি হয়, তবে দোযখেই যেন আমার চির নির্বাসন হয়। আর যদি বেহেশতের বিলাস লোভে আমার উপাসনা হয়, তবে সামনে বেহেশতের দুয়ার যেন চির-রুদ্ধ থাকে। কিন্তু আমি যদি শুধু তোমারই জন্য তোমার উপাসনা করে থাকি, তাহলে তোমার চিরপ্রতীক্ষিত দর্শন হতে যেন আমি বঞ্চিত না হই।

—মারগারেথ স্মিথ : এমদাদ আলী

জালিম সিংহের ময়দান

নবাব সরফরাজ খাঁ বাংলার সুবাদার, আর আলীবর্দী খাঁ বাংলার সুবাদারীর প্রার্থী—উভয়ের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম। সংগ্রামে সরফরাজ খাঁর পরাজয় ঘটিল। কিন্তু সে দিনের সেই রক্তাক্ত ময়দানে যে একটি রত্ন সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া সে মালিমাকে পরাজিত করিয়াছিল, আজও তাহা সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হইয়া যায় নাই।

নবাব সরফরাজ খাঁ দুর্জয় সাহসে লড়িতেছিলেন। মাহুত বলিল, "হুজুর, এদলের অনেক লোক দুশমনের দলে গিয়া যোগ দিল; আমাদের পরাজয় একরূপ নিশ্চিত।" নবাব উত্তর করিলেন, "উত্তম—তারপর?" মাহুত বলিল, "হুজুর, যদি অনুমতি করেন তবে আমি হাতী হাঁকিয়ে হুজুরকে বীরভূমের জমিদার বদীউজ্জামানের নিকট নিয়ে যাই।" নবাব মাহুতের ঘাড়ে এক প্রবল মুষ্ঠ্যাঘাত করিয়া গর্জিয়া উঠিলেন, "হতভাগা, হাতীর পা শিকল দিয়ে এক্ষণি শক্ত করে বেঁধে দে: আমি ঐ কুকুরগুলির সামনে থেকে কিছুতেই পশ্চাদাবর্তন করব না।"

তারপর লড়িতে লড়িতে সরফরাজ খাঁ তলোয়ার হাতে মৃত্যুবরণ করিলেন।

সরফরাজ খাঁর রাজপুত সেনাপতি বাজী সিংহ লড়াইয়ের ময়দান হইতে দূরে ছিলেন। সরফরাজ খাঁর পতন সংবাদে বাজী সিংহ তীরের মত ছুটিয়া আসিলেন; সঙ্গে আসিল তাঁহার নয় বৎসরের পুত্র জালিম সিংহ।

বাজী সিংহ অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তলোয়ারের সম্মুখ হইতে শত্রুরা ভাগিয়া চলিল। অবশেষে তিনি আলীবর্দী খাঁর নিকটবর্তী হইলেন। তাঁহার অব্যর্থ বর্শা এক আঘাতে আলীবর্দী খাঁকে ভূপাতিত করিতে উদ্যত, এমন সময় তিনি শত্রুপক্ষের গুলীর আঘাতে নিহত হইলেন।

বড় যোদ্ধাদের লাশ লইয়া কাড়াকাড়ি হয়। কোন সৈন্য হয়ত পুরস্কারের আশায় লাশের মস্তক কাটিয়া নিয়া সেনাপতির নিকট উপস্থিত করে। কোন কোন সময় আস্ত লাশটিকেই তুলিয়া নেয়। বাজী সিংহের লাশের দিকেও কয়েকটি সৈন্য ধাবিত হইল। কিন্তু পুত্র জালিম সিংহ তলোয়ার খুলিয়া সগর্বে লাশের পাশে দাঁড়াইল; বলিল, "এ আমার পিতার লাশ, আমি লাশের সৎকার করব। খবরদার, কেউ যেন এ লাশের কাছে না আসে। এলে তার গর্দানে মুণ্ড থাকবে না।"

বালক বীরের সাহস দেখিয়া আলীবর্দীর সৈন্যরা স্তম্ভিত হইয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। নির্ভীক বালক তলোয়ার উঁচু করিয়া পাহারায় রহিল।

আলীবর্দী খাঁ জালিম সিংহের সাহস লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি নিকটে আসিয়া জালিম সিংহকে বলিলেন, "শাবাশ বালক বীর, শাবাশ! সৈন্যগণ, তোমরা সরে দাঁড়াও, আর বাজী সিংহের লাশের উপযুক্ত সৎকারের ব্যবস্থা কর।"

গোলান্দাজ বাহিনীর সাহায্যে বাজী সিংহের লাশ শ্মশানে চলিল, কয়েকজন সৈন্য পর পর জালিম সিংহকে তাহাদের কাঁধে লইয়া শবের অনুগমন করিল।

আজিও এই লড়াইর ময়দান জালিম সিংহের ময়দান বলিয়া পরিচিত।

—রিয়াজুস্ সালাতীন

সত্যের পথে

অকারণে অত্যাচারিত হইয়াও মহানবী (স.) তায়েফবাসীদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কাঁদিয়া কহিয়াছিলেন :

'ওরা বেঁচে থাক : ওরা যদিও আমার ডাকে সাড়া দেয় নাই, ওদের সন্তান-সন্ততিরা অন্তত দিবে।'

এতদিন অপেক্ষা করিতে হইল না : অল্পকাল মধ্যেই তায়েফবাসীরা সত্যের আহ্বানে সাড়া দিল।

তবে ব্যথার পথে। কিন্তু যুগে যুগে ইহাইতো হইয়া আসিয়াছে। ব্যথার কাঁটার বুকেই ত ফুটিয়াছে ফুল, শহীদের রক্তই ত জমিয়া সাফল্যের কুসুমে সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

হোদায়বিয়া সন্ধির পর। তায়েফের সর্দার ওরওয়া মহানবী (স.)-এর সাক্ষাৎ পাইলেন। এবার হযরত (স.)-এর কথা মন দিয়া শুনিলেন। ভাবিলেন, 'তাইতো, এত জুলুমের পরও যখন লোকটা তার কথা ছাড়ছে না, তখন শুনে দেখি, সে কি বলে।'

রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর প্রাণময়ী বাণী, তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর ব্যবহার, তাঁহার দিলের অনাবিল দরদ : ওরওয়া মুগ্ধ হইলেন।

বলিলেন, 'রসূলুল্লাহ্ (স.) আমায় দীক্ষা দিন : আমি ইসলাম কবুল করছি : দেশে গিয়ে আমি সবাইকে ইসলামে ডেকে আনবো।'

মহানবী (স.) তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন, কিন্তু বলিলেন, 'ওরওয়া, তোমার দেশের লোক তোমার উপর জুলুম করবে ; হয়ত তোমার জান নেওয়ার চেষ্টা করবে। অতএব ধীরে চল—আপাততঃ সবুর কর।'

কিন্তু ওরওয়া তখন নবসত্য লাভের আনন্দে অধীর – সে সত্য তাঁহার দেশবাসীদের মধ্যে বিতরণ না করা পর্যন্ত তাঁহার মনে শান্তি নাই।

ওরওয়া তায়েফে ফিরিয়াই সবাইকে ডাকিলেন ; বলিলেন তাঁহার মহাসত্য গ্রহণের কথা : আহ্বান করিলেন সবাইকে এই নব সত্যের পথে।

কিন্তু 'উজ্জা'র উপাসকেরা তখনও তাহাদের সনাতন বিশ্বাসে অটল রহিল, পুরোহিতেরা ক্ষেপিয়া উঠিল।

তাহার পর শুরু হইল জুলুমের পালা। পাথর মারিয়া মারিয়া ওরওয়াকে রাখিল না; দেহময় ক্ষত লইয়া ওরওয়া শহীদের শয্যা গ্রহণ করিলেন।

মরণ মুহূর্তে ওরওয়া বলিয়া গেলেন: 'আমার একটুও দুঃখ নাই; বরং আল্লাহ্‌র পথে যে মরতে পেলাম, এই-ই আমার সৌভাগ্য। আমার রক্তে যেন তায়েফবাসীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, এই প্রার্থনা রেখে গেলাম।

তাহাই হইল, অনুতপ্ত তায়েফবাসীরা অনতিবিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করিল।

—আমীর আলী
(Spirit of Islam)

লীডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কাহিনী

হল্যাণ্ড। লীডেন শহর। শহরের চতুর্দিকে দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের শ্যামলিমা, ফল-ফুলের বাগান, শহরের বুকের উপর দিয়া রাইন নদী শত ধারায় বিচ্ছিন্ন হইয়া কুলু কুলু রবে বহিয়া যাইতেছে। সমস্ত শহরটি যেন একখানি মনোহর স্বপ্নের ছবির মত ফুটিয়া রহিয়াছে। অধিবাসীরা অখণ্ড শান্তির মধ্যে তাহাদের দৈনন্দিন গৃহকর্ম সম্পন্ন করিতেছে।

কিন্তু অকস্মাৎ ১৫৭৪ খৃস্টাব্দের মে মাসে এই সুন্দর শান্তিময় নগরের নির্মল আকাশে দুর্যোগের কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিল।

স্পেনের দোর্দণ্ড প্রতাপ রাজা ফিলিপ তখন গোঁড়া ক্যাথলিক মতাবলম্বী। ইউরোপের সর্বত্র প্রোটেস্ট্যান্টদিগকে দমন করিয়া তাহাদের উপর ক্যাথলিক ধর্মমত চাপাইয়া দেওয়া তাঁহার পণ। স্পেনীয়রা ইউরোপময় উৎপাত শুরু করিয়াছে। কিন্তু লীডেনের অধিবাসীরা কিছুতেই তাহাদের নিকট নতি স্বীকার করিতেছে না।

লীডেন অধিবাসীদের কোনো মতেই দমন করিতে না পারিয়া অবশেষে এক স্পেনীয় সেনাপতির অধীনে এক বিরাট সেনাবাহিনী আসিয়া লীডেন অবরোধ করিয়া বসিল। লীডেনে যে ক্ষুদ্র রক্ষীবাহিনী ছিল, তাহারা নগরের সমস্ত তোরণ বন্ধ করিয়া দিয়া নগর রক্ষায় লাগিয়া গেল। নগরে মৌজুদ খাদ্যের পরিমাণ বেশী ছিল না। খাদ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করিয়া অধিবাসীদিগকে অতি-সামান্য খাদ্য দেওয়া হইতে লাগিল।

হল্যাণ্ড সমুদ্রপৃষ্ঠ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিম্নে অবস্থিত। সমুদ্রের কিনারায় পাথর ও সিমেন্টের বিরাট বিরাট উঁচু বাঁধ দিয়া সমুদ্রের পানিকে ঠেকাইয়া রাখিতে হয়। লীডেনের বাহিরেও এমনি কতকগুলি বাঁধ রহিয়াছে।

স্পেনীয় সেনাপতি সমুদ্রের ধার দিয়া সৈন্য মোতায়েন করিয়াছেন। সমুদ্র-পথে নৌকা পাঠাইয়া বা অন্য কোনও ভাবে নগরে পৌঁছাইবার উপায় নাই। হল্যাণ্ডের রাজা প্রিন্স-অব অরেঞ্জ নগরবাসীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতেছেন।

অবশেষে একটি উপায়ের পরিকল্পনা তাঁহার মাথায় আসিল, সে হইতেছে সমুদ্রের বাঁধ ভাঙিয়া দেওয়া। বাঁধ ভাঙিয়া দিলে ভীষণ জোরে সমুদ্রের পানি ঢুকিয়া স্পেনীয় সৈন্যদের ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, লীডেন রক্ষা পাইবে।

দেশের লোকেরা এই পরিকল্পনায় সম্মত হইল। তাহারা বলিল, "শত্রুর পদানত হওয়ার চেয়ে দেশ পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া সেও ভাল।"

আগস্ট মাস। শহরের পশ্চিম দিকের বাঁধ ভাঙিয়া দেওয়া হইল। ভাঙার মুখ দিয়া প্রবল বেগে সমুদ্রের পানি অবরুদ্ধ লীডেনের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। হঠাৎ ক্রমাগত পানি বাড়িয়া উঠিতে দেখিয়া স্পেনীয় সৈন্যরা প্রথমে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল, তারপর যখন ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল, তখন ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

ওলন্দাজ রাজা দুই শত নৌকার একটি বহর নগর উদ্ধারের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু আক্রমণকারীরা এরূপ সতর্কতার সহিত পাহারা দিতেছিল যে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত সে নৌবহর নগরের কাছেই আসিতে পারিল না।

লীডেন শহর হইতে পাঁচ মাইল দূরের একটি বাঁধ দখল করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া হইল। ভাঙা জায়গার ভিতর দিয়া নৌকাগুলি ঢুকিয়া পড়িল। ইহার পরের বাঁধটি এখনও পানির এক ফুট উঁচুতে, এটাকেও ভাঙিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তারপর অল্প পানিতে নৌকাগুলি ঠেকিয়া গেল। পানি এত কম যে আর অগ্রসর হওয়া যায় না। মাত্র একটি খাল দিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেটিকে দুই দিক দিয়া স্পেনীয় সৈন্যরা কড়া পাহারা দিয়া রাখিয়াছে।

এই সংকট মুহূর্তে আর এক নূতন দুর্যোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। তীব্র বাতাস পানিকে ঠেলিয়া নগর হইতে বাহিরের দিকে নিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে নৌবহরটিও পিছাইয়া পড়িল।

৮ই সেপ্টেম্বর। উত্তরপশ্চিম কোণ হইতে তীব্র বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল এবং পানিকে ঠেলিয়া নগরের দিকে লইয়া চলিল। সাথে সাথে নৌবহরও অগ্রসর হইতে লাগিল। স্পেনীয়রা উপায়ন্তর না দেখিয়া পিছু হটিতে আরম্ভ করিল। তিন দিন পরে বাতাস আবার অকস্মাৎ দিক পরিবর্তন করিল, পূর্ব দিক হইতে বাতাস বহিতে লাগিল। আবার এক দীর্ঘ অসহনীয় প্রতীক্ষা।

এদিকে দীর্ঘ দিনের অবরোধে লীডেনবাসীরা রোগে ক্ষুধায় জর্জরিত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে—তবু তাহারা শত্রুর নিকট পরাজয় স্বীকার করে নাই, গভীর ধৈর্যের সহিত মুক্তির দিনের প্রতীক্ষা করিতেছে।

দুই চারিজন দুর্বলচিত্ত নাগরিক আত্মসমর্পণ না করার জন্য নগরকর্তার সমালোচনা করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি বুঝাইলেন, "ভাই সব, আমি জানি যে শীঘ্র যদি আমাদেরকে মুক্ত করা না হয় তাহলে আমাদের সকলকেই অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিন্তু অপমানজনক মৃত্যুর চেয়ে মর্যাদাময় মৃত্যুই শ্রেয়। আমার জীবন আমি আপনাদের হাতে সমর্পণ করেছি। জীবন থাকতে আমি শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করতে পারব না।"

তাঁহার এই উক্তিতে নগরের বাসিন্দারা আবার নূতন সাহসে বুক বাঁধিল। আশার বাণী বহন করিয়া একটি কপোত নগরের ভিতরে উড়িয়া আসিল।

১লা অক্টোবর। প্রবল বাতাসে পানি আবার ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। পানি ফাঁপিয়া দেওয়াল ছাপাইয়া উঠিল, আর ঢেউয়ের তালে তালে উদ্ধারকারী নৌবহর নগরের দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। শীঘ্রই স্পেনীয় সৈন্যদের সহিত একটি সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সে সংঘর্ষে স্পেনীয়দের নৌকাগুলি ডুবিয়া গেল।

ওলন্দাজ নৌবহর এখন লীডেনের কয়েক শত গজের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সৈন্যরা লাফাইয়া নামিয়া অল্প পানির ভিতর দিয়া নৌকা গুলিকে কাঁধে বহিয়া পার করিল। আক্রমণকারীদের হাতে আর একটি মাত্র দুর্গ রহিয়াছে, এই দুর্গটি দখল করিতে পারিলেই নগরে প্রবেশ করা যাইবে।

গভীর রাত্রিতে নগরের বাসিন্দারা দেখিতে পাইল এই দুর্গ হইতে আলো বাহির হইয়া পানির উপর নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে।

প্রভাতে দেখা গেল, একটি বালক দুর্গের চূড়ার উপর উঠিয়া মাথার টুপি খুলিয়া প্রচণ্ডভাবে নাড়িতেছে। এই ওলন্দাজ বালকটি গভীর রাত্রিতে স্পেনীয়দিগকে দুর্গ ছাড়িয়া পালাইতে দেখিয়াছে।

অবশেষে দুর্গ দখল হইল এবং উদ্ধারকারী সেনারা নগরের সমস্ত জলপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনশনক্লিষ্ট মরণাপন্ন অধিবাসীদের মধ্যে রুটি বিতরণ করিতে লাগিল। নগরের সমস্ত নারী, শিশু, পুরুষ গীর্জায় সমবেত হইয়া তাহাদের মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট শোকরগুজারী করিল।

আর তাহারা কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ এই মুক্তির স্মরণচিহ্নকে স্থায়ী করিবার জন্য পরবর্তী বৎসর বিখ্যাত লীডেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিল।

জননীর শান্তি

জননীর একই মাত্র পুত্রসন্তান—অন্ধের যষ্টি,—একদা সে মাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল।

পুত্রহারা জননী শোকে পাগল। প্রাণহীন দেহ বুকে বাঁধিয়া সে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইল; আর্তকণ্ঠে কহিল, "প্রভু, আমার বাছার প্রাণদান কর —প্রাণদান কর।"

বুদ্ধ তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, এ হইবার নয়। দেহের পিঞ্জর ছাড়িয়া যে পাখী সুনীল গগনে উধাও হইয়াছে, তাহাকে ফিরাইয়া আনা মানুষের সাধ্যের অতীত।

কিন্তু পাগলিনী জননীর মন এ কথায় প্রবোধ মানে না; সে বার বার বুদ্ধের পায়ের কাছে মাথা কুটিয়া বলে, "প্রভু, তুমি ত সবই পার—তুমি একটু করুণা করলেই ত আমার বাছার প্রাণ ফিরে আসে।"

জননীর করুণ বিলাপে পাষাণ গলে, গাছের পাতা ঝরে, শিষ্যরা ব্যাকুল হইয়া উঠে; বুদ্ধ ক্ষুব্ধচিত্তে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন।

জননীর ক্রন্দন চলিতেই থাকে, মৃত পুত্রের দেহকে সে কিছুতেই বুক হইতে নামায় না।

অবশেষে বুদ্ধ বলেন, "মা, তোমার পুত্রের প্রাণ তুমি পেতে পার, যদি সামান্য একটি কাজ করতে পার।'

মহোল্লাসে জননী বলে, "পারব, প্রভু, পারব। আমার পুত্রের জন্য তুমি যা করতে বলবে, আমি তাই করব।"

বুদ্ধ বলেন, "উত্তম, তবে এক মুঠা সর্ষে নিয়ে এস। তাই পড়ে দিলে তোমার পুত্র প্রাণ ফিরে পাবে। কিন্তু একটি কথা, এ সর্ষে এমন একজনের হাত হতে আনতে হবে, যে কোন মৃত আত্মীয়ের শোক কখনো ভোগ করে নাই; নচেৎ সে সর্ষেতে কোন কাজ হবে না।"

"তথাস্তু" বলিয়া উল্লসিত জননী সরিষার অন্বেষণে নির্গত হইল। মৃত পুত্রের দেহ তখনও তাহার বুকে ঝুলিতেছে।

এ-বাড়ী ও-বাড়ী, এ-পাড়া ও-পাড়া, এ-গ্রাম ও-গ্রাম—আকুল জননী মৃত পুত্র বুকে লইয়া সর্বত্র ভিক্ষা মাগিতে লাগিল—এক মুঠা সরিষার জন্য।

জননীর কাতর ক্রন্দনে পল্লীর নরনারীর চোখে অশ্রুর ধারা বহিল; কিন্তু সকলেই বলিল, "মা, আমরা যে প্রত্যেকেই কারো না কারো মৃত্যুজনিত শোক ভোগ করেছি; তবে কেমন করে তোমাকে সর্ষে দেই?"

ওঃ! তবে এ জগতের সবাই মৃত্যুশোক ভোগ করিয়াছে? এ-শোক তবে আমার একার নয়?—জননী থমকিয়া দাঁড়াইয়া ভাবে।

তাহার পর সে বুদ্ধদেবের কাছে যাইয়া বলে, "প্রভু, তোমার দয়ায় আমার চোখ খুলেছে। আর আমি শোক করব না—এই আমার পুত্রের দেহ রেখে দিলাম—এখন এর সৎকার হোক।"

নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে মুস্তফা কামাল

মুস্তফা কামাল পাশার বাহিরের শত্রু একে একে মস্তক নত করিল: তাঁহার নূতন তুরস্ক স্বাধীনতার গৌরবে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইল।

এইবার কামাল পাশা তুরস্কের আত্ম-সংশোধনে মন দিলেন। তিনি দেখিলেন, তুরস্ককে সর্ববিষয়ে উন্নত করিতে হইলে তুরস্ক হইতে নিরক্ষরতাকে নির্বাসনে পাঠাইতে হইবে।

আবার জনসাধারণের মধ্য হইতে নিরক্ষরতা দূর করিতে হইলে একটি সহজ বর্ণমালা চাই। তিনি ঠিক করিলেন, তুরস্কের প্রচলিত আরবী বর্ণমালা জটিল। অতএব জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে ঐ বর্ণমালা বাদ দিয়া ল্যাটিন বর্ণমালা গ্রহণ করিতে হইবে।

যেই সংকল্প, অমনই কাজ আরম্ভ। তিনি একটি ভাষা-কনফারেন্স আহ্বান করিলেন। দেশ-বিদেশ হইতে বড় বড় পণ্ডিতেরা আসিয়া হাজির হইলেন। তাঁহারা কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া গবেষণা, যুক্তি-তর্ক এবং বিতণ্ডা করিলেন। অবশেষে পরস্পর ঝগড়াও বাদ পড়িল না, কিন্তু আরবী বর্ণমালাকে ল্যাটিন বর্ণমালার পরিবর্তনের কাজে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

কামাল পাশা বিরক্তি বোধ করিলেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি একটি পেন্সিল আর কয়েক তা কাগজ লইয়া বসিলেন এবং বেলা উঠার সঙ্গে তিনি টেবিল ছাড়িয়া উঠিলেন। পণ্ডিতেরা দেখিলেন, একটি গ্রহণযোগ্য সহজ ল্যাটিন বর্ণমালা তৈরী হইয়া গিয়াছে।

এইবার নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযান আরম্ভ হইল।

মুস্তফা কামাল ইস্তাম্বুলে গেলেন এবং সেখানে খলীফার প্রাসাদের বিরাট হল-কামরায় এক মজলিসের আয়োজন করিলেন। মজলিসে হাজির হইলেন বড় বড় আমীর, রইস, মৌলভী, মওলানা, পীর, মুর্শিদ, সওদাগর, গ্রন্থকার, সম্পাদক, আমলা, অধ্যাপক, স্কুল-শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, আর এক প্রান্তে মঞ্চের উপর আসীন ইছমত পাশা, কিয়াজিম পাশা এবং মুস্তফা কামাল পাশা।

কামাল পাশা উঠিয়া একটি ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে গেলেন এবং লিখিয়া লিখিয়া দেখাইলেন, কেন বালকবৃদ্ধ ও নরনারী নির্বিশেষে সমগ্র তুর্ক জাতিকে স্কুলে যাইতে হইবে। তিনি আরও দেখাইলেন, কিরূপে ল্যাটিন বর্ণমালার সাহায্যে সবচেয়ে সহজে লিখিতে পড়িতে পারা যায়।

সেদিন আকাশ ছিল মেঘমুক্ত, হাওয়া ছিল গরম; উপস্থিত আমীর রইসরা বাড়ী যাইয়া একটু ঘুমাইয়া লইতে পারিলে বাঁচিয়া যাইতেন। কিন্তু মুস্তফা কামাল পাশা হাযির: কাজেই, তাঁহাদের সবাইকে সোজা হইয়া বসিয়া অতি মনোযোগের সঙ্গে কান পাতিয়া রাখিতে হইল।

অতঃপর কামাল পাশা একটি পাঠ দিতে গেলেন। তিনি বর্ণমালা বুঝাইয়া বলিলেন, ব্ল্যাকবোর্ডে উহা লিখিয়া দেখাইলেন এবং তাহার পর শ্রোতৃবর্গ হইতে

কয়েকজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে তাহাদের নাম ল্যাটিন হরফে লিখিবার জন্য ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে আহ্বান করিলেন।

এই বুড়ো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই নূতন হরফে নাম লিখিতে যাইয়া হাস্যকর ভুল করিতে লাগিলেন; মাঝে মাঝে হাসির তরঙ্গ উঠিতে লাগিল: কিন্তু গুরুমহাশয় নাছোড়বান্দা; তিনি তাঁহাদিগকে নাম লিখিতে শিখাইয়া তবে ছাড়িলেন।

ইছমত পাশা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সৈন্য-মণ্ডলীর প্রধান সেনাপতি অবশেষে প্রাথমিক পাঠশালার প্রধান শিক্ষকের পদে প্রমোশন পেলেন।"

অতঃপর কামাল পাশা বড় বড় সবাইকে তাঁহার পল্লীগৃহে যাইয়া নূতন বর্ণ-মালা শিখিবার জন্য দাওয়াত করিলেন।

জনসাধারণের মনে যাহাতে শিখিবার আগ্রহ জাগ্রত হয়, সে জন্য এক বিপুল প্রচার-অভিযান শুরু হইল—মুস্তফা কামালের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে।

অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল: ক্রিয়া শুরু হইয়াছে। গ্রাম, নগর, বন্দর হইতে কামাল পাশার নিকট অজস্র দাওয়াত আসিতে লাগিল; আপনি তশরীফ আনুন—আমাদিগকে নূতন বর্ণমালা শিখাইয়া যান।

মুস্তফা কামালও বসিয়া রহিলেন না। একটি ব্ল্যাকবোর্ড ও এক বাক্স চক লইয়া তিনি হেড্ কোয়ার্টার্স হইতে বাহির হইলেন। তিনি গ্রাম হইতে গ্রামে, বাজার হইতে বাজারে, মসজিদ হইতে মসজিদে যাইতে লাগিলেন। প্রত্যেক স্থানেই কৃষকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত, তাঁহার কথা শুনিত, কিছু শিখিত। তাঁহাদের প্রত্যেকের মন নূতন জ্ঞানের জন্য উন্মুখ।

তুর্করা এই নূতন বর্ণমালা এবং তাহার সাহায্যে নূতন জ্ঞান অর্জনের জন্য পাগল হইয়া উঠিল। এমন তুর্ক খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইল যে কিছু শিখিবার চেষ্টা না করিতেছে। মসজিদের কোণে, রাস্তার ধারে, গাছের তলায়, সরাই-খানার জানালার কাছে, পুকুরের ঘাটের রোয়াকের উপর—সর্বত্র একটি স্লেট হাতে বসিয়া তুর্করা নূতন হরফ মশ্‌ক করিতে লাগিয়া গেল। লেখা শিক্ষা করা আনন্দপ্রদ ফুটবল-ক্রিকেটের মত একটি খেলায় পরিণত হইল।

ভাল হাতের লেখার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইল। লেখা না শিখিয়া কেহ নিরাপদ বোধ করিল না: কে জানে কখন কামাল পাশা হঠাৎ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, "দেখি, তোমার হাতের লেখা?"

অবশেষে নূতন বর্ণমালা গ্রহণকে আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক করা হইল। নূতন নূতন স্কুল খুলিয়া গেল; লেখা শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইল এবং চল্লিশ বৎসরের কম বয়স্ক প্রত্যেক তুর্ককে স্কুলে যাইতে বাধ্য করা হইল। যাহাকে দেখা গেল অবহেলা করিতেছে, অমনই তাহার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হইল। লেখা শিখিবার আগে কোন কয়েদী খালাস পাইবে না। গুপ্ত পুলিশ গ্রাম, বন্দর, নগর তোলপাড় করিয়া নিরক্ষরগণকে ধরিয়া আদালতে হাযির করিতে লাগিল।

—কার্কনেস্
Kamal Ataturk—**K. Kirkness**

দুইটি মানুষ

॥ এক ॥

১৯৪৬ সাল। কলিকাতা। হিন্দু মুসলমানে তুমুল দাঙ্গা। সে দাঙ্গার প্রমত্ত আহ্বানে মানুষের ভিতরের সুপ্ত শয়তান অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়াছে। কোনদিন কোন পরিচয় নাই, কোন কালে কলহের কোনও কারণ ঘটে নাই; উভয়েই মানুষ, শুধু বাইরের একটি চিহ্ন—একটি টুপি কিংবা একটি টিকি, কেবল ইহারই জন্য আজ একে অন্যের বুকে নির্মমভাবে ছুরি বসাইতেছে। অথবা হয়তো পরিচয় আছে, হয়তো গত দশ বৎসর যাবৎ ইহারা এক পথে চলে, এক বাজারে খরিদ করে, এক হোটেলে বসিয়া চা খায়, গল্প করে, হাসি-তামাসায় মাতিয়া উঠে, সেই দীর্ঘ-পরিচিত অন্তরঙ্গ তাহারাই আজ সহসা শয়তানের ইশারায় একে অন্যের গলা কাটে, বাড়ীতে আগুন দেয়; নিরপরাধ দুধের বাচ্চাকে পর্যন্ত মায়ের বুক হইতে ছিন্ন করিয়া আনিয়া স্পষ্ট দিবালোকে প্রকাশ্য রাজপথে হত্যা করে।

রক্ত, ভস্ম, মৃত্যু রাজধানীর পথে পথে হাহাকার করিয়া বেড়ায়।

একটি মধ্যবয়সী মুসলমান—মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি, পরনে লুঙ্গি। কয়েক-জন হিন্দু দিনের বেলায় তাহাকে রাস্তায় ধরিয়া বাড়ীতে আনিয়া লুকাইয়া রাখে; সন্ধ্যার পর অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া তাহাকে এক মন্দিরে লইয়া যায়। পুরোহিতকে ডাকিয়া বলে, "ঠাকুর, বলির জন্য এনেছি, তার ব্যবস্থা করুন।"

ঠাকুর নীরবে বলির জীবকে দেখেন; তাহার পর স্থিরকণ্ঠে আগন্তুক-দিগকে বলেন: "তোমরা বেশ করেছ; একটা শত্রু বিনাশও হবে, মা কালীর পূজাও হবে। আচ্ছা, ভাই, তোমরা এখন ওকে রেখে যাও, নইলে কে তোমা-দেরকে কোথা হতে দেখে ফেলবে। পাঁজিপুঁথি দেখে শুভলগ্নে আমি ওর যথাযোগ্য বলির ব্যবস্থা করে নিব।"

আগন্তুকেরা তুষ্ট হইয়া চলিয়া যায়; বন্দী মন্দিরের এক কোণে বসিয়া কাঁপে আর মনে মনে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্' করে।

সময় যায়। রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইয়া আসে। মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে একে একে পূজারীরা নিজ নিজ ঘরে যায়।

পুরোহিত বাহিরে আসিয়া এদিক ওদিক লক্ষ্য করেন; দেখেন কোথাও কেহ নাই। তখন তিনি মুখ তুলিয়া আকাশের পানে চান—বিস্ময়ে ভাবেন, এ কি! আজ তারাদের চোখে এত জল! তাঁহার আত্মা হাহাকার করিয়া উঠে; আর্তস্বরে জিজ্ঞাসা করে: "কেন?—কেন?—কেন?"

পুরোহিত বন্দীর কাছে আসেন। বলেন, "এস, প্রস্তুত হও।" বন্দী শিহ-রিয়া ওঠে; ভাবে, তার জীবনের চরম মুহূর্ত বুঝি উপস্থিত। অভিভূতের মত পুরোহিতের সাথে সাথে চলে।

খানিক দূর আসিয়া মন্দিরের দেয়ালের একটা ভাঙ্গা অংশ দেখাইয়া পুরোহিত বলেন—"ওঠ, ঐখান দিয়ে পালিয়ে যাও।" বন্দী পুরোহিতের দিকে অপার বিস্ময়ে চায়—তাহার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে; বলে, "অনেক উঁচু যে!" পুরোহিত বলেন, "আমার কাঁধে পা দিয়ে ওঠ।" বন্দী ইতস্তত করে। পুরোহিত আদেশের সুরে বলেন—"জলদি কর, ভাই, এক মুহূর্তও আর দেরী করতে পারবে না।"

বন্দী পুরোহিতের কাঁধে চড়ে; তাহার ভারে পুরোহিতের ক্ষীণ দেহ কাঁপে; কিন্তু তাঁহার বুকে উৎসারিত হইয়া ওঠে অমানুষিক বল; তিনি ঠিক দাঁড়া-ইয়া থাকেন।

কিন্তু হায়! ইহাতেও যে দেয়ালের কার্নিশ নাগালের বাহিরেই থাকিয়া যায়। পুরোহিত ভাবেন, তবে কি ব্রাহ্মণের এই তপস্যা আজ ব্যর্থ হইবে?

সহসা পুরোহিতের নজরে পড়ে মন্দিরের কালী-মূর্তি। তিনি তাহাই টানিয়া আনিয়া দেয়ালে হেলান দিয়া দাঁড় করান; বন্দীকে বলেন, "মূর্তি আমার চেয়ে উঁচু, এরই মাথায় পা দিয়ে পালিয়ে যাও।"

"কিন্তু এ যে তোমাদের দেবতার মূর্তি!"—বন্দী বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে। "আমি মরব, তবু তোমার দেবতার মাথায় পা দিতে পারব না"—বন্দী কাঁদিয়া ফেলে।

ঠাকুর চাপা কণ্ঠে বলেন, "হাঁ, এ সত্যি আমার দেবতার মূর্তি! কিন্তু ভাই, ছোট বেলায় মা কখনো তোমাকে কোলে কাঁখে মাথায় তোলে নাই? আজ যদি মা কালী তা না পারেন, তবে তিনি কিসের মা?"

বন্দী পুরোহিতকে জড়াইয়া ধরে। পুরোহিত বন্দীকে বুকে জড়াইয়া ধরেন; উভয়ের বুক ভাসিয়া যায়। এক দেশের সন্তান—এক স্রষ্টার সৃষ্টি।

খস-খস—ধপ—বাহিরে শব্দ হয়। বন্দী ফাটল-পথে ওপাশে নামিয়া চলিয়া যায়।

পুরোহিত আসিয়া মন্দিরের দুয়ার খোলেন: বাহির হইতে স্নিগ্ধ হাওয়া ভাসিয়া আসে; তাঁহার দেহ-মন জুড়াইয়া যায়। তিনি মুখ তুলিয়া আকাশের পানে চান; দেখেন, তারাদের চোখে তৃপ্তির হাসি।

পুরোহিত মন্দিরের দুয়ারে অর্গল দিয়া ভিতরে আসেন। চোখে পড়ে সেদিনের স্তূপীকৃত ফুল। তাহার মনে হয় যেন সমস্ত ফুল মিলিয়া হইয়াছে একটা বিরাট সুন্দর তোড়া; সেই তোড়া উৎসর্গীকৃত বিশ্ববিধাতার উদ্দেশ্যে আর তোড়ার ফুলের প্রতি দলের বুকে জাগিয়া উঠিয়াছে - নিশীথের সেই মুক্ত বন্দীর স্মিত মুখচ্ছবি।

॥ দুই ॥

১৯৫০ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী। এ দুর্ভাগ্য দেশে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এবার সে বহ্নিশিখার অগণ্য স্ফুলিঙ্গ শহরের সীমা ছাড়াইয়া দিকে দিকে পল্লীর শান্তিময় অঙ্গনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে সে স্ফুলিঙ্গ হইতে পল্লীর মাঠেঘাটেও দাবানলের সৃষ্টি হইয়াছে।

বরিশাল। একটি মুসলমান অফিসারের বাসা। বাসায় কোন পুরুষ নাই; আছেন একটি মাত্র মহিলা—তাঁহারও বয়স মাত্র উনিশ বছর। তাঁহার সাথে দুইটি শিশু কন্যা।

সেদিন দুপুর বেলায় দশজন হিন্দু দাঙ্গার ভয়ে এই বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মহিলাটি তাহাদিগকে অভয় দিয়া এক নির্জন ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।

দিন ফুরাইয়া আসিল। পশ্চিম গগন অস্তগামী সূর্যের রক্তিম প্রভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল। মহিলাটি সেদিকে চাহিয়া সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন —এ কি! মানুষের এ নির্মম হানাহানির করুণ দৃশ্য কি অবশেষে আকাশের চোখেও রক্তাশ্রুর সঞ্চার করিয়াছে?

পাখীরা ধীরে নীড়ে ফিরিয়া আসিল। ক্রমে গোধূলীর আলো রাতের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। আকাশের শামিয়ানার তলে হাজার হাজার তারার বাতি জ্বলিয়া উঠিল।

অকস্মাৎ অফিসারের বাসার সম্মুখে একদল লোক আসিয়া হাযির হইল: তাহাদের কাহারও হাতে লাঠি, কাহারও হাতে রামদা, কাহারও হাতে বা সড়কী। তাহারা বাসার মহিলাকে লক্ষ্য করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল। বলিল, "হিন্দু কয়টিকে আমাদের হাতে দিয়ে দিন—এক্ষুণি, নইলে ভাল হবে না, এ নিশ্চিত জানবেন।"

মহিলাটি পর্দানশীন; রাস্তাঘাটে কালে-কস্মিনে স্বামীর সঙ্গে বাহির হইয়া থাকেন; কিন্তু এমন উত্তেজিত জনতার সামনে কখনও বাহির হন নাই।

আজ মহিলাটির সে পর্দার বাঁধন টুটিয়া গেল। তিনি বাড়ীতে একা ছিলেন। মাথায় কাপড় দিয়া বাহিরে আসিলেন। ঘরের বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিলেন:

"ভাই সকল!"

উৎক্ষিপ্ত জনতা হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিল। বলিল, "সে মানুষগুলি কোথায়, আমরা তাই শুনতে চাই।"

"সেই কথাই আমি বলতে এসেছি।"

"না, আমরা কোন কথা শুনতে আসি নাই; আমরা মানুষ চাই।"

"কি করবেন সে মানুষগুলি দিয়ে?"

"আমাদের যা খুশি তাই করব—আপনার কাছে তার কৈফৎ দিতে আসি নাই। বলুন, তাদেরকে দিবেন কিনা।"

"না, দিব না।"

"কারণ? কারণ শুনতে পারি?"

"কারণ অতি সহজ—তারা আমার আশ্রিত—আমি তাদের দিব না।"

"ইস! ভারি ধার্মিক হয়ে গেছেন তো!"

"ধার্মিক আমি নই—কিন্তু আমার ধর্মের খবর আমি কিছু রাখি। আমার ইসলাম বলে—দুর্বলকে রক্ষা কর, জান দিয়ে হলেও আশ্রিতকে বাঁচাও।"

"শুনুন, ও-সব ধর্মের কাহিনী আমরা শুনতে চাই না। আমরা এখন চললাম। রাত বারোটায় ফের আসবো। তখন ওদের চাই; অকারণে নিজের মৃত্যু ডেকে আনবেন না।"

জনতা চলিয়া গেল। হিন্দু কয়েকজন এতক্ষণ ভিতর হইতে সমস্ত শুনিতেছিল। মহিলাটি অন্দরে যাওয়া মাত্র তাহাদের কয়েকজন তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, ''মা, আমাদের জন্য আপনি বিপদ ডেকে আনবেন না—খালি বাড়ী, ওরা আবার এলে কে আপনাকে রক্ষা করবে? আমাদেরকে ছেড়ে দিন। আমাদের প্রাণ যাক, আপনি বেঁচে থাকুন।''

মহিলা উত্তরে বলিলেন, ''না 'না, তা হয় না, তা হতে পারে না। এ আমার ঈমানের পরীক্ষা; এ পরীক্ষায় যদি হেরে যাই, তার চেয়ে আমার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়।''

মহিলাটি বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, ''আচ্ছা, ওদেরকে ঘরে রেখে আমার জীবন না হয় দিলাম, কিন্তু তাতে ওদের ফায়দা কি?'' তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন।

তাহার পর তাঁহার বোরখাটা গায় দিয়া তিনি পাছ বাড়ীর পথে গোপনে বাহির হইয়া গেলেন এবং একজন পদস্থ অফিসারের নিকট যাইয়া তাঁহার সাহায্যে হিন্দু কয়জনকে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে সরাইয়া ফেলিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই জনতা ফিরিয়া আসিল; চীৎকার করিয়া বলিল, ''লোকগুলিকে এইবার বের করে দিন—নইলে ঘরে আগুন দিয়ে আপনাকেসহ সবাইকে পুড়িয়ে মারব।''

মহিলাটি আবার বাহিরে আসিলেন। বলিলেন, ''হিন্দুগুলি এখানে নাই, তাদের আমিই সরিয়ে দিয়েছি।''

''খুন করব—আপনাকে খুন করব।'' এক সঙ্গে অন্তত দশজনে গর্জন করিয়া উঠিল।

মহিলাটি কোথা হইতে কি শক্তি পাইলেন; তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া পরম শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, ''হ্যাঁ, ভাইসকল, আমাকে খুন কর—আমি হাযির; তবু আশ্রিত, দুর্বল প্রতিবেশীকে খুন করেছ, এ বদনাম যেন তোমাদের না হয়।''

মহিলার সেই প্রশান্ত কণ্ঠে কি ছিল, তাহার দুর্নিবার প্রভাবে জনতা মুহূর্ত মধ্যে নীরব হইল। তাহার পর তাহারা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

কিন্তু মহিলাটির ভঙ্গুর দেহে এই ঘটনার আঘাত সহিল না। তিনি শয্যা-গ্রহণ করিলেন।

স্থানীয় চিকিৎসায় তাঁহার কোন উপকার না হওয়ায় তাঁহাকে উত্তর কলিকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল।

এই হাসপাতালের প্রবাস তাঁহাকে বেশী দিন সহিতে হইল না। একদা প্রভাতে তিনি পরম পথে যাত্রা করিলেন।

বিদায় হজ্জ

হজ্জের সময় সমীপবর্তী হইয়া আসিল। মক্কায় গিয়া হজ্জ উদ্‌যাপন করিতে মহানবী (স.)-এর প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তিনি বহু সহচর সমভিব্যাহারে মদীনা হইতে যাত্রা করিলেন।

মহানবী (স.)-এর কাফেলা পবিত্রভূমি আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হইল। আরবের চতুর্দিক হইতে লক্ষ লক্ষ মুসলিম নরনারী আরাফাতের মুক্ত প্রান্তরে সমবেত হইল।

হযরত মুহাম্মদ (স.) অভিভাষণ দিতে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে এক বিপুল জনসমুদ্র আবেগ-হিল্লোলে উদ্বেলিত। মাতাপিতার স্নেহ, বন্ধু-ভ্রাতার প্রীতি, আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধ, সনাতন সমাজের রক্ত ভ্রূকুটি, সম্পদ, স্বাচ্ছন্দ ও বিলা-সের আকর্ষণ, জালিমের অকথ্য অত্যাচার—সমস্ত উপেক্ষা করিয়া সত্য প্রচারের প্রথম যুগে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা মহা-পুরুষের সঙ্গে আছেন। আরবের নবীন জীবন প্রভাতে যে সমস্ত কুরায়েশ তাঁহাকে সংকল্পচ্যুত করিবার জন্য সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও প্রভুত্বের ডালি লইয়া প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, যে সব অত্যাচারী তাঁহার পথে কাঁটা ছড়াইয়াছে, তাঁহার উপাসনারত মস্তকের উপর মৃত উটের অন্ত্রভার চাপাইয়া তাঁহাকে শ্বাসরোধ করিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছে, আজ তাঁহারাও তাঁহার সম্মুখে ময়দানে উপস্থিত: কিন্তু অন্তরে বিদ্বেষবহ্নি জ্বালিয়া নয়, ভক্তিপ্লুত চিত্তে। মক্কায় উৎপীড়িত পয়গম্বর দীর্ঘপথ অতিবাহন করিয়া সুদূর তায়েফে উপনীত হইয়াছেন, ব্যাকুল কণ্ঠে আহ্বান করিয়াছেন তায়েফ বাসিগণকে ইসলামের শান্তিছায়াতলে, উত্তরে যে নিষ্ঠুরেরা সেদিন কঠিন প্রস্তর নিক্ষেপে তাঁহার কোমল অঙ্গে লহুর প্রবাহ বহাইয়াছে, তাহারাও আরাফাতে হাযির। সত্য প্রচারে বাধা জন্মাইবার জন্য বিরুদ্ধবাদীরা মহানবী (স.)-কে তাঁহার সহচরগণসহ অনশনে তিল তিল করিয়া মারিবার প্রয়াস পাইয়াছে, তাহাদের নিযুক্ত অগ্নিমূর্তি যুবকেরা তাঁহার অস্তিত্বকে দুনিয়া হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য শাণিত তলোয়ার হাতে নিশীথের

অন্ধকারে তাঁহার বাসস্থানের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে, হযরত (স.) অদৃশ্যভাবে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া মদীনার পথে চলিয়াছেন, দুশমনেরা শিকার-হারা ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত দিকে দিকে তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছে, আজ তাহারা তাঁহার পরম অনুরক্তরূপে হজ্বের জন্য হাযির। হযরত (স.)-এর জন্য মক্কা ও তায়েফের সকল দুয়ার যখন অবরুদ্ধ হৈ দুদিনে যে মহাপ্রাণ মদীনাবাসীরা তাঁহাকে বাহু বাড়াইয়া বিপুল সম্মানে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সমস্ত বিপদ-আপদকে আনন্দে নিজেদের স্কন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই আনসারগণও তাঁহার সান্নিধ্যে উপস্থিত। হযরত (স.) মদীনায় হিজরত করিয়াছেন, সেখানে দুশমনেরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে, বার বার সমর-অভিযান দ্বারা তাঁহার আশ্রয়দাতা আনসারগণসহ তাঁহাকে পিষিয়া ফেলিতে প্রয়াস পাইয়াছে, তাঁহার উপর গুরু প্রস্তর খণ্ড তাঁহার অলক্ষ্যে গড়াইয়া ফেলা হইয়াছে, বিষপ্রয়োগে তাঁহার হত্যার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু আজ তাহাদের সে বিদ্বেষ-বহ্নি নির্বাপিত, সে শাণিত তরবারি কোষবদ্ধ। আজ তাহারা ইসলামের ভক্ত সেবকরূপে তাহাদের মহানবী (স.)-এর উপদেশামৃত পান করিবার জন্য পিপাসার্ত।

মহানবী (স.) নির্নিমেষ নেত্রে সম্মুখস্থ জনসংঘ নিরীক্ষণ করিলেন। এই অভূত-পূর্ব দৃশ্য দর্শনে তাঁহার চিত্তপারাবার উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল কিনা কেহ বলিতে পারে না। তিনি নীরবে তাহাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সুদীর্ঘ কালের কঠোর সাধনায় সহস্র বিপদ-ঝঞ্ঝা কাটাইবার পর তাঁহার মহান ব্রতের এই মূর্তিমান সাফল্য দর্শনে হয়তো তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার নবুয়-তের কর্তব্য শেষ হইয়াছে, এবার তাঁহার মহাযাত্রার আয়োজনের দিন সমাগত, তাই আজ তিনি তাঁহার সাধনার উপসংহার করিয়া প্রিয় অনুচরদের হাতে তাহা অর্পণ করিয়া যাইতেছেন। আজিকার সম্ভাষণে তাঁহার সেই অতুল্য কণ্ঠস্বর ভাবাবেগে ঝঙকৃত হইয়া সে বিরাট জনসমুদ্রকে নীরব স্তম্ভিত করিয়া দিল ; শ্রোতৃ-হৃদয়ে, সমীর-স্তরে, খেজুর গাছের পাতায় পাতায়, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় অজ্ঞাত-পূর্ব আবেগ-শিহরণ জাগাইয়া ছুটিয়া চলিল।

মহানবী (স.) বলিতে লাগিলেন —''হে জনমণ্ডলী, মন দিয়া আমার কথা শোন। কারণ আমার তোমাদের মধ্যে এই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য আর একটি বৎসর আল্লাহ্ আমাকে দিবেন কিনা আমি জানি না।

'এই পবিত্র মাসে, এই পবিত্র দিনে তোমাদের একের ধন-মান, প্রাণ-নাশ অপরের পক্ষে নিষিদ্ধ হইল। সাবধান, তোমাদের প্রভুর সম্মুখে তোমাদিগকে উপস্থিত হইতে হইবে এবং তোমাদের কাজের হিসাব দিতে হইবে।

অন্ধযুগের খুনের বিনিময় প্রথা আমি পদদলিত করিলাম। সর্বপ্রথমে, আমার বংশের খুনের যাবতীয় দাবী প্রত্যাহার করিলাম।

সাবধান, আমার পরে তোমরা একে অন্যের গলা কাটিও না; মনে রাখিও, হাশরের ময়দানে তোমাদের মুখ দেখাইতে হইবে।

তোমাদের স্ত্রীদের বিষয়ে সাবধান। আল্লাহ্‌কে জামিন রাখিয়া তোমরা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ। আল্লাহ্‌র জামিনের কথা স্মরণ রাখিয়া তাহাদের সহিত কোমল ও প্রীতিময় ব্যবহার করিও। তাহাদের উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের উপরও তাহাদের তদ্রূপ অধিকার আছে।

অন্ধযুগের যাবতীয় কুসীদ আমি পদদলিত করিলাম। সর্বপ্রথমে আমার পিতৃব্য আব্বাসের প্রাপ্য কুসীদ আমি পদদলিত করিলাম।

অতঃপর মহাজন কেবল আসল টাকা পাইবে।

অতীতের আভিজাত্য অহঙ্কার আমার পদতলে বিমর্দিত হইল। অ-আরবের উপর আরবের কোন শ্রেষ্ঠতা নাই, আরবের উপরও অ-আরবের কোন শ্রেষ্ঠতা নাই। সকলেই আদমের সন্তান এবং আদম মাটির দ্বারা গঠিত।

তোমাদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা মহৎ যিনি সর্বাপেক্ষা সৎ কর্মশীল।

মনে রাখিও তোমরা সকলে পরস্পর ভাই; তোমরা এক ভ্রাতৃসংঘ। সদিচ্ছায় না দিলে এক ভাইয়ের কিছুই অন্য ভাইয়ের জন্য বৈধ নহে।

তোমরা অনুক্ষণ অন্যায় আচরণ হইতে বিরত থাকিও, সর্বদা হক পথে চলিও।

আর সাবধান, তোমাদের দাসদাসী! তোমরা যাহা খাও, তাহাদিগকেও তাহা খাইতে দিও এবং তোমরা যাহা পর তাহাই তাহাদিগকে পরিতে দিও।

যদি দাসদাসীরা এমন কোন অপরাধ করিয়া বসে যাহা তোমরা ক্ষমা করিতে অনিচ্ছুক, তবে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া দিও। তাহারা তোমাদের ভাইবোন, আল্লাহ্ তাহাদিগকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার সঙ্গত নহে।

মহাপুরুষ ক্ষণেকের জন্য নীরব হইলেন। তাহার পর আবার সম্মুখে তাঁহার করুণ দৃষ্টি বিস্তার করিয়া কহিলেন, হে সমবেত জনমণ্ডলী, আমি কি আমার প্রভুর বাণী পৌঁছাইয়াছি?

বিপুল জনসংঘ সাগর-কল্লোলের মত সমস্বরে উত্তর করিল: পৌঁছাইয়াছেন—আপনি নিশ্চয় পৌঁছাইয়াছেন।

তৃপ্তির বিদ্যুচ্ছটায় অকস্মাৎ মহাপুরুষের বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে তাঁহার দুই চোখ ভরিয়া আসিল। তিনি আকাশের দিকে তাঁহার কম্পিত হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: লক্ষ্য কর, প্রভু, লক্ষ্য কর---লক্ষ্য কর।

মহানবী (স.) তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা সমস্তই জানিতেন; কিন্তু সামরিক শক্তির গৌরবচ্ছটা কিংবা ঐশ্বর্য সাম্রাজ্যের উগ্র কামনা তাঁহার নিষ্কাম চিত্তে চাঞ্চল্যের রেখামাত্রও সঞ্চার করিতে পারে নাই; তাই শক্তি-উদীয়মান নবীন রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিনায়ক তাঁহার সুদীর্ঘ অভিভাষণে সাম্রাজ্য, সম্পদ বা সমর শক্তি সম্বন্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করিলেন না। বিদায়মান বীরের মুখ হইতে তাঁহার সর্বশেষ বৃহত্তম প্রকাশ্য বক্তৃতায় তাঁহার দেশ, তাঁহার জাতি, তাঁহার সৈন্য ও তাঁহার পত্নী সম্বন্ধে একটি বর্ণও নির্গত হইল না—যদিও এ সমস্তই তাঁহার ছিল। শুধু দীন দরিদ্র, দুর্বল, নারী, দাসদাসী, এই অবজ্ঞাত অবহেলিত, নির্যাতিতদের রক্ষণে বজ্রগম্ভীর স্বরে তিনি তাঁহার শেষ আদেশ বাণী ঘোষণা করিয়া গেলেন।

এই স্মরণীয় অভিভাষণের পর প্রায় তের শত বৎসর কালের সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে ইসলামের নিরক্ষর নবী (স.) জীবনের যে আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজিও জগতের কার্যত: উপলব্ধির বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

একটি বাদশাহী আম

দিল্লীর বাদশাহ্ সম্রাট মুহম্মদ শাহ্ একদিন একটি ভাল আমের আটি ফারুখাবাদের নবাব মুহম্মদ খাঁকে উপহার দিলেন। মুহম্মদ খাঁ তখনই উহা তসলিম করিয়া গ্রহণ করত: মখমলের রুমালে জড়াইয়া ফারুখাবাদে সসম্মানে পাঠাইয়া দিলেন।

এ সংবাদ পাইয়া নবাবজাদা করিম খাঁ ব্যাণ্ডপার্টিসহ খোরন পর্যন্ত আসিলেন এবং বাদশাহী আটিকে অভ্যর্থনা করিয়া ফারুখাবাদে লইয়া গেলেন।

আটি হায়াতবাগে বপন করা হইল। গাছ বড় হইলে তাহাতে অদ্ভুত সুন্দর

আম ধরিল—ওজনে প্রায় এক সের, বর্ণে, গন্ধে ও স্বাদে অপূর্ব।

গাছটিতে মুকুল দেখা দেওয়া মাত্র উহা পাহারা দেওয়ার জন্য একদল সৈন্য মোতায়েন হইত।

মুকুল ঝরিয়া পড়ার সময় হইতে আম পাকা পর্যন্ত-কাল গাছের গোড়ায় রোজ ত্রিশ সের দুধ ঢালিয়া দেওয়া হইত।

—ইরভীন

(The Bangash Nowabs of Farukhabad – **Irvine**)

বদলী-ভীতু আমলা

ফারুখাবাদের নবাব মুহম্মদ খাঁ বহুবার দেখিয়াছিলেন যে, ভারতে মোগল শাসনের শেষভাগে সুবাদারগণ বাদশাহ্‌র সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন নাই। এক প্রদেশে দীর্ঘকাল থাকিলেই সুবাদার স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী লোকদিগকে হাত করিয়া লইতেন এবং প্রচুর ধনসম্পদ সংগ্রহ করতঃ সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া দিতেন।

এইজন্য মুহম্মদ খাঁ কোন পরগনায় কোন আমলাকে বেশীদিন রাখিতেন না, ঘন ঘন বদলী করিতেন।

একদিন নবাব মুহম্মদ খাঁ আলোয়াল খাঁকে কোন এক পরগনার আমিল নিযুক্ত করিলেন। আলোয়াল খাঁ যাত্রাকালে ঘোড়ার পিছনের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া চলিলেন।

মুহম্মদ খাঁ দেখিয়া বলিলেন—"ব্যাপার কি, আলোয়াল খাঁ! —অমন করে বসেছ কেন?"

আলোয়াল খাঁ জবাব দিলেন, "লক্ষ্য করে দেখছি, হুজুর, আমার স্থানে আবার কাকে আমার পেছনে পেছনে পাঠাচ্ছেন।"

নবাব সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "আরে শয়তান! আচ্ছা, যাও. অন্ততঃ এক বৎসর তুমি নিতান্ত নিশ্চিন্তভাবে সেখানে থাক গিয়ে।"

—ইরভীন

(The Bangash Nawabs of Farukhabad – **Irvine**)

আল্লাহ্ দায়ী

নাদির শাহের দিল্লী আক্রমণের পর। নাদির শাহ্ ও মোগল সম্রাট মুহম্মদ শার মধ্যে সন্ধির কথা হইছে।

নাদির শাহ্ শুনিলেন, মোগল দরবারে নিজামুল্ মুল্‌কর মত বিচক্ষণ আমীর আর কেই নাই। কাজেই, নাদির শাহ্ তাঁহারই সঙ্গে সন্ধি আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

নাদির শাহের পক্ষ হইতে মুহম্মদ শা'র নিকট একজন দূত গেল। দূতের হাতে একখণ্ড কুরআন: অর্থাৎ তাৎপর্য এই যে নাদির শাহ্ কুরআন হাতে লইয়া শপথ করিতেছেন যে তাঁহাদ্বারা নিজামুল মুল্‌কের কোন বিপদ ঘটিবে না।

মুহম্মদ শাহ্ কিন্তু ভয় পাইলেন। তিনি বলিলেন, "নিজামুল্ মুল্‌ক, তুমি ছাড়া আমার কাছে আর কোন বিশ্বাসী জ্ঞানী ব্যক্তি নাই; যদি নাদির শাহ্ বিশ্বাসঘাতকতা করে তোমাকে হত্যা করেন, তবে উপায়?"

নিজামুল্ মুল্‌ক দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "আল্লাহ্‌র কিতাব আমাদের সাক্ষী, তা সত্ত্বেও যদি নাদিরশাহ বিশ্বাসঘাতকতা করেন, তবে তার জন্য দায়ী হবেন স্বয়ং আল্লাহ্!"

—ইউসুফ হোসেন খাঁ

Nizamul Mulk Asaf Jah 1—Dr. **Yusuf Husain Khan**

নিমক ও সাম্রাজ্য

নাদির শাহ্ দিল্লী ছাড়িয়া ইরান যাত্রা করিতেছেন। তিনি নিজামুল্ মুল্‌ককে ডাকিয়া বলিলেন, "আমীর সাহেব, আমি দিল্লীতে বসে বসে সম্রাট মুহম্মদ শা'কে দেখেছি, তাঁর আমীর রইস সবাইকে লক্ষ্য করেছি; কিন্তু এ

ভারত সাম্রাজ্যের ভার বহন করবার মত লোক আপনি ছাড়া আর কেউ আমার নজরে পড়ল না।" নিজামুল্ মুল্ক কুর্নিশ করিয়া বলিলেন, "বান্দার উপর শাহানশার নিতান্ত নেক নজর।" নাদির শাহ্ আবার বলিলেন, "তাই আমি ভেবেছি, আমি যাওয়ার আগে ভারতের এ বিরাট সাম্রাজ্যভার আপনার হাতে তুলে দিয়ে যাই—এ রাজ্য পরিচালনার শক্তি মুহম্মদ শা'র নাই।"

নিজামুল্ মুল্ক ফের কুর্নিশ করিয়া বলিলেন, "শাহানশাহ ইচ্ছা করলে সব করতে পারেন, এ বান্দার তা অজানা নাই। কিন্তু আমার পক্ষে এ সাম্রাজ্য-ভার গ্রহণ সম্ভব নয়, জাহাঁপনা, আমি মাফ চাচ্ছি।"

নাদির শাহ বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু ভয় কি, নিজামুল্ মুল্ক? আমি আমার দশ হাজার নির্ভীক যোদ্ধা এখানে রেখে যাব, যে আপনার বিরুদ্ধে একটি অক্ষর উচ্চারণ করবে, তারা তার তাজা চামড়া খসিয়ে নেবে।"

নিজামুল্ মুল্ক আবার বলিলেন, "জাহাঁপনা, বাদশাহ হওয়ার মত গুণ এ বান্দার নাই—ফের মাফ চাচ্ছি।"

নাদির শাহ উষ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি, নিজামুল্ মুল্ক? কেন আপনি বারবার অস্বীকার কচ্ছেন?"

নিজামুল্ মুল্ক পরম বিনয়ের সঙ্গে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "গোস্তাখী মাফ করবেন, জাহাঁপনা; পুরুষানুক্রমে আমরা এ বাদশাহী খান্দানের অনেক নিমক খেয়েছি।"

নাদির শাহ্ প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "নিজামুল্ মুল্ক, আপনার নিমক-হালালী অতুল্য—আপনি ধন্য।"

—ইউসুফ হোসেন খাঁ

Nizamul Mulk Asaf Jah 1—**Dr. Yousuf Husain Khan**

পুত্রের বিচার

অযোধ্যার প্রতাপান্বিত ছফদরজঙ্গ ; তাঁহার একমাত্র পুত্র শুজা-উদ্দৌলা —তরুণ যুবক—সমস্ত অঙ্গে যেন সর্বক্ষণ শক্তি ও সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছে।

একদা রাত্রিতে শুজা-উদ্দৌলা এক গর্হিত কাজ করিতে যাইয়া ধরা পড়িলেন। শহর কোতওয়াল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তখনই নবাবের প্রাসাদে চলিয়া গেলেন এবং নবাবকে ঘুম হইতে জাগাইয়া সমস্ত বলিলেন।

নবাব ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "কোতওয়াল, তুমি যদি তোমার পদের যোগ্য হতে, তবে এর বিচার তুমি নিজেই করতে, এত রাত্রিতে আমাকে ত্যক্ত করতে না।"

কোতওয়াল নবাবের ইশারা বুঝিলেন ও তখনই চলিয়া যাইয়া নবাবযাদাকে খুব আচ্ছামত পিটুনী দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। তাহার পর তাঁহাকে কারাগারে পাঠাইয়া দিলেন।

সাতদিন পর নবাবযাদা নবাবকে অভিবাদন করিতে আসিলেন এবং নবাবের আগমন প্রতীক্ষায় দরবারের এক কোণে বসিয়া রহিলেন। নবাব আসিয়া তাঁহাকে দেখিলেন এবং নিদারুণ অবজ্ঞার সঙ্গে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "ও, আপনি এসেছেন!"

অতঃপর শুজা-উদ্দৌলা সপ্তাহে দুইবার করিয়া পিতাকে সালাম করিতে দরবারে আসিতেন; কিন্তু ছয় মাস পর্যন্ত নবাব তাঁহার সঙ্গে দ্বিতীয় কোন কথা বলেন নাই।

—শ্রীবাস্তব

The First Two Nawabs of Oudh—**Srivastava**

অভিনব আত্মীয়

মুখলিস খাঁ মোগল দরবারের একজন খ্যাতনামা আমীর ছিলেন। কর্ণাটের নবাব আনোয়ার উদ্দীনের সঙ্গে মুখলিস খাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব।

একদা একটা ধূর্ত লোক চাকুরীর খোঁজে শাজাহানাবাদে আসিয়া মুখলিস খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল এবং নিজেকে নবাব আনোয়ার উদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পরিচয় দিল। মুখলিস খাঁ লোকটাকে একটা ভাল চাকুরীতে বসাইয়া দিলেন।

ইহার কিছুক্ষণ পর স্বয়ং নবাব কোন কাজে শাজাহানাবাদে গিয়া হাযির। লোকটা ত ভয়ে অস্থির। সে ভাবিল, "হায়, হায়, যদি আমার এ ফাঁকি ধরা পড়ে, তবে মুখলিস খাঁ আমাকে ভাল কুত্তা দিয়া খাওয়াবে।"

লোকটা অবশেষে নবাব আনোয়ার উদ্দীনের নিকট যাইয়া সমস্ত কথা প্রকাশ করিল এবং তাঁহার পায় পড়িয়া কাঁদিয়া কহিল, "হুজুর, পেটের দায়ে নিরুপায় হয়ে আমি এ ফাঁকির আশ্রয় নিয়েছি, যদি হুজুরের মর্জি হয়, তবে নিজ হাতে এ অধমকে কতল করুন, দশের সামনে বে-ইজ্জত করে মারবেন না।"

লোকটার অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া নবাবের মন গলিয়া গেল। তিনি তখনই তাহাকে মাফ করিলেন এবং বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই, বাছা; তুমি উঠ।"

লোকটা বলিল, "হুজুর, যদি একথা প্রকাশ পায় যে, আমি হুজুরের আত্মীয় নই, তবে লোকে আমাকে ঠাটা করে মারবে।"

নবাব বলিলেন, "বেশ, সে পথও আমি বন্ধ করে দিচ্ছি। উজীর, দফতরে এর নাম লিখে নিন—আজ হতে এ আমার আত্মীয় এবং আমার অন্য আত্মীয়দের মত এও আমার জায়গীর হতে মাশহারা পাবে।"

—বোরহান

Tujak-i-Walajahi—**Burhan-ud-Deen**

সম্পদের কৃতজ্ঞতা

আর্কটের নিজাম জুলফিকার খাঁ। একদিন দুইজন লোক আসিয়া বলিল, "হুজুরের বড় বে-ইজ্জতীর কথা—বলতেও ভয় হয়, না বলেও পারি না।" নিজাম বলিলেন, "ব্যাপার কি, খুলে বল।" লোক দুইটি বলিল, "হুজুরের বাবুর্চীখানা হতে হুজুরের খাসখানা চুরি যায়—আর তাই বাজারে যার তার কাছে বিক্রি হয়!" নিজাম বলিলেন, "বটে! আচ্ছা, এর প্রমাণ নিয়ে এস দেখি।"

লোক দুইটি খুশী হইয়া চলিয়া গেল, ভাবিল, "বাবুর্চী মিঞারা, বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছ, দেখি, এইবার কে তোমাদের গর্দান বাঁচায়।"

কিছুক্ষণ পর লোক দুইটি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এই দেখুন, হুজুর,—বাজার হতে এক্ষুণি এই দুই বাসন খানা কিনে আনলাম।"

জুলফিকার খাঁ দেখিলেন, বাসনের খানা সত্যই তাঁহারই জন্য রান্না খানা। তাঁহার চোখ অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। তিনি তখনই ক্রমে দুইবার মাটিতে সিজদা করিলেন। পরে হাত উঠাইয়া বলিলেন, "হে পরম দাতা, আমি কি করে তোমার এ অফুরন্ত দানের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব? তুমি আমাকে এত দিয়েছ যে, আমি তা খেয়ে শেষ করতে পারি না, তার হিসাবও রাখতে পারি না, আর আমার চাকরেরা পর্যন্ত আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ সপরিবারে খেয়ে শেষ করতে না পেরে বাজারে বিক্রি করে!"

অতঃপর তিনি বাবুর্চিগণকে ডাকাইয়া বলিলেন, "এর পর আর কখনো আমার খানা বাজারে বিক্রি করো না—না থাকে, গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দিও। তোমাদের যাতে কোন অভাব না হয়, সেজন্য আমি তোমাদেরকে উপযুক্ত জায়গীর লিখে দিচ্ছি।"

—বোরহান

Tujak-i-Walajahi—**Burhan-ud-Deen**

মুহম্মদ আলীর মহানুভবতা

কর্ণাটের নবাব মুহম্মদ আলী খাঁর মন লড়াইয়ের ময়দানে ছিল বজ্রের মত কঠিন, আর গৃহাঙ্গনে ছিল ফুলের মত নরম।

[১]

একদা তিনি সংবাদ পাইলেন, "—মাদ্রাসার শিক্ষক আজ ছেলেদেরকে ভয়ানক মারপিট করেছেন।"

মুহম্মদ আলী খাঁ তখনই হুকুম দিলেন—"ওস্তাদজীর মন যাতে নরম হয়, সেজন্য আমার তরফ হতে তাঁর জন্য পাঁচশ' আশরফীর একটা উপহার নিয়ে যাও, আর বাকী সময়ের জন্য মাদ্রাসা ছুটি দিয়ে দাও।"

[২]

নবাব মুহম্মদ আলী খাঁ মফস্বলে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার সফরের এক মঞ্জিলে তিনি রাত্রি যাপন করিলেন ; পরদিন সকালে সেখানে তাঁহার দরবার। মহা ধুমধাম।

বহুমূল্য শামিয়ানার নীচে নবাবের সিংহাসন, দুয়ারে তলোয়ারধারী শাস্ত্রী। নবাব দরবারে যাইতেছেন। তাঁবুর দুয়ারে পৌঁছিয়া দেখিলেন, সিংহাসনের রক্ষী পাশের খুঁটি হেলান দিয়া ঘুমাইতেছে।

দুয়ারে নবাব—দরবারের সময় উপস্থিত—আর সিংহাসন-রক্ষী নিশ্চিন্তে নিদ্রামগ্ন! "সিংহাসনের আড়ালে নবাবের কোন জানের দুশমন পালিয়ে থাকতে পারে না?" উপস্থিত সকলে সভয়ে ভাবিল, "আজ হতভাগার রক্ষা নাই—জহলাদের হাতে নির্ঘাত ওর গর্দান যাবে।"

নবাব আস্তে বলিলেন, "লোকটা আমাদের সফরের সঙ্গী—আমরা ত হাতী ঘোড়া পাল্কীতে চলি, এরা হেঁটে হেঁটে হয়রান ; হয়ত রাত্রে ওর চোখের পাতা একত্রই হয় নাই। আচ্ছা, চলুন, এ বেলা দরবার আমরা অন্যখানেই গিয়ে করি। পাহারাওয়ালা, ওর কাছে একজন নূতন পাহারাওয়ালা মোতায়েন কর যেন কেউ ওর ঘুমে বিঘ্ন না ঘটায়।"

নবাব সরিয়া আসিলেন। তাঁহার দরবারের জন্য ধরণী বিছাইয়া দিল দুর্বার মখমল, মলয় দুলাইল নব পল্লবের চামর, বৃক্ষ ধরিল স্নিগ্ধ ছায়াছত্র, আকাশ টাঙাইল তাহার উদার নীল শামিয়ানা।

[৩]

শাহ্‌যাদা ওমদাতুল ওমারা সমবয়সী বালকদের সঙ্গে খেলা করিতেছিল। খেলিতে খেলিতে সে একটি রাজমিস্ত্রীর ছেলের পিঠে সজোরে এক কিল বসাইয়া দিল। বালকটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাড়ী রওনা হইল।

এমন সময় নবাব মুহম্মদ আলী আদালত হইতে শাহী মঞ্জিলে যাইতে বাহির হইলেন। হঠাৎ ছেলেটির উপর তাঁহার নজর পড়িল। তিনি তাহাকে ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারই প্রিয়তম পুত্র ছেলেটিকে অন্যায়ভাবে মারিয়াছে।

নবাব তৎক্ষণাৎ শাহ্‌যাদাকে গেরেফ্‌তার করাইয়া কাজীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং কাজীকে অনুরোধ করিলেন, "এক্ষুণি এর বিচার করুন।"

কাজী আসিয়া নিবেদন করিলেন, "হুজুর, দুটি বালকই নেহায়েত নাবালেগ ---এরা ত আইনের আমলে আসে না।"

নবাব বলিলেন, "শাস্ত্রকারেরা নাবালেগের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হতে পারেন; কিন্তু আদৌ কোন শাস্তি না দিলে হক-বিচার হয় না। সাধারণ লোকেরাও আদর্শ পায় না।"

এই বলিয়া তিনি রাজমিস্ত্রীর ছেলেকে বলিলেন, "শাহ্‌যাদা তোমাকে যেমন জোরে কিল দিয়েছিল, তুমি তেমনই জোরে ওর পিঠে একটা কিল বসিয়ে দাও।"

রাজমিস্ত্রীর ছেলে ভয়ে থর থর। কিন্তু নবাবের হুকুম—তামিল করিতে হইল।

—বোরহান

Tujuk-i-Walajahi—**Burhan-ud-Deen**

আবদালীর অবদান

১৭৫২ সাল। আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছেন। অপরাধ? পাঞ্জাবের সুবাদার মুইনুল মুল্‌ক ১৭৫০ সালের সন্ধি-মোতাবেক আবদালীকে কোন রাজস্ব পাঠান নাই।

চার মাস অবরোধের পর মুইনুল মুল্‌ক আত্মসমর্পণ করিলেন। আবদালী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার হাতে আমি ধরা পড়লে আপনি কি করতেন, সুবাদার সাহেব?" মুইনুল মুল্‌ক উত্তর দিলেন, "আপনার মাথা কেটে আমি বাদশাহ্‌র কাছে পাঠিয়ে দিতাম।" আবদালী ফের জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার প্রতি আমার কিরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত?" নির্ভীক সুবাদার জবাব দিলেন, "আপনি যদি মুদী হন, তবে আমাকে বিক্রি করবেন, আপনি যদি কশাই হন, তবে আমাকে হত্যা করবেন, আর আপনি যদি বাদশাহ হন, তবে আমাকে ক্ষমা করবেন।"

"বেশ, তোমাকে শেষ শাস্তিই দিলাম, দোস্ত"—এই বলিয়া আবদালী মুইনুল মুল্‌ককে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাহাকেই পাঞ্জাবের সুবাদার নিযুক্ত করিলেন।

—সাইক্‌স্‌

History of Afghanistan— **Sykes**

পলাশীর পর

[১]

মীরজাফর, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি দেশদ্রোহীদের বিশ্বাসঘাতকতায় যেদিন পলাশী-প্রাঙ্গণে ভারতের ভাগ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল, বাংলার স্বাধীনতার সেই জীবন-সন্ধ্যায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা আর কোনও দিকে কোন আশার আলো না দেখিয়া ভগ্ন মনে একটি উটে চড়িয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু দুইদিন আগে যে মুর্শিদাবাদ তাঁহার অখণ্ড প্রতাপের লীলাভূমি ছিল, আজ সে নগর তাঁহার পক্ষে নিরাপদ মনে হইল না। দুর্দিনের আগমনে নবাবের সুখের দিনের সঙ্গীরা একে একে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাঁহার আপন শ্বশুর—আজ তিনিও পর হইলেন—তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। দুর্ভাগ্য স্বামীর সর্বপ্রকার বিপদ-ঝঞ্ঝাকে বিধাতার আশীর্বাদের মত নিঃশঙ্ক চিত্তে বরণ করিয়া লইয়া রাজমহলের পথে সঙ্গে চলিলেন বেগম লুৎফন্নিছা—বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের গহন রাত্রির একমাত্র সহযাত্রী!

তাঁহার পলায়ন-পথেও আবার সেই বিশ্বাসঘাতকতারই অভিনয় হইল। তাঁহাকে গেরেফতার করিয়া মীরনের হাতে সমর্পণ করা হইল।

পিতা মীরজাফরকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে নিরাপদ করিবার জন্য তখন মীরন উৎকণ্ঠিত; অদূর ভবিষ্যতের কোলে ঐ রত্ন-ঝলসিত রাজমুকুট তাহারই মস্তকের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে—এ কল্পনার রক্ত-সুরা পানে সে উন্মত্ত।

সুতরাং তাহার চিন্তা হইল—'সিরাজউদ্দৌলা যদি কারাগার হ'তে পালিয়ে যায়—আবার যদি এই সিংহশাবক হুঙ্কার ছেড়ে দাঁড়ায়! না! তার চেয়ে ও কণ্টক দূর হয়ে যাক।'

সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করিবার জন্য মীরন লোক খুঁজিতে লাগিল। কেহই সাড়া দিল না। "প্রচুর পুরস্কার"—তবু লোক মিলিল না। তবে উপায়? এমন সময় মুহম্মদী বেগ নামে এক ব্যক্তি আসিয়া হত্যার ভার লইল: নবাব আলীবর্দী খাঁ ইহাকে পথ হইতে কুড়াইয়া নিয়া বড় স্নেহ আদরে মানুষ করিয়াছিলেন।

মুহম্মদী বেগ সিরাজের কারাগারে প্রবেশ করিল—তাহার হাতে নাঙ্গা তলোয়ার, চোখে ভ্রূকুটি। নবাব বুঝিলেন, এহেন অসময়ে এমন বেশে পুরাতন বন্ধুর আগমন কেন! তিনি প্রশান্তচিত্তে শেষ নামায পড়িয়া লইলেন। তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিলেন, "এই বিরাট দেশ—এর একটা ক্ষুদ্র কোণে আমার এ দুর্ভাগ্য জীবনের বাকী দিন কয়টি কাটানোর জন্য একটু স্থানও আমাকে ওরা দিতে পারে না, মুহম্মদী বেগ?" মুহম্মদী বেগ কোন উত্তর দিল না; শুধু নীরবে মুখ ফিরাইল। বোধহয় আশঙ্কা করিল, এ দৃশ্যে বুঝি পাষাণও ফাটিয়া যায়। নবাব বলিলেন, "ও! বুঝেছি,—দিবে না, তা ওরা আমাকে দিবে না। অথচ .... কিন্তু যাক। মুহম্মদী বেগ, আমি প্রস্তুত। আমার রক্তে বাংলার পাপ ধুয়ে যাক।"

মুহম্মদী বেগ বিকট একটা শব্দ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর ......! সব শেষ!!

নবাবের রক্তাক্ত দেহ একটা হাতীতে তুলিয়া তাহারা নগর প্রদক্ষিণে বাহির হইল। দুইদিন আগে নবাব এই পথেই বাহির হইতেন--রাজহস্তীর পিঠে—সোনার হাওদায়—আগে সৈন্য, পাছে সৈন্য—ডানে সৈন্য, বামে সৈন্য। আর আজ? আজ যাহারা দেখিতে আসিল, নবাবের ক্ষতবিক্ষত দেহের উপর দৃষ্টি পড়া মাত্র তাহাদের অনেকেই দুই হাতে চক্ষু ঢাকিয়া ঘরে পলাইয়া গেল এবং দরজা বন্ধ করিয়া অশ্রুর উপহারে তাহাদের প্রিয় নবাবকে শেষ অভ্যর্থনা করিল।

নবাবের জননী আমিনা বেগম যে মহলে থাকিতেন, হাতী অবশেষে তাহারই সম্মুখে আসিয়া হাজির হইল। এসব ভয়াবহ ঘটনার কথা বেগম কিছুই জানিতেন না। বাহিরে এত গোলমাল কেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহ গিয়া জানাইল, ঘটনার কথা। শুনিবামাত্র আমিনা বেগম পাগলের মত বেগে বাহির হইয়া প্রকাশ্য রাজপথে আসিয়া আছাড়িয়া পড়িলেন—তাঁহার মাথার ঘোমটা কোথায় চলিয়া গিয়াছে, দীর্ঘ কেশপাশ ইতস্ততঃ বিস্রস্ত। লাশ হাতীর পিঠ হইতে নামান হইল। উন্মত্ত জননী সেই বিক্ষত দেহ বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অজস্র চুম্বনে মৃত পুত্রের মুখ ভরিয়া দিতে লাগিলেন। একটা অনুচ্চারিত চীৎকার বাতাসের বুক চিরিয়া ছুটিল; অশ্রু-স্নাত তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে দর্শকদের কণ্ঠ ফাটিয়া বাহির হইল, "ওহ!"

—নিখিল নাথ রায়

বিচারাসনে হায়দর আলী

কয়েমব্যাটোর। মহীশুরের সুলতান হায়দর আলী বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। হঠাৎ একটি বুড়ী আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িল এবং ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

হায়দর আলী বুড়ীকে সস্নেহে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, মা?" বুড়ী বলিল, "আমাকে অসহায় পেয়ে জাহাঁপনার শহর কোতওয়াল আগা মুহম্মদ আমার মেয়েকে হরণ করে নিয়েছে।" হায়দর আলীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; তিনি বলিলেন, "বটে! আগা মুহম্মদ এখন তার দেশের বাড়ীতে--তবে কি তোমার মেয়েকে সেখানে নিয়ে গিয়েছে?" বুড়ী বলিল, "হুজুর,

তাই।" হায়দর আলী ফের বলিলেন, "কিন্তু হায়দর শাকে বল নাই কেন? সেই ত এখন আগা মুহম্মদের জায়গায় কাজ কচ্ছে।" বুড়ী বলিল, "তাঁকেও বলেছি, জাহাঁপনা, কিন্তু তিনি কিছু করলেন না।"

হায়দর আলী তখনই প্রাসাদে ফিরিয়া অনুসন্ধান শুরু করিলেন। দেখিলেন, অভিযোগ সত্য।

তিনি হুকুম দিলেন, "জহলাদ এক্ষুণি হায়দর শাকে দুই শ' বেত মারবে; আর একদল সৈন্য গিয়ে মেয়েটাকে উদ্ধার করে আনবে।"

বেত মারা হইল। সৈন্যদল ফিরিয়া আসিল—তাহাদের সঙ্গে বুড়ীর মেয়ে আর হাতে আগা মুহম্মদের মাথা।

—আবদুল কাদের

শাহ্ আলমের শেষ দশা

দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলম বিশ্বাসঘাতক আমীর, রইস ও সেনাপতি দ্বারা পরিবৃত।

অবশেষে রোহিলা সর্দার গোলাম কাদের খাঁর নেতৃত্বে এক ষড়যন্ত্রের উদ্ভব হইল। গোলাম কাদের বেগম ও শাহ্‌যাদীদের নিকট হীরা জহরত যাহা ছিল সমস্ত লুণ্ঠন করিয়া লইল। অবশেষে তাঁহাদের দেহের অলঙ্কারগুলিও খুলিয়া দিতে হইল। তাঁহাদের অপমানের অবধি রহিল না। অভাবও তাঁহাদের এমন তীব্র হইয়া দাঁড়াইল যে, তাঁহাদের কয়েকজন না খাইয়া মরিলেন।

কিন্তু গোলাম কাদেরের অর্থ-পিপাসার অন্ত নাই। সে খাজাঞ্চীখানা লুণ্ঠন করিল: তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া সে বাদশাকে যাইয়া ধরিল, বলিল, "আপনার কাছে গোপনে অফুরন্ত ধনরত্ন আছে—সেইগুলি—আমি চাই—নইলে আপনার চোখ তুলে ফেলব।"

অসহায় বাদশাহ্ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কি! গত ষাট বৎসর যাবত আমার যে চোখ প্রতিদিন পবিত্র কুরআন পাঠ করে আসছে, সেই চোখ তুমি তুলে ফেলতে চাও?"

কিন্তু বৃদ্ধ সম্রাটের করুণ আবেদনে গোলাম কাদেরের পাষাণ মনে দাগ বসিল না।

চক্ষু হারাইবার পরও সম্রাট অনেক দিন বাঁচিয়া ছিলেন। অন্ধ বাদশাহ্ করাগারে বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেন : অতীত ঐশ্বর্য-প্রভুত্বের কত কথাই মনে পড়িত—তাই মাঝে মাঝে লিখিতেন :

বর্বর গোলাম কাদের তাহার এ পাপের ধন বেশীদিন ভোগ করিতে পারে নাই। তাহার এই অভাবনীয় নিষ্ঠুরতায় অসহায় সম্রাটের অনুচরেরা শিহরিয়া উঠিল এবং তাহারা নাঙ্গা তলোয়ার হাতে এই জালেমের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়িয়া দাঁড়াইল। গোলাম কাদেরকে অবশেষে গেরেফতার করিয়া লোহার খাঁচায় বন্ধ করতঃ দিল্লীতে পাঠান হইল।

পথিমধ্যে গোলাম কাদেরের মৃত্যু হইল। তাহার মৃতদেহ রাস্তার পাশে ফেলিয়া দিল। একটা কাল কুকুর দৌড়াইয়া লাশের কাছে আসিল, গন্ধ শুকিল এবং লাশটাকে স্পর্শমাত্র না করিয়া চলিয়া গেল। ঘৃণায় নয় ত?

—ফ্র্যাংকলীন

History of Shah Alam—**W. Francklin**

প্রতিভূদের আগমন

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য টীপু সুলতান তলোয়ার খুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার ক্রমবর্ধমান শক্তিতেই ঈর্ষান্বিত হইয়া মহারাষ্ট্রপতি ও নিজাম বৈদেশিক শত্রু ইংরেজের সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। ইঁহা-দের সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে টীপু সুলতানের তুমুল সংগ্রাম। সংগ্রামে সুলতানের সৈন্য টলিয়া উঠিল। সুলতান সন্ধিতে রাজী হইলেন। সন্ধির অন্যতম শর্ত হইল এই : "সন্ধির শর্ত যাহাতে সুলতান যথাযথ পালন করেন, সেজন্য তাঁহার দুইটি পুত্র ইংরেজের হাতে প্রতিভূস্বরূপ থাকিবে।"

১৭৯২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী। শাহযাদাদ্বয় বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় সেরিঙ্গাপটমের কেল্লা হইতে বাহির হইল। শহরের অধিবাসীরা তাহাদের প্রিয়

শাহ্‌যাদাগণকে দেখিবার জন্য রাস্তায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। সুলতান স্বয়ং দুর্গদ্বারের উপরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। কেল্লা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ হইতে তাহাদের সালামী কামান গর্জিয়া উঠিল।

শাহ্‌যাদারা ইংরেজ শিবিরের নিকটে আসিলে একবিংশটি ইংরেজ কামান তাহাদের অভ্যর্থনায় আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিল। উকীলেরা তাঁহাদিগকে স্যার জন কেনাওয়ে এবং মহারাষ্ট্র ও নিজামের উকীলদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। এখান হইতে একসঙ্গে হেড্‌ কোয়ার্টার্সে রওনা হইল।

এক এক শাহ্‌যাদা এক এক সুসজ্জিত হাতীর উপর রূপার হাওদায় আসীন। তাহাদের সঙ্গে সহস্র সুসজ্জিত দেহরক্ষী। হেড্‌ কোয়ার্টার্সে বেঙ্গল-সিপাই-ব্যাটেলিয়ান তাহদিগকে অভ্যর্থনা করিল।

শাহ্‌যাদাদের বড়জনের নাম আবদুল খালেক—বয়স প্রায় দশ বৎসর; ছোটটির নামময়েজুদ্দীন, বয়স প্রায় আট। তাহাদের গায় মসলিনের সুন্দর আচকান, মাথায় লাল পাগড়ী, গলায় বহুমূল্য হীরা জহরত। পাগড়ীর উপরও কয়েকটি অপূর্ব মণি ধক ধক জ্বলিতেছিল।

অল্প বয়স: কিন্তু সকলে অবাক হইয়া লক্ষ্য করিল, কি সবল আত্মমর্যাদা-পূর্ণ তাহাদের ব্যবহার, কি নিখুঁত সুন্দর তাহাদের আদব-কায়দা।

হেড্‌ কোয়ার্টার্সে পৌঁছামাত্র লর্ড কর্নওয়ালিস তাঁহার প্রধান সেনানায়কগণ-সহ আসিয়া শাহ্‌যাদাদ্বয়কে অভ্যর্থনা করিলেন। শিবিরের দুয়ারে যাইয়া শাহ্‌যাদারা হাতী হইতে নামিল। লর্ড কর্নওয়ালিস উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার আসনের দুই পাশে দুইজনকে বসাইলেন।

মহীশূরের প্রতিনিধি গোলাম আলী কর্নওয়ালিসকে সালাম করিয়া কহিলেন, "আজ সকাল পর্যন্তও এই শিশু দুইটি আমার প্রভু সুলতানের পুত্র ছিলেন। কিন্তু আর এঁরা যে শাহযাদা নয়,—এখন হতে হুজুরই এঁদের পিতা।"

লর্ড কর্নওয়ালিস গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "আমি সম্পূর্ণ অভয় দিচ্ছি—এদের সর্বপ্রকার আদর-যত্নের কোন ত্রুটি হবে না।"

শাহযাদাদ্বয়ের সুন্দর ছোট্ট মুখ দুইখানি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল: সুলতানের আমলারাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

—মেজর দিরম

Campaign in India with Tipoo Sultan—**Major Dirom**

অযোধ্যার শেষ বাদশাহ্ বেগম

ওয়াজেদ আলী শার জননী অযোধ্যার শেষ বাদশাহ্ বেগম। দিল্লীর মোগল হেরেমে জন্ম, দিল্লীর শাহী আবহাওয়ায় বর্ধিত, স্বামী আমজাদ আলী শা'র সঙ্গে রাজকার্যে জড়িত—বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম ও দানশীলতায় এই মহিয়ষী মহিলা পরিচিত সর্বজনের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন।

অনেক সময় তিনি নিজ প্রাসাদের জানালার ধারে বসিতেন। নীচের রাস্তায় অবিরাম জনস্রোত। তাহারই মধ্যে তাঁহার নজরে পড়িত হয়ত একটি অসহায় বৃদ্ধা নারী, একটি রুগ্ন কৃশকায় বালক, একটি ছিন্ন-বসনা দুঃস্থ বালিকা—তিনি তাহাদিগকে ডাকিতেন, মিষ্ট কথা বলিতেন, তাহার পর কিছু দিয়া বিদায় করিতেন।

ইংরেজরা ওয়াজেদ আলী শার রাজ্য কাড়িয়া নিলেন। ওয়াজেদ আলী শাহ্ বসিয়া পড়িলেন। বাদশাহ্ বেগম তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "তুমি ভাবনা করোনা, বাছা, আমি নিজে ইংরেজদের রাণীর কাছে যাব। তিনিও ত ছেলের মা! আমার ছেলের রাজ-মুকুট তিনি যাতে না নেন, আমি সেজন্য তাঁকে অনুরোধ করব। কেন, তাঁর ত অনেক রাজ্য, অনেক ধনদৌলত আছে। তিনি কি একাই সমস্ত দুনিয়ার মালিক হবেন?"

দিল্লীর শাহী দরবারে ওয়াজেদ আলী শা'র মুকুটের মত মুকুট কতবার বিতরণ হইতে বাদশাহ্ বেগম দেখিয়াছেন! তাঁহার স্বামীর পরিবারও ত সীমাহীন দানের জন্য সুবিখ্যাত। তাই বাদশাহ্ বেগম আশা করিয়াছিলেন, ইংল্যাণ্ডের এত বড় রাণী, তিনি কিছুতেই তাঁহার এই সামান্য অনুরোধটুকু ফেলিয়া দিবেন না।

কিন্তু প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য .... বাদশাহ্ বেগমের সোনার স্বপন টুটিয়া গেল। ভগ্ন-প্রাণ বৃদ্ধা মহিলা ফ্রান্সে চলিয়া গেলেন—মরিতে।

তাঁহার অভাগা সন্তান কত আশায় বুক ভরিয়া তাঁহার পথের দিকে চাহিয়া আছে, কেমন করিয়া খালি হাতে তাহার কাছে ফিরিয়া যাইবেন?—এই ভাবিয়া ভগ্ন-হৃদয় বেগম বিদেশেই নিজ সমাধি বাছিয়া লইলেন।

—স্মীথ

Kinghton's Eastern King and Queen—**Smith**

ওয়াজেদ আলী শা'র নির্বাসন জীবন

নাচ, গান, বাজনা—এই তিন কাজেই ওয়াজেদ আলী শার অধিকাংশ সময় ও শক্তি ব্যয়িত হইত এবং পরিণামে ইহাদেরই জন্য তাঁহাকে সিংহাসন হারাইতে হইল।

লক্ষ্ণৌ হইতে শেষ বিদায়ের দিন। ওয়াজেদ আলী শাহ্ চলিয়াছেন। রাস্তায় রাস্তায় লোক, তাহাদের বুকে ব্যথার আগুন, নাসিকায় দীর্ঘশ্বাস। পথের পাশের দালানগুলি তাহাদের জানালার চক্ষু মেলিয়া বিদায়ী নবাবের দিকে অনিমেষ চাহিয়া আছে।

ওয়াজেদ আলী শাহ্ শহরের তোরণ পার হইয়া একবার ফিরিয়া চাহিলেন: এই সুন্দর প্রাসাদময় চিরপ্রিয় নগর, অভাগার বিদায় অভিনন্দন গ্রহণ কর! চক্ষুতে অশ্রুর ঝর্ণা উৎসারিত হইতে যাইতে ছিল, তিনি সবলে তাহা দমন করিলেন। বুক ভাঙ্গিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইতে চাহিতেছিল, যেন তাহাই নিবারণের জন্য হাতের সেতারখানি বুকে চাপিয়া ধরিলেন, আর তাঁহার সঙ্গী গায়কদের দিকে একবার করুণ নয়নে চাহিলেন: যেন বলিতেছিলেন, "হে আমার অশ্রুময়ী আত্মা, শান্ত হও—শান্ত হও; আমি রাজদণ্ড হারিয়েছি, কিন্তু সেতার এখনো আমার হাতে আছে, আর আছে আমার এই গায়ক বন্ধুরা—এরাই আমাকে আমীর রইস সভাসদদের কথা ভুলিয়ে রাখবে।"

১৮৬৪ সালের মে মাসের 'কলিকাতা ডাকহরকরা পত্রে' শাহ্ ওয়াজেদ আলীর বন্দীজীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিত আভাস পাওয়া যায়।

"বিধাতার চরণে জীবনের সর্ব শুভ-অশুভকে অর্পণ করিয়া প্রাচীন কালের ঋষি-দরবেশের মত অযোধ্যার ভূতপূর্ব রাজা ওয়াজেদ আলী শাহ্ তাঁহার নির্বাসন দণ্ডকে পরম তৃপ্তির সঙ্গে বরণ করিয়া লইয়াছেন। তিনি অর্ধেক সময় ধর্ম কাজে ব্যয় করেন, বাকী অর্ধেক সময় নানারূপ বন্য পশুপাখী সংগ্রহ-কাজে ক্ষেপণ করেন। নবাবের এ রুচির জন্য মাঝে মাঝে তাঁহাকে খরচান্ত হইতে হয়, একথা সত্য; তবে এত অসুবিধার মধ্যেও জ্ঞান আহরণের এই প্রচেষ্টা যে নিতান্ত

প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া এমন অনেক লোক নবাব বাহাদুরকে ঘিরিয়া আছে যাহারা তাঁহার এই বন্য-প্রাণী-প্রিয়তাকে সর্বপ্রকার উৎসাহ দিয়া থাকে।

নবাব বাহাদুরকে একজোড়া ময়ূর নজর দিয়া তাহার মূল্যবাবদ ত্রিশ হাজার টাকা, অথবা এক খাঁচা সুন্দর পাখী উপহার দিয়া অর্ধ লক্ষ টাকা ইঁহারা আদায় করিয়া লইয়াছেন, এমন ঘটনা গার্ডেন রীচে আদৌ বিচিত্র নয়।

অতি সাধারণ রকমের সহজপ্রাপ্য একটা পাখী বা জন্তু—শুধু ঐ জাতীয় অন্য পাখী বা জন্তুর সঙ্গে সামান্য একটু পার্থক্য আছে—বাস, ঐ বৈশিষ্টের নামে তখনই রাজকোষ হইতে কয়েক হাজার টাকা বাহির হইয়া যায়।

একদিন একটা লোক একজোড়া শকুন লইয়া আসিয়াছিল। শকুন দুইটি একটু আলাদা রকমের এবং দেখিতে সুন্দর বটে। শাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন—"এর দাম?" লোকটা কুর্নিশ করিয়া বলিল—"কিছুই নয়, জাহাঁপনা, মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা।" শাহ্ বলিলেন, "পঞ্চাশ হাজার টাকা! বেশ, তবে পঞ্চাশ হাজার টাকাই পাবে।" রাজকোষে মাত্র ত্রিশ হাজার টাকা ছিল। নবাব ছা'দত আলী খাঁর আমলের দুইটি সোনার পালঙ্ক ছিল, তাহাই গলাইয়া বাকী কুড়ি হাজার টাকা দেওয়া হইল।

—সমীর

Kinghtons' Eastern King and Queen—**Smith**

ভিখারীর কাছে ভিখ নাহি মাগে

মোখদম শা ফকীর—গায়ে লম্বা কোর্তা, মাথায় উঁচু টুপি, পায় নাগরাই জুতা—এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে তসবীহ্, চোখে উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—সে দৃষ্টি মাঝে মাঝে যেন কোন অতল রহস্যের গূঢ়তত্ত্ব উদ্ঘাটনে কোথায় হারাইয়া যায়।

যে যা দেয়, ফকীর তাই খায়; যেখানে রাত হয়, সেখানেই কম্বল বিছাইয়া শোয়ার ব্যবস্থা করে; কখনও রাতের পর রাত দাঁড়াইয়া ধ্যানে কাটাইয়া দেয়।

একদা ফকীর গিয়া হাযির পাটনার জামে মস্জিদে। শুক্রবার—বিরাট জামা'ত, নবাব, আমীর, রইস, সৈন্যসেনাপতি, মুসাফির, সওদাগর— মস্জিদে তিল ধারণের স্থান নাই।

নামায-অন্তে সবাই মুনাজাত করিল। নবাব খাঁস মুনাজাত করিলেন; বলিলেন, "এলাহি, দান কর তুমি আমাকে আরো ঐশ্বর্য, আরো প্রভুত্ব, আরো মান-ইজ্জত।"

তাহার পর শুরু হইল তাঁহার দান, উপস্থিত প্রার্থীরা কেহই বঞ্চিত হইল না, সকলেই খুশী হইল।

কেবল ফকীর মোখদম শা নবাবের মুনাজাত শ্রবণ করা অবধি অপ্রসন্ন মুখে গম্ভীরভাবে বসিয়াছিল; এইবার উঠিয়া রওয়ানা হইল।

নবাব মোখদম শাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কিছু নিয়ে যান, ফকীর সাব—মেহেরবানী করে কিছু গ্রহণ করুন।" ফকীর চলিতে চলিতে উত্তর করিল:

ভিখারীর কাছে
ভিখ নাহি মাগে
ফকীর মোখদম শা।

হাড্ডীর ফরিয়াদ

সিন্ধুর শাসনকর্তা জাম খায়েরউদ্দীন একদা পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন একটি সরু পাহাড়ীয়া পথের মুখে কতকগুলি শুক্না হাড্ডী, জাম সাহেব ঘোড়া থামাইয়া সঙ্গিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই হাড্ডীগুলি কি কয় বলতে পারেন?" সঙ্গীরা বিস্ময়ে স্তব্ধ।

জাম সাহেব বলিলেন, "হাড্ডীগুলি ফরিয়াদ কচ্ছে—বিচার চাই, হক বিচার।"

তিনি তখনই অনুসন্ধান শুরু করিলেন। যে জমির উপর হাড়গুলি ছিল, তিনি সেই জমির মালিককে ডাকাইলেন। একটি অতি বৃদ্ধ লোক আসিল। জাম সাহেব তাহাকে জেরা করিতে লাগিলেন। অবশেষে সে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, "দুই বৎসর আগে গুজরাটের একটি সওদাগরী কাফেলা এইখানে লুণ্ঠিত হয়; অনেক যাত্রীও খুন হয়।"

জাম সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইলেন যে, সে ডাকাত দলের বাড়ী কোথায়, নাম কি, জনবলই বা কত।

জাম সাহেব রাজধানীতে ফিরিয়াই ডাকাত দলকে গেরেফতার করাইলেন; লুণ্ঠিত মালের অনেকাংশ উদ্ধার পাইল।

জাম সাহেব ঐ মাল গুজরাটের শাসনকর্তার নিকট পাঠাইয়া অনুরোধ করিলেন যেন উহা কাফেলার সওদাগর বা তাহাদের ওয়ারিশগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়।

—মাছুম

Tarikhus Sindh—**Mir Muhammad Masoom**

মহান মানব হিয়া

ইহাদেরি তরে
উছলিয়া উঠে
মহান মানব হিয়া

হুগলীর উপনিবেশে ইস্পাহানী সওদাগরের ঘরে জন্ম—অভাব কাহাকে বলে কখনও জানে নাই, তবু কিশোর মুহসিন ঐশ্বর্য বিলাসের মোহকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সমস্ত মন প্রাণ ঢালিয়া দিল জ্ঞানের চর্চায়, শক্তির চর্চায়, চিত্তের চর্চায়।

তাহার পর একদিন যুবক মুহসিন জ্ঞানের বৃহত্তর ময়দানের অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়িল।

তৎকালীন মুসলিম জাহানের সমস্ত জ্ঞানকেন্দ্র পরিভ্রমণ করিয়া যখন হুগলীতে ফিরিলেন তখন তিনি হাজী মুহম্মদ মুহসিন—যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়া বার্ধক্যের প্রান্তে উপস্থিত।

ভগিনী মনুজান তাঁহার বিপুল সম্পত্তি নিঃশেষে ভাইকে দান করিয়া মহাযাত্রা করিলেন। কিন্তু মুহসিনের নির্লিপ্ত চিত্ত মুকুরে মায়ার ছায়াও পড়িল না; তিনি পরহিতে সমস্ত জমিদারী দান করিয়া দিয়া আবার জ্ঞান ও ধর্ম অনুশীলনে মন দিলেন।

এমনই কালে একদা গভীর রাত্রিতে মুহসিনের ঘরে চোর ঢুকিল।

চোর তাহার নিজ কাজে ব্যস্ত, এমন সময়ে মুহসিনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি চোরকে ধরিয়া ফেলিলেন।

চোর প্রথমে থতমত খাইয়া গেল; পরক্ষণেই তাহার চোখ ফাটিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল। করুণ নয়নের সে অবাধ অশ্রুধারা মুহসিন সহিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন:

"কি হয়েছে রে? এত কাঁদছিস কেন?"

"হুজুর, আমার যে জেল হবে।"

"তা অন্যায় করলে জেল হবে না?"

"আমার জেল হয় হোক, কিন্তু হুজুর, আমার ছেলে মেয়েরা যে না খেয়ে মরবে?"

"না খেয়ে মরবে, তবে চুরির মাল দিয়ে কি করিস?"

"হুজুর, চুরি ত এই প্রথম করতে এসেছিলাম – আজ, দুদিন হয় তারা উপবাসী—তারই জন্য।"

"ওহ, তাই! আচ্ছা, আমার সঙ্গে এস। .... এইটি আমার টাকার ভাণ্ডার --যেসব থলে দেখছ, ওগুলি টাকায় ভরা – যে কয়টা থলে পার, তুলে নেও।"

"আমাকে গরীব বলে ঠাট্টা করছেন, হুজুর—কিন্তু মিথ্যা আমি একটুও বলি নাই—আমার বাড়ীতে সত্যি সবাই অনাহারে।"

"তাইত বলছি, ভাই, যা পার, তাড়াতাড়ি নিয়ে নেও—তাদেরকে খাইয়ে বাঁচাও।"

লাটের খাতিরেও নয়

নবাব আবদুল জব্বার—বর্ধমানের এক সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্ম—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট—ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি, অনিন্দনীয় ব্যবহার, সর্বোপরি সবল মনুষ্যত্বের জন্য সর্বত্র সমাদৃত।

বন্ধুরা দিল তাঁহাকে প্রীতি, দেশ দিল তাঁহাকে শ্রদ্ধা, রাজ-সরকার দিল তাঁহাকে নওয়াব উপাধি।

লর্ড ডাফরিন ভারতের বড়লাট। কলিকাতার লাটভবনে তিনি এক বিরাট সরকারী ভোজের আয়োজন করিলেন। অন্যান্য বিশিষ্টগণের সঙ্গে ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলভী আবদুল জব্বারও দাওয়াত পাইলেন।

লাটদরবারের নিমন্ত্রণ—সেকালে তাহাতে মদ ও শূকর মাংসের ব্যবস্থা হইত —অবশ্য খাওয়া না-খাওয়া ছিল নিমন্ত্রিতদের ইচ্ছাধীন।

স্বয়ং বড়লাটের দাওয়াত—একজন ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে সে দাওয়াতে যাওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না।

সুতরাং আবদুল জব্বার সাহেব ভোজসভায় উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ভোজন আরম্ভ হওয়ার আগে পাশের কামরায় গিয়া বসিয়া রহিলেন।

তাঁহার এই অনুপস্থিতি অজানা রহিল না। বড়লাট-পত্নী নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার কামরায় প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে যাহা বলিলেন তাহার মর্ম এই যে, সামান্য ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা স্বয়ং বড়লাটের নিমন্ত্রণের প্রতি তাচ্ছিল্যের অপমান—সম্পূর্ণ অমার্জনীয়।

আবদুল জব্বার সাহেব পরম বিনয় অথচ নিতান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে শান্ত কণ্ঠে বড়লাট পত্নীকে বুঝাইলেন যে, যে খাদ্য ও পানীয় মুসলমানের পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ, সেই হারাম বস্তু সামনে রাখিয়া খানার টেবিলে বসা কোন বিবেকবুদ্ধি-সম্পন্ন মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়—স্বয়ং লাট সাহেবের খাতিরেও নয়।

আবদুল জব্বার সাহেবের এই দৃঢ় সুন্দর কৈফিয়তে তুষ্ট হইয়া লাটপত্নী ফিরিয়া গেলেন এবং এই সময় হইতে লাটবেলাট দরবারে তাঁহার মান-ইজ্জত আরও বাড়িয়া গেল।

কলার দাম

করটীয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ওরফে চাঁদ মিঞা—সুন্দর সৌম্য, বলিষ্ঠ দেহ—উদার অমায়িক ব্যবহারে এই অল্প বয়সেই প্রজাপুঞ্জের চিত্তে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

একদা তাঁহার কানে গেল যে তাঁহার বাজারে জুলুম শুরু হইয়াছে। পরদিন নিজে বাজারে গেলেন; কিন্তু তেমন কিছু নজরে পড়িল না। ফিরিবার সময় সামনে কতকগুলি ভাল সবরী কলা পড়িল; তিনি তাহারই এক কাঁধি কলা সাথের খানসামার হাতে দিয়া দোকানদারকে বলিলেন, "ফিরা-কালে দাম নিয়ে যেয়ো।"

ঘণ্টাখানেক পর কলাবিক্রেতা চাঁদ মিঞা সাহেবের কাছে গিয়া হাযির: এক সালাম দিয়া বলিল, "হুজুর, আপনার আমলা—মশাইর জ্বালায় আর আমরা বাঁচি না; আমার এক কাঁধি কলা নিয়ে গেল, দাম দিলে না।" "কি বলে নিল?"—চাঁদ মিঞা সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটা কহিল—"বলল দামের জন্য চেঁচাস্ না, ব্যাটা; সাহেব যে দাম দেয়, আমিও সেই দাম দিব।" চাঁদ মিঞা সাহেব বলিলেন, "দাঁড়াও, দেখছি।"

তিনি তখনই—মশাইকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এর এক কাঁধি কলা নিয়েছেন?"

"হুজুর"।

"আমি যে দাম দিব, আপনি তাই দিতে চেয়েছেন?"

"তা—হাঁ—হুজুর—"

"ঠিক করে বলুন, এর মধ্যে ফের কোন গোল করবেন না।"

"হুজুর—তাই—তাই দিতে চেয়েছি।"

"বেশ; আমি কলার দাম দিচ্ছি, খাজাঞ্চী, ওর কলার দাম পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দাও।"

খাজাঞ্চী টাকা দিতে গেল।

কলাওয়ালা ভয়ে থর থর। সে কাঁদিয়া বলিল, "হুজুর, মাফ চাই, আর কখনো আমি নালিশ করতে আসব না।"

"সে পরের কথা। এক্ষণে দামটা নিয়ে নে।"

"হুজুর মাফ চাই।"

"খবরদার, বে-আদব। টাকা না নিবি তো এক্ষুণি মালখানায় যেতে হবে।"

লোকটা টাকা হাতে লইয়া কাঁপিতে লাগিল।

চাঁদ মিঞা সাহেব তাঁহার আমলার দিকে চাহিয়া বলিলেন:—

"বেশ, এখন আপনার ভাগের পঞ্চাশটা টাকা তাহাকে দিয়ে দিন।"

"হুজুর...।"

"আর কোন কথা নয়, আপনার জবান আপনাকে রক্ষা করতেই হবে—এই এক্ষুণি।"

"হুজুর, এখন টাকা কোথায় পাব?"

"জমাদার, বাবুকে নিয়ে মালখানায় বসিয়ে রাখ, খাজাঞ্চী তুমি নিজে ওঁর চিঠি নিয়ে ওঁর স্ত্রীর কাছে যাও; টাকা নিয়ে এসে কলাওয়ালাকে দাও, তারপর মালখানার দুয়ার খুলবে।"

ইফাবা / ৮৭-৮৮ / প্র-৫৭৭২ / ৫২৫০